ভ্রমণগদ্য

ভ্রমণসাহিত্যের কাগজ

বর্ষ ৮ । সংখ্যা ২১ । অক্টোবর ২০২৫

ভ্রমণগদ্য

ভ্রমণসাহিত্যের কাগজ

বর্ষ ৮ সংখ্যা ২১ • অক্টোবর ২০২৫

সম্পাদক

মাহমুদ হাফিজ

বর্ষ ৮ সংখ্যা ২১ • অক্টোবর ২০২৫

সম্পাদক
মাহমুদ হাফিজ

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
জুলেখা ফেরদৌসী

প্রচ্ছদ
শিল্পী আলফ্রেড আরেগুইন কৃত 'লেগুনা আজুল' পেইন্টিং অবলম্বনে

কর্মাধ্যক্ষ
হোসেন সোহরাব

অক্ষর বিন্যাস
আশিক হোসেন

মুদ্রণ
মাওলা কালার ইনভার্ট
৯৯ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

মূল্য
৩০০ টাকা

যোগাযোগ
প্রযত্নে- লিটিল ম্যাগাজিন প্রাঙ্গণ
৭৯ আজিজ মার্কেট (দোতলা), শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

Bhromongoddya
A Travelogue Magazine
Year 8 Issue18 || February 2025
Editor|| **Mahmud Hafiz**
Managing Editor|| **Zulekha Ferdousi**
Cover|| **Based on Alfredo Arreguín's painting 'Laguna Azul'**
Illustration || Ashik Hossain
Manager|| **Hossain Sohrab**

Printing: **Mawla Colore Invart**
99 Fakirapool, Motijeel, Dhaka-1000.
Price: **BDT 200 IR 150 USD 5**

Contact
C/O: Little Magazine Prangyan, 79 Aziz Market (1st Floor) Shahbag, Dhaka-1000
Email: bhromongoddya@gmail.com
FB: Facebook.com/bhromongoddya

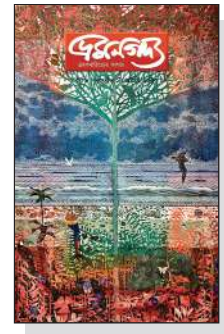

সূচিপত্র

আবদুর রব	৭	মন ট্রামব্লান্ট
কামরুল হাসান	১৪	মক্কার যাত্রী
ক্ষমা মাহমুদ	৩৫	রূপসী রাবাত
জিকরুর রেজা খানম	৪৭	গোবি মরুভূমি
ড. নাঈমা খানম	৫৮	নায়েগ্রা
ডি.এম. ফিরোজ শাহ্	৬৪	বলিহার জমিদার বাড়ি
জ্যোতি বিকাশ বড়ুয়া	৭১	জার্মানি: রাইনে নৌবিহার
ফরিদুর রহমান	৭৬	ভ্রমণে ভোজন
বিশ্বজিৎ বড়ুয়া	৮৯	আঙ্কেল হো'র দেশে
মাসরুর-উর-রহমান আবীর	১২২	অদ্ভুত ড্রাগন আর আজব কফি
মামুন রশিদ	১২৯	লিওপোল্ড ক্যাফে
মাহমুদ হাফিজ	১৩৩	চিলিওয়াক: কানাডার বনগহীন
রওনক আফরোজ	১৪১	আমাজনে বৃষ্টিবনে
রহমান মৃধা	১৫৮	ছুটি
লোপা মমতাজ	১৬৯	আমিশ গ্রামে এক শান্ত বিকেল
সেলিম সোলায়মান	১৭৭	শ্বেতহস্তিনামা
স্বপন ভট্টাচার্য	১৯০	কচ্ছের রণ
হুসেইন ফজলুল বারী	১৯৭	অচিন পাখি

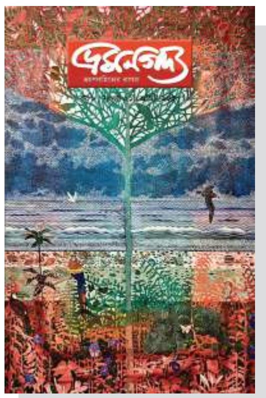

লেখা পাঠানোর নিয়ম

অভিজ্ঞতাময় ভ্রমণগদ্য পাঠানো সবার জন্য উন্মুক্ত

প্রথিতযশা ভ্রমণলেখকের পাশাপাশি নবীন ভ্রামণিক ও ভ্রমণলেখকদের লেখা সাদরে গৃহীত হয়

ইউনিকোড সমর্থিত ফন্টে ই-মেইলে সংযুক্ত করে লেখা পাঠাতে হয়

লেখার সঙ্গে ছবিতে ক্যাপশন সেভ করে ছবি পাঠাতে হবে

যোগাযোগের পূর্ণ ঠিকানা দিতে হবে যাতে লেখককে

সৌজন্য সংখ্যা পাঠানো যায়

ব্যক্তিগত যোগাযোগ অপ্রয়োজনীয়

প্রয়োজনে ভ্রমণগদ্যের পক্ষ থেকেই যোগাযোগ করা হয়

যোগাযোগ

E mail: bhromongoddya@gmail.com

https://www.facebook.com/Bhromongoddya

সম্প্রতি ঢাকায় পরিচয় হলো রাশিয়ার তাতার জাতিগোষ্ঠির মানুষ- বিশ্বভ্রামণিক দামীর নাসিবউলেন এর সঙ্গে। তাতারাস্তানের কাজান শহর থেকে টগবগে তরুণ দামীর বিশ্বপরিব্রাজনে বেরোয় দেড় বছর আগে। এশিয়ার প্রায় সব দেশ ঘুরে অক্টোবরে আসে বাংলাদেশে। একমাস ঘুরে চলে গেছে শ্রীলঙ্কায়। শ্রীলঙ্কা হয়ে যাবে আফ্রিকা। এ্যান্টার্কটিকাসহ ঘুরবে লাতিন আমেরিকা। উত্তর আমেরিকা ও কানাডা ঘোরার পর যাত্রা করবে উত্তর মেরুর দেশগুলোর দিকে। ইউরোপের সব দেশ পর্যটনশেষে ফিরে যাবে নিজ দেশ রাশিয়ায়। আমার মতো ভ্রমণপথের পথিকের সঙ্গে দেখা হবে না বিশ্বপথিকের- তা কী হয়! পথের সাক্ষাত থেকে যা জানা গেল, তা বেশ চিত্ত আমোদিতকর। প্রথমত: 'বুড়িছোঁয়া'কেতায় দেশ ভ্রমণ করে না সে। বাংলাদেশে একমাস কাটানোর আগে দুই মাস কাটিয়ে এসেছে থাইল্যান্ডে। তার আগে কয়েকমাস ধরে ঘুরে ফিরেছে ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস, চীন ও জাপান। এভাবে বিশ্ব ঘুরতে যতো বছর লাগুক, ততোবছরের পরিকল্পনা নিয়ে ঘর ছেড়েছে সে। ভ্রমণ শেষ না করে বাড়ি ফেরার কোন পরিকল্পনাও তার নেই। বললো- 'বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে মাঝপথে ফেরা জটিল ও ব্যয়সাপেক্ষ।'

দামীর নাসিবউলেন এর ভবঘুরেমির মজা হচ্ছে, ঐতিহাসিক ভ্রমণকে নগদায়নের অনাগ্রহ। বিশ্বভ্রমণ শুরু করেছে সে মনের ডাকে। এটা সে প্রচার করে না। ভিডিও বানায় না। ব্লগ লেখে না। সোস্যাল মিডিয়ায় তার পেজ বা প্রোফাইল নেই। দেশে দেশে প্রকৃতি, মানুষ ও সংস্কৃতি দেখে বেড়াতে মনের ডাকে সে সাড়া দিয়েছে কেবল। মনের ডাকে সাড়া দিয়ে ঘরছাড়া এরকম বোহেমিয়ান খুব কম দেখেছি। আমার ডেনিশ বন্ধু থোর পেডের্সেন 'ওয়ান্স ওপন এ সাগা' নামে উড়োজাহাজ ছাড়া বিশ্বভ্রমণ শেষ করে বিশ্বরেকর্ড গড়েছে। ভ্রমণকালে থোর নিয়মিত ব্লগ লিখেছে। এখন নিজ অভিজ্ঞতার বই লিখে দু'হাতে কামাচ্ছে। দামীরের মতো বিশ্বপর্যটককে প্রথম দেখলাম-মনের ডাকে সাড়া দেয়া ছাড়া যারা বোহেমিয়ানার আর কোন 'কর্জ'ই নেই !

মনে পড়ে আমার এক সহকর্মীর কথা। ভরজীবন গল্প লিখে লিখে যিনি বাক্সবন্দী করে রেখেছিলেন পান্ডুলিপি, প্রকাশ করেননি। আমার তাগাদায় এক ডজনের মতো গল্পের বই প্রকাশ করলেন ক'বছর আগে। আরও এক ডজনের মতো পান্ডুলিপি জাম্বিলে মজুদ তার। বাহুল্য বলা,তার গল্পের ভাষা পরিচ্ছন্ন,বিষয় জীবনস্পর্শী, সাহিত্যবিবেচনায় উত্তীর্ণ। কিন্তু পরিচয়ের ভার বহনের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিক 'হয়ে উঠতে' চান না তিনি। জীবনভর পাঠের পর নিজে কিছু সৃজন করেছেন নিরেট মনের তাগিদে। প্রশ্ন উঠলে বলেন-সবই যখন নশ্বর, তখন শিল্প সাহিত্য করে কী লাভ!

এই যে করা আর না করা-এই দোলাচলে আমরাও কনভিন্সড বড়। নাইবা প্রকাশ হলো বই, নাইবা করলাম প্রাতঃরাশ আড্ডা, নাইবা হলাম কিছু-তাতে আভূমিলম্বিত সময় ও সভ্যতার কী এসে যায়! অনেকের কাছে মঞ্চ আর দর্শকসারি যেমন এক, করা আর না করাও তাই সমার্থক। সকল করার বিপরীতে কিছু না করার মধ্যেও আছে আলাদা জীবনযাপনের 'বিউটি'। যেমন দামীরের বিশ্বভ্রমণ।

সংঘ-টংঘ বাদ দিয়ে নিজ নিজ জীবনের দিকে ফিরে যাওয়া মন্দ না। জীবন আসলে নিঃসঙ্গ, আনন্দভূক ও যাপনোন্মুখ।

জীবন- যাপন- উদযাপন- এর চেয়ে বড় কিছু নাই রে পাগলা !

মন ট্রামব্লান্ট

আবদুর রব

পাতা ঝরার আগে পাহাড় আর প্রকৃতির কোলে নিজেকে খুঁজে ফেরা

এবার মনট্রিয়লে এসে দেখি গাছের পাতাগুলি সব সবুজ। এখনো পাতা লাল হওয়ার কয়েকদিন বাকি আছে। তাই প্রায় দুই ঘণ্টার ড্রাইভ সেরে মন-ট্রামব্লান্ট (Mont-Tremblant) এলাম পাতা ঝরার আগের রঙিন পাতার বিচিত্র রূপ দেখতে। মন্ট্রিয়ল শহরের কোলাহল ছেড়ে হাইওয়ে ১৫ ধরে উত্তরের দিকে গাড়ি ছুটতেই মনে হলো যেন এক ভিন্ন জগতে প্রবেশ করছি। শহুরে ধূসরতা পেছনে ফেলে রেখে ধীরে ধীরে সবুজের দিগন্ত উন্মোচিত হতে থাকলো। পথের দুপাশে লোঁরাশিয়ান (Laurentian) পাহাড়ের হাতছানি, তাদের ঢেউ খেলানো অবয়ব মনকে এক অদ্ভুত প্রশান্তিতে ভরিয়ে দিচ্ছিল। যেতে যেতে চোখে পড়ল কিছু ম্যাপল গাছের পাতায় হালকা হলুদ আভা,

কোথাও আবার টকটকে লাল হয়ে উঠতে শুরু করেছে। সবুজ, হলুদ, কমলা আর লালের এমন মিশেল যেন রঙের ক্যানভাসে কোনো এক নাম না জানা শিল্পীর অর্ধসমাপ্ত তুলির আঁচড়। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, প্রকৃতি নিজেই এক বিশাল শিল্পী, আর শরৎকাল হলো তার শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম প্রদর্শনের মৌসুম।

রঙিন পাতার বিচিত্র রূপের পেছনে লুকিয়ে আছে এক চমৎকার রাসায়নিক গল্প। গ্রীষ্মকালে গাছের পাতায় ক্লোরোফিল (Chlorophyll) বা সবুজ রঞ্জক থাকে, যা সূর্যের আলো ব্যবহার করে খাদ্য তৈরি করে। এই ক্লোরোফিলের দাপটে পাতায় থাকা অন্য রংগুলো, যেমন হলুদ এবং কমলা (ক্যারোটিনয়েড), ঢাকা পড়ে থাকে। শরৎকালে দিন ছোট হয়ে আসে আর তাপমাত্রা কমতে শুরু করলে, গাছ ক্লোরোফিল তৈরি করা বন্ধ করে দেয়। ফলে সবুজ রং ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় এবং এতদিন লুকিয়ে থাকা হলুদ ও কমলা রঙগুলো প্রকাশিত হয়, ঠিক যেন পর্দার আড়াল থেকে মূল শিল্পীর বেরিয়ে আসা।

তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যাপারটি ঘটে লাল এবং বেগুনি রঙের ক্ষেত্রে। এই রংগুলো আসে অ্যান্থোসায়ানিন (Anthocyanin) নামক এক ধরনের রঞ্জক থেকে, যা গ্রীষ্মকালে পাতায় থাকেই না। শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল দিন এবং ঠান্ডা রাতের সংমিশ্রণে পাতায় তৈরি হওয়া শর্করা বা চিনি গাছের কাণ্ডে ফিরে যেতে না পেরে আটকে যায়। এই আটকে থাকা শর্করাই রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে লাল অ্যান্থোসায়ানিন তৈরি করে।

একারণেই যে বছর শরতে দিনের বেলা প্রচুর রোদ আর রাতে বেশ ঠান্ডা পড়ে, সে বছর ম্যাপল গাছের পাতাগুলো এমন টকটকে লাল হয়ে ওঠে, যা কুইবেকের শরৎকে কিংবদন্তিতুল্য করে তুলেছে। একেকটি গাছে এই রঞ্জক পদার্থের মিশ্রণের ওপর নির্ভর করে হলুদের আভা, কমলার তেজ আর লালের গভীরতা। প্রকৃতির এই রঙের খেলা সত্যিই বিস্ময়কর। এই সৌন্দর্য এতটাই মনোমুগ্ধকর যে, পথের ক্লান্তি কখন যে হারিয়ে গেল, টেরই পেলাম না।

পৌঁছাতে পৌঁছাতে আমাদের সাড়ে এগারোটা বেজে গেল। গিয়েই দেখলাম এক, দুই ও তিন নম্বর পার্কিং স্পেস কানায় কানায় পূর্ণ। অগত্যা চার নম্বর পার্কিং লটে গাড়ি রেখে বাসে করে রিসোর্ট এলাকায় গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। কেবল কারের সামনে বিশাল লাইন। এই জনসমুদ্র দেখেই বোঝা যায়, এখানকার অর্থনীতি কতটা পর্যটননির্ভর। শীতকালে স্কি আর স্নোবোর্ডিং, আর শরৎকালে এই 'ফল কালারস' বা রঙিন পাতা দেখতে আসা মানুষের ঢল। এখানকার স্থানীয় মানুষদের জীবন ও জীবিকা এই প্রকৃতির দানকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। হোটেল, রেস্তোরাঁ, ছোট ছোট স্যুভনিরের দোকান—সবই পর্যটকদের পদচারণায় মুখর। তাদের হাসিমুখ আর ব্যস্ততা দেখে মনে হলো, এই পাহাড় কেবল ভ্রমণপিপাসুদেরই নয়, এখানকার অধিবাসীদেরও হৃদয়ের স্পন্দন।

কেবল কার থেকে দেখা মন-ট্রাম্বলান্ট গ্রাম আর তার চারপাশের রঙিন প্রকৃতি

তবু দাঁড়ালাম। বেবির পায়ের অবস্থা বিশেষ ভালো না। মূল ট্রেইলে হাঁটার জন্য ওর শক্তি সঞ্চয়ের কথা ভেবে কেবল কারে উপরে উঠলাম। কেবল কারে চড়ে ধীরে ধীরে উপরে ওঠার সময় চারপাশের দৃশ্যপট জাদুর মতো বদলে যাচ্ছিল। পায়ের নিচের রঙিন গ্রাম, ছোট ছোট ঘরবাড়ি আর লেকের নীল জলড়সবকিছু যেন এক ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে উঠল। মনে হচ্ছিল যেন এক বিশাল রঙিন চাদরের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি। এই অপার্থিব সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন, এ শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করার।

ট্রেইলে হাঁটার চেয়ে আমরা ছবি তুলতে থাকি, অল্প অল্প করে উপরে উঠি আর হাঁটি। যেন বেবি বসে না পড়ে। উপরে উঠতে উঠতে দেখি পাহাড়ি ঢালে গাছের মাথাগুলো সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে, কোথাও পাতার নিচে ছায়া যেন গভীর অরণ্যের মতো রহস্য ছড়িয়ে দিয়েছে।

পাহাড়ি ঝরনা আর গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে আমাদের হাতছানি দিতে থাকে। আমরা সঁতিয়ে লে রুইসো (Sentier Les Ruisseaux) ধরে একটু একটু করে এগিয়ে যাই। এর নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এর আসল পরিচয়; 'লে রুইসো' মানে 'ছোট ছোট ঝরনা বা জলস্রোত'। এই ট্রেইলটি আসলে একাধিক পাহাড়ি ঝরনার যাত্রাপথকেই অনুসরণ করে চলে, তাই জলস্রোত যেন হাঁটার পথে এক বিশ্বস্ত সঙ্গী হয়ে থাকে। পথের পাশে মসৃণ পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে চলা স্বচ্ছ জলের মৃদু কলকল শব্দ এক প্রাকৃতিক সঙ্গীতের মতো, যা শহুরে জীবনের সব ক্লান্তি আর কোলাহল মুহূর্তেই ভুলিয়ে দেয়। ম্যাপল আর বার্চ গাছের ঘন ছাউনি ভেদ করে

সঁতিয়ে লে রুইসো ট্রেইলের ঝরনা, শান্ত পথ, আর ছোট কাঠের ব্রিজ

সূর্যের আলো যখন ভেজা মাটির ওপর পড়ে, তখন এক মায়াবি আলো-ছায়ার নকশা তৈরি হয়, যা পুরো পরিবেশকে আরও রহস্যময় ও শান্ত করে তোলে। এটি শুধু হাঁটার পথ নয়, এ যেন প্রকৃতির নিরাময় কেন্দ্রের প্রবেশ- দরজা।

এই ট্রেইলটি বেছে নেওয়ার কারণ এর অবস্থান ও দৈর্ঘ্য প্রায় ২ কিলোমিটার। হাঁটতে সময় লাগে ৪৫-৬০ মিনিট। উচ্চতা মাত্র ৮২ মিটার। ট্রেইলটি মন-ট্রামব্লান্ট গ্রাম থেকে শুরু হয়ে পাহাড়ের পাদদেশে চলে গেছে। ছায়াময় পথ, প্রশস্ত এবং বেশিরভাগ সময় সমতল, যা হাঁটার জন্য খুব আরামদায়ক। ট্রেইলের মধ্যে রয়েছে ছোটো ছোটো কাঠের ব্রিজ, ঝরনা, এবং শান্তিপূর্ণ বিশ্রামস্থল, কাঠের বেঞ্চ। হাঁটার জন্য বা ধীর গতিতে প্রকৃতির মাঝে সময় কাটানোর জন্য এ এক আদর্শ পথ। পরিবারগুলো তাদের ছোটো ছোটো বাচ্চাদের নিয়ে এই পথ দিয়ে যাচ্ছে। বাচ্চারা ভীষণ খুশি। ওদের ভাবখানা এমন যেন ওরাই সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। আসলে বাচ্চারা বড়দের অভিনয় করতে ভালোবাসে।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই বাতাসে এক ধরনের শীতল গন্ধ পেলাম। ভেজা মাটির সাথে মিশে থাকা শুকনো পাতার সুবাস। সেই গন্ধ শরীরের ভেতরে এক অদ্ভুত প্রশান্তি আর তীব্র আবেগ এনে দিল। মনে হলো, এই সুবাস যেন প্রকৃতির নিজস্ব আত্মা, যা আমার সত্তার সাথে মিশে যাচ্ছে। এই মুহূর্তের বিশুদ্ধতা আর নির্মলতা জীবনের সমস্ত জটিলতা ভুলিয়ে দেয়।

এখানে আরও বেশ কয়েকটি ট্রেইল আছে, লা ভিলাজোইজ দে মঁ-ত্রঁব্লা (La Villageoise de Mont Tremblant), লে প্তি ট্রঁদ্যু নর্ (Le P'tit Train du Nord), সঁতিয়ে ত্রঁ সো সঁসঁ (Sentier 360), এবং গ্রঁ ব্রুলে (Grand Brûlé)। এগুলো বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ও উচ্চতার। কোনোটা কাছের, কোনোটা আবার বেশ দূরের। যার যেমন অভিজ্ঞতা বা ইচ্ছা সে তেমন দূরের বা উচ্চতার ট্রেইল বেছে নেয়। প্রতিটি ট্রেইল নামের মতোই রহস্যময় গল্প বলে। যেমন লা ভিলাজোইজ শান্ত আর আরামদায়ক; লে প্তি ট্রঁ দ্যু নর্ চ্যালেঞ্জিং, ওপরে উঠলে দূরের দৃশ্য দেখায়; আর গ্রঁ ব্রুলে পাহাড়ি শিখরের সৌন্দর্যকে তুলে ধরে। প্রতিটি ট্রেইল যেন প্রকৃতির এক একটি অধ্যায়, পা বাড়ালেই তা জানা যায়।

মন-ট্রামব্লান্ট এর আদিবাসী আলগনকুইনদের কাছে চারপাশের পাহাড়, নদী, অরণ্য সবই ছিল দেবতার দান। দূরের এক বিশাল পাহাড় মাঝে মাঝে গম্ভীর গর্জনের মতো শব্দ করে, যেন ভেতর থেকে কেঁপে ওঠে। তখন থেকে নাম হলো "Manitonga Soutana" বা "দেবতার কাঁপানো পাহাড়"। পরে ফরাসি অভিযাত্রীরা শুনে নাম রেখেছে "মন-ট্রামব্লান্ট", ফরাসি উচ্চারণ "মঁ-ত্রঁব্লা"। পাহাড়ের এই কাহিনি আজও চালু আছে। শুধু এই লোকগাথাই নয়, এখানকার সংস্কৃতিতেও আদিবাসী এবং ফরাসি প্রভাব স্পষ্ট। রিসোর্টের রঙিন, ইউরোপীয় ধাঁচের স্থাপত্যকলা, স্থানীয় আর্ট গ্যালারিতে প্রদর্শিত শিল্পকর্ম এবং মাঝে মাঝে ভেসে আসা ফরাসি লোকসংগীতের সুর। সবকিছু মিলেমিশে এক অনন্য সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি করেছে। সেপ্টেম্বরের শেষে এখানে 'সিম্ফনি অব কালারস' (Szmphony of Colours) নামে একটি উৎসব হয়, যেখানে প্রকৃতি আর সংগীতের এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটে।

এই সমস্ত সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ পর্যটকদের কেবল প্রকৃতির কাছেই টানে না, এই অঞ্চলের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গেও একাত্ম করে তোলে।

এর আগে বার কয়েক এসেছি এখানে, গ্রীষ্ম ও শীতে। এবার ফলের (fall) শুরুতে। কিন্তু কোনোবারই পাতা ঝরা দেখা হয়নি কিংবা ট্রেইল দিয়ে চলাও হয়নি। শীতের সময় এসে কেবল কারে সবচেয়ে উপরে উঠে নিচে দেখতে দেখতে এসেছি। যতবারই আসি, মন-ট্রামব্লান্ট যেন নতুন রূপে নিজেকে উপস্থাপন করে। গ্রীষ্মে সবুজের সমারোহ, শীতে তুষারের সাদা চাদর, আর শরতে রঙিন পাতার সিম্ফনি। প্রত্যেক মৌসুমেই পাহাড় নতুন সাজে অভ্যর্থনা জানায়।

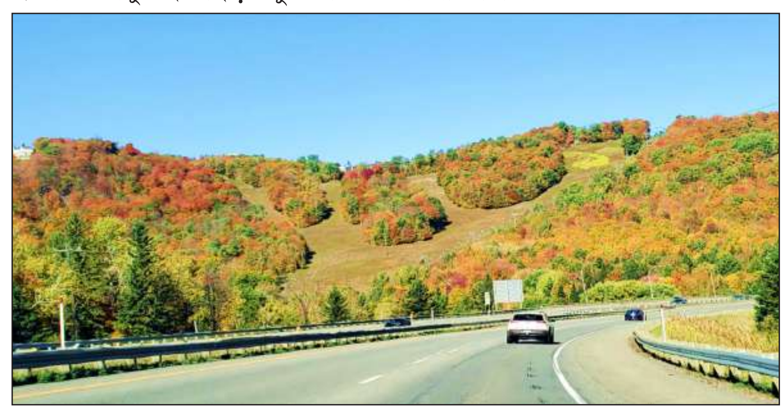

মন-ট্রামব্লান্টের পথে, হাইওয়ের দুপাশে শরতের রঙের প্রথম ছোঁয়া

বাবল টি নেয়ার সময় ছবি দেখে চমৎকৃত হই

ফল (fall) শব্দের উৎপত্তি ও দার্শনিকতা ভাবতে বসে মনে হলো, ফল শব্দটার সাথে কোথাও না কোথাও পাতা ঝরার একটা সম্পর্ক আছে। অভিধান খুলে দেখলাম ঠিক তাই। পুরানো ইংরেজিতে ডাকা হতো Fall of the Leaf (পাতা ঝরার সময়)। ১৬শ শতকের দিকে ছোট করে শুধু fall ব্যবহার শুরু হয়। ইংরেজি সাহিত্যে শুরুতে অবশ্যই harvest শব্দটাই বেশি ব্যবহৃত হতো মৌসুম বোঝাতে। আজকাল দেখি fall মূলত আমেরিকান ইংরেজিতে বেশি প্রচলিত, আর autumn বেশি ব্রিটিশ ইংরেজিতে। পাতা ঝরা কেবল প্রাকৃতিক ঘটনা নয়, জীবনের অমোঘ নিয়মের প্রতিফলন। এই ঝরে পড়া যেমন এক শেষের ইঙ্গিত দেয়, তেমনি নতুন করে শুরু করার প্রতিশ্রুতিও বহন করে। ঝরা পাতার নিচে লুকিয়ে থাকে নতুন বসন্তের অঙ্কুর। যতই পাতা রাঙিয়ে উঠুক, fall শব্দটা শুনলে আমার মনটা তাই বিষণ্ন হয়ে পড়ে, জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্বের কথা ভেবে এক গভীর দার্শনিকতায় ছেয়ে যায় মন।

মন-ট্রামব্লান্ট জায়গাটা ক্যাসিনো এবং আইস স্কিইংয়ের জন্যেও বিখ্যাত। রাজ-রাজড়াদের কারবার। আমাদের মতো সাধারণ পর্যটক গ্রামের সুন্দর বাড়িঘর, প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘুরতে ঘুরতে মুগ্ধ হয়ে ফিরে যায়। তবে বারবার ফিরে আসতে ইচ্ছে করে এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য।

ফেরার আগে বেশ ক্ষুধা আর তৃষ্ণা পেল। ঠিক হলো এখানকার টি-বাবল খেতে হবে। তারপর লাফালে (Laval) গিয়ে স্মোকমিট স্যান্ডুইচ দিয়ে ডিনারর করবো। বেবি লিচু ফ্লেভার নিল আর আমি ব্লুবেরি। দাম বেশ ভালোই নিল—প্রতি কাপ ১৫ কানাডিয়ান ডলার। তা নিক, শখ বলে কথা! তাছাড়া খেতে বেশ মজা, কিন্তু বরফ ব্লেন্ড করে দেওয়ায় পেটের ভিতরে গিয়ে পৌঁছায় ঠান্ডা। বেবিকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কি অবস্থা? ও বলল, সব ঠিক আছে। শপের নামটা বেশ কাব্যিক, 'লে বেলভেদেয়ার-দ্যু লাক উইমে' (Le Belvédère-du-Lac-Ouimet) ভিতরে ঢুকে একটা ছবি আমার বেশ নজর কাড়লো।

অনেকক্ষণ প্রকৃতির মাঝে বিভোর হয়ে থাকার পর, অবশেষে ফেরার প্রস্তুতি শুরু হলো। ওখানকার চমৎকার স্পোর্টস সেন্টারটির ঝকঝকে ওয়াশরুমে যখন ফ্রেশ হচ্ছিলাম, আয়নার প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, এইমাত্র যে জগতটা দেখে এলাম, তার রেশ যেন চোখেমুখে লেগে আছে। একরাশ ক্লান্তি আর একবুক ভালো লাগা নিয়ে ধীর পায়ে বাসে উঠে ৪ নম্বর পার্কিং লটের দিকে এগোতে থাকলাম। প্রতিটি মুহূর্তই যেন জানান দিচ্ছিল, এবার সত্যিই যাওয়ার পালা।

গাড়ির চাকা যেই মুহূর্ত থেকে ঘুরতে শুরু করলো, বুকের ভেতর একটা চাপা হাহাকার বেজে উঠলো। মন চাইছিল না ফিরে যেতে। ঠিক তখনই প্রকৃতি তার শেষ ভালোবাসাটুকু যে উজাড় করে দিতে চাইলো। পশ্চিম আকাশে সূর্য তখন অস্তগামী, তার আবির রাঙা আভা পাহাড়ের চূড়াগুলোকে আলতো করে ছুঁয়ে দিচ্ছিল; যেন এক স্নেহমাখা বিদায় চুম্বন। সে এক আশ্চর্য মায়াবি দৃশ্য! ঝরে পড়ার অপেক্ষায় থাকা রঙিন পাতাগুলোর উপর সেই নরম আলো পড়ে মনে হচ্ছিল, পুরো বনভূমিটাই যেন এক অপার্থিব, স্বর্গীয় আলোয়ান করছে। চারপাশের চেনা জগৎটাকে কেমন অচেনা আর স্বপ্নিল লাগছিল।

গাড়ির কাচের ভেতর দিয়ে অপলক তাকিয়ে ছিলাম সেই দৃশ্যের দিকে। মনের অজান্তেই ফিসফিস করে বলে উঠলাম, "বিদায়, প্রিয় মন-ট্রামব্লান্ট! তোমার এই অপার সৌন্দর্য, এই নিস্তব্ধ, ধ্যানমগ্ন রূপ আমার হৃদয়ের গভীরে খোদাই করে নিলাম। তোমার পাহাড়ের নিরবতা, লেকের স্বচ্ছ জল, আর পাতার বর্ণিল উৎসব, সবই আমার সত্তার অংশ হয়ে থাকবে। যদি কখনো সুযোগ হয়, আমি আবার ফিরে আসব তোমার হৃদয়ের স্পন্দন শুনতে, তোমার গম্ভীর দৈববাণী শুনতে। ঐশ্বরিক বার্তার অর্থ খুঁজে নিতে। ততদিন পর্যন্ত এই স্মৃতিটুকুই থাক বেঁচে থাকার পাথেয় হয়ে ।"

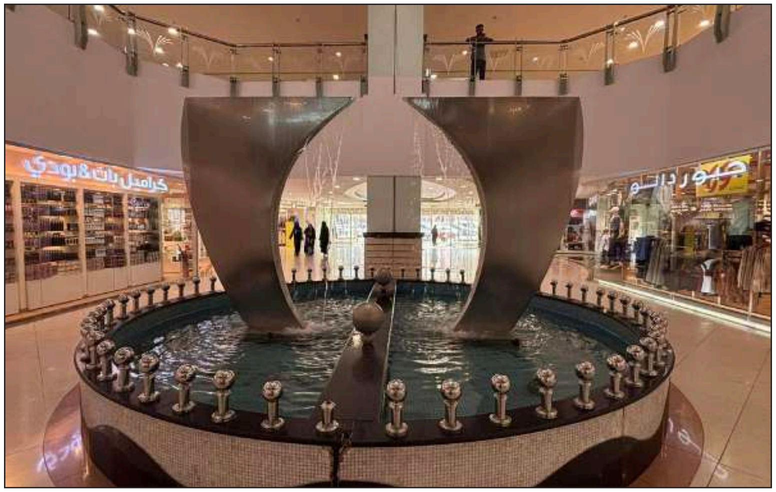

মক্কার যাত্রী

কামরুল হাসান

পূর্বলেখ

আমরা যারা মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি তারা শৈশব থেকে দুনিয়ার আর কোনো নগরীর নাম না শুনলেও মক্কা-মদিনার নাম শুনেছি। সম্ভবত সে বয়সে দেশের চৌহদ্দির বাইরে নগরী বলতেই মক্কা-মদিনা। তারা তো কেবল নগরী নয়, তারা হলো ইসলামের সূতিকাগার, পবিত্র নগরী। যে মুসলমান কখনো বিদ্যালয়ে যায়নি, এদের সংখ্যা, বিশেষ করে বাংলাদেশ, কম নয়, তারা কখনো ভূগোল পড়েনি সত্যি, কিন্তু নবীর দেশ আর নবীর জন্মস্থান মক্কা ও হিজরতের নগরী মদিনার নাম কেবল তাদের ঠোঁটে নয়, হৃদয়ে স্থান করে আছে। দরিদ্র কৃষকটিও স্বপ্ন দেখে সে সারাজীবন ধরে অর্থকড়ি সঞ্চয় করে মক্কায় হজ্ব করতে যাবে, নবীজীর কবর জেয়ারত করবে। এটা তার self actualization need.

আমাদের শৈশবে হজ্ব করা ছিল বহুদিনের সাধনা আর কষ্টের মিলিত ফসল। তখন জাহাজে চড়ে মক্কায় যেতে হতো, বহুদিন নয়, বহুমাস লেগে যেত। সারাজীবনের সঞ্চয় তো, হজ্ব করতে অনেকেই যেত জীবনের সায়াহ্নবেলায়, অনেকেই জীবিত হয়ে ফিরত না। যারা ফিরে আসত তারা যেন যুদ্ধজয়ী গাজী, নামের অগ্রভাগে আলহাজ্ব উপাধি বসিয়ে তারা হয়ে উঠত রীতিমতো নায়ক, আমজনতার শ্রদ্ধাভাজন শ্রেণি।

এখন হাওয়াই জাহাজে উড়ে যাওয়াটা সহজ হয়েছে, হজ্ব পালনের কষ্টও কমে এসেছে প্রযুক্তির কল্যাণে, খরচ কিন্তু কমেনি। দরিদ্র কৃষক এখনো হজ্ব করার স্বপ্ন দেখে চলে। টাকা দুষ্টের হাতেও আছে, আর আছে বলেই শিষ্টের পাশাপাশি দুষ্টও হজ্ব করতে যায়। দুষ্টের তাগিদ শিষ্টের চেয়ে বেশি। জীবনভর সে যেসব অপরাধ করেছে সেসব অপরাধ থেকে নিস্কৃতি পাওয়া তার জন্য অতীব জরুরি। দুষ্ট তাই বারংবার হজ্ব করে, আর নিজের সীমাহীন অপরাধের জন্য সৃষ্টিকর্তার অসীম দয়া চায়। আলহাজ্ব বা হাজী উপাধিটিও এদের কারণে পুরনো ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে।

বিদ্যালয়ে আমাদের আবশ্যিক সাবজেক্ট ছিল ইসলামিয়াত, মাদ্রাসার হুজুরদের কাছে আরবি ও কোরান শেখাও সমান্তরালে চলত। সুতরাং আমরা যত বেশি দোয়াদরূদ মুখস্ত জানি, খুব কম বিষয় আমাদের স্মৃতিতে অতখানি রয়েছে। অর্থ না বুঝলেও আমরা বেশিরভাগ আরবিতে কোরান পড়তে পারি। মাতৃভাষা আর ইংরেজির পরে যে ভাষাটি আমাদের চর্চার ভেতর জীবন্ত তা আরবি। বেশিরভাগ মুসলমানের চোখে সৌদি আরব হলো পবিত্রভূমি, সেখানে যেতে পারা একজীবনের সৌভাগ্য।

আমার আগ্রহ অন্যত্র। বিদ্যালয়ে পাঠের সূত্রেই ইসলামের ইতিহাস কিছুটা হলেও জানি। আমার আগ্রহ ইসলামের ইতিহাসে, আর যে ভূগোলে অত ইতিহাস ঘটে গেছে সে ভূগোলও আমাকে টানে। সৌদি আরবে যাওয়া, মক্কা-মদিনা দেখা, প্রত্যক্ষদর্শনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা আমার।এ ইচ্ছার কথা বলেছিলাম আমার কলেজ জীবনের সহপাঠী বন্ধু আনোয়ারুল হককে। আনোয়ার একজন চিকিৎসক আর পেশাগত সূত্রে সে বহুবছর ধরে সৌদি আরবে বসবাস করে। কেবল আনোয়ার নয়, সৌদি আরবে অনেকবছর ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়েছে আমার আরও কিছু চিকিৎসক বন্ধু।আনোয়ারসহ এদের সকলেই ঢাকা মেডিকেল কলেজে আমার সহপাঠী ছিল। শুধু ডিএমসি নয়, আনোয়ারকে চিনি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ব রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ থেকেই।

আমার সৌদি আরব ভ্রমণের প্রধান উৎসাহদাতা ডা. মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক। আমি মক্কায় যাচ্ছি প্রধানত তার অনুপ্রেরণা ও আয়োজনে।

তখনো চশমা ওঠেনি চোখে,আমি শখ করে জিরো পাওয়ারের চশমা পরতাম। কেননা, তাতে নিজেকে একটু বুদ্ধিদীপ্ত মনে হতো। আমার বন্ধুরা চশমা হাতে নিয়ে

অপেক্ষমান ওমরাহযাত্রীদল

জিজ্ঞেস করত, পাওয়ার কত? আমি যখন বলতাম, জিরো পাওয়ার, তারা বিশ্বাস করত না। চশমা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলত, কই, দিব্যি পাওয়ার আছে। এর কিছুকাল পরে আমার সত্যি চশমা দরকার হলো, তবে লো পাওয়ার। বন্ধুরা একই প্রশ্ন শুধালে আমি বলতাম, হালকা পাওয়ার, পজিটিভ। তারা চক্ষু বিশেষজ্ঞের মতো চশমা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলত, দূর, পাওয়ার কোথায়? জিরো পাওয়ার।

আমি সৌদি আরব যাব শুনে আমার আত্মীয় স্বজন যারা আমাকে চেনে তারা খুব খুশি। মনে মনে বলে দেরিতে হলেও শুভ বোধের উদয় ঘটেছে। আমি যতই বলি, আমি বেড়াতে যাচ্ছি, তারা বিশ্বাস করে না। বলে, আপনি ওমরাহ করতে যাচ্ছেন। ভালো তো পবিত্র কাজে যাচ্ছেন। আরেকদলকে তখন বলি, আমি সৌদি আরব যাচ্ছি ওমরাহ করতে, তারা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যানুসন্ধান করে। আমার কথা বিশ্বাস করে না। বলে, আপনি যাচ্ছেন ওমরাহ করতে? বিশ্বাস করি না। বলুন, ভ্রমণে যাচ্ছেন সৌদি আরব।

আমি এরপর যার সাথে দেখা হয় তাকেই বলি, আমি সৌদি আরব যাচ্ছি ওমরাহ করতে, সাথে দেশটি দেখব। প্রথমে ওমরাহ বললে তারা বেশিরভাগ শান্তি পায়। তবে ভাবে ভ্রামণিক যখন তখন ভ্রমণ তো করবেই। হজ্ব তো একপ্রকার ভ্রমণই। লৌকিক জগৎ থেকে আধ্যাতিক জগতে ভ্রমণ।

আমি যাচ্ছি সেই মক্কায়।

১

সৌদি আরব যাবার তোড়জোড় চলছিল অনেকদিন ধরেই। সেই যেবার আমরা বাহরাইনে গেলাম, সেবারই সমুদ্রের উপর নির্মিত কিং ফাহাদ কজওয়ে ধরে সৌদি চেকপোস্ট পর্যন্ত গিয়েছিলাম, সৌদি ভিসা না থাকায় সেতুর বাকি পথটি, সেটিই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, পাড়ি দিতে পারিনি। অথচ সৌদি দূতাবাসের অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল, ভিসা নিতে পারিনি সময়াভাবে।

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে যদি অপশন দেওয়া হয় পৃথিবীর কোনো একটি দেশে যাওয়ার তাহলে আমেরিকার পরে সৌদি আরবই শীর্ষে থাকবে। এর কারণ অবশ্যই ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতি। মক্কা-মদিনার নামে কেঁদে জারে জার হতে আমি বহু মানুষকে দেখেছি। কেবল হজ্বব্রত পালন কিংবা পুণ্যলাভ নয়, কর্মসংস্থান ও অর্থলাভের জন্য সৌদি আরব বাংলাদেশিদের প্রিয় গন্তব্য। আমার তেমন কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, আমি শৈশবে পঠিত ইসলামের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো মেলাতে চাই কেবল।জানি চৌদ্দ বা পনেরশত বছর আগের কোনো কিছুই আর বর্তমানের সাথে মিলবে না। পেট্রোলিয়ামের খনি আবিষ্কার আর পেট্রোডলারের আগমন পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে সৌদি আরবকে। দেড় হাজার বছর আগের দরিদ্র দেশটি এখন রীতিমতো ধনী। দেড় হাজার বছর অবশ্য অনেক সময়, তখন আজকের ধনবান ইউরোপও দরিদ্র ছিল আর আমেরিকা আবিষ্কৃতই হয়নি।

কেন জানি না আমার প্রস্তাবটি আনেয়ারের মনঃপূত হলো। সে বল্ল, চলে এসো, রিয়াদে আমার বাসাতেই তুমি থাকবে। সমস্যা ছিল সময় মেলানো। সে ফুরসৎ মিল্ল, ফেব্রুয়ারির শুরুতে যখন হেমন্তকালীন সেমিস্টার শেষ হলো, আর বসন্তকালীন সেমিস্টার রইল এক পক্ষ দূরে। সৌদি আরবের যে দূরত্ব তাতে রিটার্ন টিকিটের দাম ৬০ থেকে সত্তর হাজার হলে মানানসই, কিন্তু আগেভাগে না কিনলে যত দিন এগুতে থাকে টিকিটের দাম তত চড়ে যায়। আর রোজার আগে ওমরাহ হজ্বের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় টিকিটের দাম গিয়ে লাখের অংক ছুঁলো। ভেবেছিলাম ভিসা পেতে সমস্যা হবে।কিন্তু ভিসা পেলাম দুদিনেরও কম সময়ে। তবে ট্যুরিস্ট ভিসা না হয়ে ওমরাহ ভিসা। ভিসা এজেন্ট যখন জানাল ওমরাহ ভিসা নিয়ে শুধু মক্কামুখী হবার বাধ্যবাধকতা নেই, ঘোরা যাবে সমগ্র সৌদি আরব, তখন বেড়ালটি সাদা না কালো তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা রইল না। নতুন ঝামেলা হলো মেনেনজাইটিস রোগের ভ্যাকসিন নেওয়া।

ভিসার বিশ্বস্ত এজেন্টের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি বাসরুট ১/এ র সহযাত্রী এনামুল হক। টিকা যে দশদিন আগে নিতে হবে আর দেরি হলে টিকা ফুরিয়ে যায় এমন আশঙ্কার কথা জানিয়েছিল সহকর্মী ড. মাসুদুর

রহমান। অভিজ্ঞতা থেকেই সে জানত বিষয়টি। আমি তখন ছুঁটলাম যত দ্রুত সম্ভব টিকা নেবার চেষ্টায়। প্রথমে গেলাম বনানীর প্রভা হেলথকেয়ার সেন্টারে। তারা জানাল টিকা আছে, তবে সরকারি অনুমোদন তারা পায়নি। টিকা দিতে কেন সরকারি অনুমোদন লাগবে ভেবে কূল-কিনারা পেলাম না। ছুটলাম তালিকায় দ্বিতীয় ইবনে সিনা হাসপাতালে। সেখানেও একই অনুমোদন সমস্যা আর টিকা আছে মাত্র তিনটি। দূতাবাসের ঘোষণা আসামাত্রই বহুলোক, ওমরাহপ্রত্যাশী সকলেই, দলে দলে ভীড় করছে ইবনে সিনায়। মেনেনজাইটিস টিকা তখন যেন ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচের টিকিট। আমি নার্সকে রাজি করালাম তিন টিকার একটি আমাকে পুশ করতে, সরকার তাতে বেজার হলে হোক।

টিকা তো নিলাম, ভিসা এজেন্ট বল্ল, সার্টিফিকেট নিতে। আবার ছুটলাম ইবনে সিনায়। গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য, সার্টিফিকেট নিতে দিতে হবে অতিরিক্ত ৫০০। তাই সই, কিন্তু পাসপোর্ট আর এনআইডির ফটোকপি তো নেই। সেদিন ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরলাম। পরদিন প্রভাতে গিয়ে সংগ্রহ হলো পরমপ্রার্থিত ভ্যাকসিনেসন সার্টিফিকেট।

এরপর বাকি থাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদেশ যাবার অনুমতিপত্র সংগ্রহ। তাও সংগ্রহ হলো নির্বিঘ্নে। তবে বিদেশ যাবার আগে সেমিস্টার গ্রেড জমা দেওয়া আমার অবশ্য কর্তব্য। ফেব্রুয়ারির ৩ তারিখে ফ্লাইট, গ্রেড জমা দেবার, আমার জন্য, ডেডলাইন ২ ফেব্রুয়ারি। প্রশ্ন বানানো, পরীক্ষা নেওয়া, খাতা দেখা, গ্রেডিং করা- সব চল্ল প্রচণ্ড চাপে থেকে। উদয়াস্ত পরিশ্রম আর উড়িবার উদগ্র বাসনায় সম্ভব হলো সবই। সম্ভব হতো না যদি না আমার আন্ডারগ্রাজুয়েট টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট অদিতি রায় সাহায্য না করত। সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে অদিতি রায়ের। আমার সংকট বুঝে তবু সে দুদিন এলো ঘরভর্তি নতুন অতিথিদের আপ্যায়ন করার সামাজিকতা ফেলে।

২

বিমানবন্দরে পৌঁছেছি কিছুটা দেরিতে। দেরি হলে যা হয় একটা তাড়াহুড়ো লেগে যায়। উবার থেকে নেমে কোনো লাগেজ ট্রলি পেলাম না। লোকজন এমনভাবে লাগেজ ট্রলি নিয়ে কাড়াকাড়ি করে যে মনে হয় ওটা পেলেই মোক্ষলাভ। এমনকি যে আকাশে উড়বে না তারও চাই লাগেজ ট্রলি। নাকি ওটাই আরব্য রজনীর ম্যাজিক কার্পেট? বাধ্য হয়ে দুটি সুটকেস তাদের স্বনির্ভর চাকায় চড়িয়ে টেনে নিয়ে যাই। প্রাথমিক স্ক্রিনিংয়ের পর অবশ্য একটা ট্রলি পাই আর ট্রল করা ডিজিটাল পর্দার দিকে চোখ রাখি। ওমান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটের সারিতে কোনো চেক-ইন কাউন্টার লেখা নেই, ঘড়ি বলছে চেক-ইন শুরু হয়েছে অন্তত: চল্লিশ মিনিট

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর

আগে। বাধ্য হয়ে হেল্প ডেস্কের সাহায্য নেই। ডেস্কের বিনয়ী মেয়েটি জানাল চেক-ইন হচ্ছে শুরুর (A) কাউন্টারে।

A ব্লকের সবগুলো কাউন্টারই ওমান এয়ারলাইন্সের যাত্রীদের চেক-ইন করাচ্ছে। কিন্তু সরাসরি যাওয়া বারণ, ওই এয়ারলাইন্সেরই এক কর্মী প্রবেশপথে টেবিল বসিয়ে যাত্রীদের পাসপোর্ট, ভিসা, টিকিট ইত্যাদি পরীক্ষা করছে। ভাবি এসব কাজ তো মূল কাউন্টারেই হয়, ডাবল কাজের দরকার কী? আমার সমুখের দুজন যাত্রীকে ওই লোক যখন ফিরিয়ে দিল, এগুতে দিল না সমুখে, তখন অনুমান করলাম এ-ই হলো ভাগ্যবিধাতা। কে যেতে পারবে আর কে পারবে না- সে ঠিক করে দেয়। আমার কাগজপত্র অনেকক্ষণ পরীক্ষা করার পরে সে যখন ডেস্ক ছেড়ে পাসপোর্ট ইত্যাদি নিয়ে তার বসের কাছে গেল আমি প্রমাদ গুনলাম। অনেকক্ষণ পরে সে ফিরে এলে জিজ্ঞেস করলাম, সমস্যা কী? তার উত্তর রিটার্ন টিকিট সিস্টেম দেখাচ্ছিল না। এখন দেখিয়েছে? রাগত স্বরে জিজ্ঞেস করি? সে বিব্রত হয়ে 'হ্যাঁ' বললে আমি তাকে বাংলায় যাকে বলে 'ঝাড়ি', তা দেই আর গজগজ করতে করতে কাউন্টারের দিকে এগুই।

দুই সুটকেসের ওজন দাঁড়িয়েছে ২৪ কেজি। আমার জন্য বরাদ্দ কুড়ি কেজি। বন্ধুদের জন্য নেওয়া বইগুলো সুটকেস থেকে নামাতেই ওজন কমে হলো ১৮। চেক-ইন কর্মী কিছু বই ফের সুটকেসে ঢুকাতে পরামর্শ দিল। পারফেক্ট ২০ করে তার শান্তি আর আমার অশান্তি কিছু বই হাতে বহন করতে হবে। আমি যখন

মাসকাট বিমানবন্দরে লেখক

উইন্ডো সিট চাইলাম তখন সে প্রস্তাব দিল সমুখের সারির সিট কিছু অর্থ ব্যয় করে কিনে নিতে, তাতে নাকি আপগ্রডেশনের সুযোগ থাকে। আমি রাজি না হলে সে আমাকে দেয় ২৬-এ সিটটি। ওটাও জানালার পাশেই তবে প্লেনের মধ্যভাগে। ভাবি,না জানি পাখার উপরে গিয়ে পড়ি। তখন ভূগোলকের দৃশ্য নয়, পাখার অ্যালুমিনিয়াম গাত্র দেখতে হবে।

ইমিগ্রেশন কাউন্টারগুলোতে লম্বা লাইন দেখে গেটের কাছে পাসপোর্ট চেক করা ইমিগ্রেশন নারী পুলিশকে শুধালাম ওই যে বিদেশি পাসপোর্টের লাইন, তিন দেশি যাত্রী দাঁড়িয়ে, বিদেশি কেউ নেই, সংক্ষিপ্ত সে লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে পারি কিনা? তখন বেলা ঠিক দুটো, শিফট চেঞ্জ চলছে, মর্নিং শিফটের ইমিগ্রশন পুলিশের ডিউটি শেষ, সে উঠবার জন্য ব্যাকুল। আমাদের ইশারা করছে অন্য লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে। আমি অনুরোধ করতে, কী জানি, আমার কালো কোট দেখেই হয়তো বা, ইশারা করল তার কাউন্টারের কাছে যেতে। যাদের গায়ে কোট নেই, তারা চলে গেল লম্বা লাইনের পেছনে। ইমিগ্রেশন পুলিশের নাম যে হেদায়েত তা জানলাম তাকে রিপ্লেস করতে আসা তারই সহকর্মীর মুখে। আমি মনে মনে বলি, আল্লাহ যেন তাকে হেদায়েত করে আর সে দ্রুত আমার পাসপোর্টে Departure সীল বসিয়ে দেয়। হেদায়েত চাইল বিদেশ যাত্রার অনুমতিপত্র (NOC)। ভাগ্যিস ইউনিভার্সিটি থেকে মনে করে সেটা এনেছিলাম।

আমি ছুটি দোতলায়, স্কাই লাউঞ্জে গিয়ে সেঁধোই। কাউন্টারের দুই পুরুষ, এক নারী- তিনজনই সুবেশধারী, সুঅবয়বের আর সুবিনয়ী। ইস্টার্ন ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড হোল্ডাররা যে বিদেশ যাচ্ছে তাতে তারা খুশি। ভেতরে যারা আপ্যায়নে ব্যস্ত তারা খুশি অভুক্ত যাত্রীদের পেট ভরে খাইয়ে। এখানে আমার পছন্দ হলো ফলের রস আর পুডিংজাতীয় মিষ্টান্ন। সঙ্গে অবশ্য চিকেন ফ্রাই দুপিস আর লেবুর রসে ভিজিয়ে রাখা ভেটকি মাছের কয়েক স্লাইস নেই। আহারের পরে মনে পড়ল ডলার কিংবা রিয়েল- কোনটিই আমার পকেটে নেই। নিচে নেমে ৫০০ সৌদি রিয়েল কিনি প্রতি রিয়েল ৩৩ টাকা ৬০ পয়সা দরে। সেটি মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের কাউন্টার, তাদের কাছে ৫০০ এর নিচে কোনো সৌদি টাকার নোট নেই। অনেকেই ফিরে যাচ্ছিল খুচরো নোট চেয়ে ও না পেয়ে। আমি ফের দোতলায় যাই আর দেখা পাই আমার প্রাক্তন ছাত্র দেব-এর। সেও মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি করে আর এ মুহূর্তে ব্যাংকটির এয়ারপোর্টে লাউঞ্জের দায়িত্বে রয়েছে। আমি ঢুকি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের ইমপেরিয়াল লাউঞ্জে। সেখানে দোতলার লাউঞ্জে রাজকীয় সমাদরই পাই, মেজবাহ নামের যুবা আমাকে একটি ড্রিংক বানিয়ে আপ্যায়ন করে। কাগজের রুমালের প্রিন্ট থেকে আবিষ্কার করি দুটি ব্যাংকের দুটি লাউঞ্জই ম্যানেজ করে হোটেল ওয়েস্টিন। লাউঞ্জ মানেই তাহলে ফাইফ স্টার।

ঘড়ি যখন সাড়ে তিনটার দিকে যাত্রা শুরু করেছে তখন ভাবি আমাকে আধুনিক যুগের জমিদারি এই লাউঞ্জের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে বিমানে চড়তে হবে। আর অপেক্ষা করা ঠিক নয়। কেননা, প্লেন তো আর বাস নয়, সেখানে চড়তে অনেক ঝক্কি। ডিপারচার করিডরের একবারে শেষপ্রান্তে ১১ নম্বর। ফলে হাঁটতে হলো মেলা পথ। প্রথম ঝক্কি হলো সিকিউরিটি চেক, তাতে সঙ্গে থাকা সবকিছু সমর্পণ তো করতে হয়ই, জুতো, বেল্ট সব কিছু খুলতে হয়। এরা যে এরপরে আর এগুয় না, তাতে স্বস্তি, তাতে মনে মনে ধন্যবাদজ্ঞাপন।

ডিপারচার লাউঞ্জে বসে আছি, আমার বন্ধু ডা. আনোয়ারুল হকের ফোন এলো। সবকিছু সঠিকভাবে এগুচ্ছে দেখে সে খুশি। আর পনের-ষোল ঘণ্টা পরে তার সাথে দেখা হবে রিয়াদে। যখন বিমানগামী প্যাসেঞ্জার টানেলে ঢুকব, তখন দেখি এক বিশালদেহী, শক্তিমান মানুষ, গাত্রবর্ণ বলে সে বিদেশি, আমার পেছনে দাঁড়িয়ে। একে বিদেশি শক্তির ছত্রছায়ায় দাঁড়ানো বলে কি না কে জানে। আমি ভেবেছিলাম আমেরিকান কারণ শক্তির বিচারে সে দেশই সেরা। ভীমরাজ জানালেন তিনি ইউরোপের, চেক রিপাবলিকের মানুষ, থাকেন প্রাগে। আমি যদিও দেখিনি, তবু ছবি থেকে আহরিত জ্ঞানে প্রাগ সুন্দর নগরী বললে সে ভারী খুশি হয়। জানি না আলাদীনের প্রদীপের সেই হুকুম তামিল করা দৈত্যের মতো আমার ইচ্ছাপূরণে ছুটবে কি না, তবে এরপরই ছুটে গেল সমুখপানে যেখানে তার ছোটেখাটো

গড়নের স্ত্রী দাঁড়িয়ে। আমি আগে দেখলাম পাহাড়, এখন দেখলাম পাহাড়কে ধারণ করার প্রান্তর!

৩

বোয়িং ৭৩৭ মাঝারি আকারের বিমান। এর যাত্রী ধারণ ক্ষমতা ১৬৫ । ওমান এয়ারলাইন্সের বিমানবহরে ৭৩৭ আছে ৭টি। তাদেরই একটি আজ ঢাকা থেকে মাসকাট উড়ে যাবে। ওড়ার কথা ছিল চারটা পাঁচে, উড়ল চারটা পঞ্চাশে। মাঝারি পাল্লার দূরত্ব আর মাঝারি প্রকারের চাহিদার জন্য ৭৩৭ আদর্শ এয়ারক্রাফট, এর জঙও (Return on Investment) ভালো। বলার অপেক্ষা রাখে না হাউসফুল সব ব্যবসার জন্যই আনন্দকর- তা সিনেমা হল হোক কিংবা হোক প্লেনের পেটের খোঁড়ল। WY-৩১৮ নম্বর ফ্লাইটটির বিজনেস ক্লাস ছাড়া পুরোটাই যাত্রী ঠাসা আর ওই যাত্রীদের নব্বইভাগ হলো বাংলাদেশী। বিমান ওমান যাচ্ছে ঠিকই, ওই যাত্রীরা কিন্তু ওমান যাচ্ছে না, তাদের গন্তব্য সৌদি আরব।

প্লেনে ঢুকবার মুখে পুরুষ যাত্রীর চোখ বিমানবালাদের স্নিগ্ধ অবয়ব খোঁজে, সুনির্বাচিত ললনাদের আরও স্নিগ্ধ বিনয় দেখার জন্য থাকে ব্যাকুল।পরিবর্তে সে যদি দেখে এক পুরুষ বিমান কর্মী অভ্যর্থনা জানাচ্ছে, দুপাশের কোনো পাশেই রমণী নেই, তখন মেজাজ সপ্তমে গিয়ে না চড়লেও মুড চড়ে যায় সি শার্পে। পুরুষটির পোশাক পাইলটের মতো। ঈষৎ খোলা ককপিটের দরোজার সামনে সে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে যাত্রীদের।

আপনিই কি পাইলট? তাকে শুধাই।

না, আমি কেবিন ডিরেক্টর। পাইলট একটু বাইরে গেছেন।

বুঝলাম ইনি চীফ পার্সার। এমন পিক আওয়ারে পাইলট ককপিটে নেই শুনে আমার মনে পড়ল সৈয়দ মুজতবা আলীর খাইবার গিরিপাস পেরুবার কালে বাসচালকের শ্বশুর বাড়িতে একটু দেখা করতে যাওয়ার কাহিনি। সবুজ পোশাকপরা দুজন বিমানবালাকে দেখলাম যাত্রীদের সিট দেখিয়ে দেবার কাজে রত। তারা মাস্ক দিয়ে ঢেকে রেখেছে তাদের সুন্দর মুখমণ্ডল। তারা যে অনিন্দ্য তা বোঝা যায় কাজলটানা চোখ দেখে। নীল, সবুজ, সাদা- ওমানের পতাকার তিন রং স্কার্ফ হয়ে জড়িয়ে ধরেছে তাদের মোহন কণ্ঠ। দেখি আমার সিটটিতে এক বাংলাদেশি নারী বসে আছেন। তাকে বলি,

‘ওই সিট তো আমার। আপনি বসে আছেন যে?’

‘একটু জানালার পাশে বসি? খুব মাথা ঘুরাচ্ছে।‘

আমি কানে তুলি না আবদার। বলি, ‘দয়া করে উঠে আসুন।‘

‘আপনারও কি মাথা ঘুরায়?’ তার সরল জিজ্ঞাসা।

মাসকাট বিমানবন্দরের টার্মিনাল

‘জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে না পেলে ঘুরায়।‘

সে ভীতপায়ে সরে আসে। আমি সিটে বসে বেল্ট বেঁধে জানলা দিয়ে নিচে তাকাই। দেখি যা আশঙ্কা করেছিলাম, অনেকটা তাই, ২৬ নম্বর সারি প্লেনের পাখার উপরে, তবে রক্ষা যে পুরোটা নয়, পাখার পেছনের অংশে, ফলে আংশিক ভূমি দেখা যাচ্ছে। ডিপারচার লাউঞ্জে শুধু নয়, সে গন্তব্যের দিকে হেঁটে যেতে যেতে দেখেছি বিকেল চারটার সূর্য সবকিছুর উপর রক্তিম চাদর বিছিয়েছে। জানলা দিয়ে তাকিয়েও সেটাই দেখলাম- অপেক্ষমান বিমানগুলোর গায়ে রক্তিম আলপনা।

বিমানের টেকঅফ রান, জানালার পার্শ্বে দ্রুত অপসৃয়মান হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, বিমানবন্দর সংলগ্ন নগরপ্রকৃতির আকাশ থেকে দেখা দৃশ্য গোটা টেকঅফটি ভিডিওতে ধারণ করলাম। অত অত ভার নিয়ে সে আদৌ উড়তে পারবে কিনা সেই সংশয় কাটিয়ে সত্যি সে উড়ল আর আকাশে উঠেই শার্প টার্ন নিল পশ্চিমে।

উড্ডয়নের আগে সমুখের মিনি টিভি পর্দায় বিমানযাত্রার সাথে জড়িত নিরাপত্তার আবশ্যিক বিষয়গুলো দেখানো হলো। এখন সশরীর ডেমোনেস্ট্রেশন আর নেই, প্রয়োজনও নেই, সিনেমা যখন আছে। ব্যতিক্রমী ব্যাপারটি হলো সিটবেল্ট, অক্সিজেন মাস্ক, লাইফ জ্যাকেট ইত্যাদি পরার নিয়মগুলো দেখানো হলো প্লেন নয়, অন্যান্য যানবাহন- যেমন গাড়ি, ট্রেন, জলযানের প্রেক্ষিতে, এয়ারক্রাফটটি

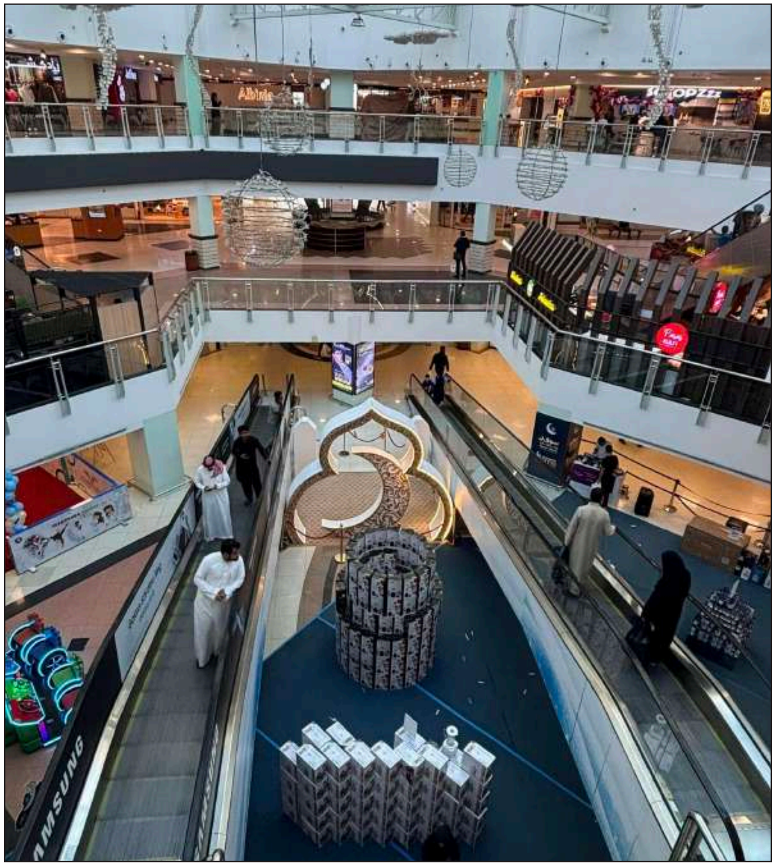

মাসকাট বিমানবন্দরের টার্মিনাল

রইল জ্যামিতিক নকশায় ও অঙ্কনে। আইডিয়াটি অভিনব ও শৈল্পিক। ওমান এয়ার ভিডিও চ্যানেলের নাম ARIA।

দৃশ্য দেখার জন্য আমি জানালার পার্শ্বে বসি ঠিকই, তবে জানালা দিয়ে আসলে কী দেখি? এসকল টার্বোজেট এয়ারক্রাফট ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩৫ থেকে ৪০ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে উড়ে যায়। ভূমি থেকে আকাশের ওই উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের নাম ট্রপোস্ফেয়ার। মেঘের অনেক উপরে বিমানের চলাচল। ফলে নিচে তাকালে যে সমুদ্র দেখা যায় তার নাম মেঘসমুদ্র। সেই বৈচিত্র্যহীন মেঘের নিরেট স্তরের উপর কোথাও কোথাও বৈচিত্র্য নিয়ে আসে পুঞ্জীভূত মেঘচূড়া। মনে হয় সমুদ্রে জেগে থাকা আইসবার্গ।

মেঘস্তর যেখানে আকাশের সাথে মিলিত হয়েছে সেই দিগন্ত পরিধিতে আলো তৈরি করে শুভ্র বিভাজন। বহুবার আমি এটাই দেখেছি। কেবল মেঘমুক্ত দিনে নিচে তাকালে নদী, পাহাড়, সমুদ্র ও প্রান্তর দেখা যায়।এখন এই দিবসাবসানের প্রাক্কালে পড়ন্ত সূর্যের রশ্মি এসে উজ্জ্বল করে তুলেছে ইঞ্জিন ও পাখার উপরিভাগ। অনেক অনেক সময় ধরে ওই উজ্জ্বলতা অক্ষুণ্ন থাকে, কেননা বিমান চলেছে সেই পশ্চিমেই যেদিকে চলেছে দিবাকর। আসলে তো গ্রহের আপেক্ষিকতায় নক্ষত্রটি মোটামুটি স্থির, ঘূর্ণনে রয়েছে গ্রহটি। তার গতিবেগ এই আকাশযানের চেয়ে বহুগুণ বেশি। ফলে একটা সময় ঠিকই আঁধার নেমে আসে। কালো আঁধারে ঢেকে যায় দিগন্ত চরাচর। পশ্চিম দিগন্তের দাবানলও নিভে যায় ধীরে।

৪

আমি দেখেছি বিমানের পাইলটরা বেশিরভাগ লাজুক প্রকৃতির ও স্বল্পভাষী হয়। Cabin crews to landing station ছাড়া তারা খুব বেশি বাক্য বলে না। ওমান এয়ারলাইন্স হলো একটি আরব দেশের বিমানসংস্থা। এখানে সকল ঘোষণা প্রথমে আসে আরবিতে, পরে ইংরেজিতে। এই যে উড়োজাহাজ ভর্তি বাঙালি, তারা না জানে তেমন আরবি, না জানে তেমন ইংরেজি। তারা ওইসকল ঘোষণার কী মর্মোদ্ধার করতে পারছে তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই ওমান এয়ারের।

যখন শুনেছি মাসকাট পৌঁছাতে ৪ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট লাগবে, তখন সিদ্ধান্ত নেই মিনি পর্দায় ইংরেজি ছবি দেখব। প্রথম ছবি Twisters টর্নেডো নিয়ে তৈরি। একদল ঘূর্ণিঝড় অনুসন্ধানী, সাহসী তারা সকলেই, টর্নেডোর রূপ ও স্বরূপ আবিষ্কার ও দর্শনে গিয়ে বারংবার গিয়ে সেঁধোয় ঘূর্ণাবর্তের মাঝেই। দেখি আর সবিস্ময়ে ভাবি হলিউড কী বানায় আর ঢালিউড কী বানায়। বলিউড আগে ঢালিউডের মতোই লারে লাপ্পা মার্কা ছবি বানাতো, এখন অবশ্য হলিউডের মতো হবার চেষ্টা করছে। সবই টাকার অঙ্ক (বিগ বাজেট) আর টেকনোলজি নয়, মাথাটাও লাগে আর ওটাই প্রথম।

যখন ভাবছি ওমান এয়ারে ফ্লাইট সার্ভিস আছে কি নেই, তখনি দেখি খাবারের ট্রলি ঠেলে গলায় ওমানের পতাকার তিনরঙা স্কার্ফ বাধা সবুজ বিমানবালারা আসছেন, সঙ্গে একজন লম্বাচওড়া পুরুষ কেবিন ক্রু। খাবারের প্যাকটি নীলরঙের ঝকঝকে সেলেফোন পেপারে ঢাকা। ভেতরে পাউরুটি-বাটার, চিকেন-রাইস, পায়েস ও পানি রয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে ড্রিংক। আমি নেই কমলার জুস। তৃতীয় পর্বে চা-কফি আসার কথা। কিন্তু এলো না।

আমার পাশের যাত্রীটির নাম সীমা, সে সৌদি আরব যাচ্ছে গৃহকর্মী হিসেবে। এবারই প্রথম নয়, প্রথমবার দুবছর চাকরি করে বাংলাদেশে ফিরেছিল। সেও বছর দুই আগের কথা। তার পাশে যে যুবক তার নাম জামাল, সে যাচ্ছে শ্রমিক হিসেবে

কাজ করতে। আমি যখন নোটবুকে কিছু লিখি, দেখি সীমা আগ্রহ নিয়ে দেখে। আমি তো লিখি জানালার বাইরে অসীমের বিবরণ!

আহার শেষে কেবিনের বাতি নিভিয়ে দেওয়া হলো আর গোটা প্লেন ঘুমিয়ে পড়ল হালকা আলোর মায়াবি পরিবেশে। কেউ কেউ অবশ্য মিনি স্ক্রিনে মুভি দেখছিল, যেমন আমি। দ্বিতীয় যে ছবিটি দেখি তার নাম Watchers। এটি একটি হরর মুভি। এক গভীর জঙ্গলে বেরুবার পথ হারিয়ে আটকা পড়েছে চারজন মানুষ। তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছে অদ্ভুতদর্শন প্রাণী। গল্পটি কেবল ভীতিকর নয়, এর ভেতর রয়েছে মনঃস্তাত্ত্বিক বিষয়- যা বেশ জটিল। ভৌতিক ছবির একটা বৈশিষ্ট্য হলো এর অনেককিছু যৌক্তিক ধারণা দিয়ে মীমাংসা করা অসম্ভব। পরিচালক যা দেখায় তাই দেখতে হয়, প্রশ্ন তোলা নিষেধ।

বোয়িং ৭৩৭ ততক্ষণে বিপুল ভারতের মোটা কোমরটি বেষ্টন করে আরব সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। ফ্লাইট রুট ম্যাপে দেখলাম ঢাকা থেকে বিমানটি প্রথমে এসেছে কলকাতার আকাশে, অতঃপর সোজা নাগপুর হয়ে মুম্বাই।স্থলভাগের উপর যেমন মেঘের পুরু পর্দা টাঙানো ছিল, সমুদ্রের উপর মেঘ পেজা তুলোর মতো হঠাৎ তাকিয়ে দেখলাম নিচে বেশকিছু সবুজ বাতি জ্বলছে। ওগুলো যে আরব সমুদ্রে ভাসমান জাহাজ বুঝতে বাকি রইল না। ম্যাপ দেখাল অনেকটা উপরে রয়েছে করাচি। বিমান মোটামুটি নির্বিঘ্নেই পাড়ি দেয় আকাশ পথ, কেবল মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে আকাশের কোনো ঝড়ো অঞ্চলে গিয়ে পড়লে, পাইলট তখন প্লেনের নাক উঁচু করে চলে যায় ঝড়ের অশান্ত আলোড়নের উপরে। প্রথমবার যখন এটা ঘটল, প্লেন কাঁপতে থাকল টিনের পাতের মতো, আমি তখন পর্দায় দেখছিলাম Twister ছবির জনপদ উড়িয়ে নেওয়া এক টর্নেডো। রুপালি পর্দার turbulence আর বাস্তবের প্লেনের কম্পন synchronise করে কিনা সে আতঙ্কে রইলাম।

তাকিয়ে দেখি সীমা জামালের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে। ওরা যে পরস্পরের পরিচিত আগেই বুঝেছি। এখন মনে হলো দম্পতি। ওদের মুখের ভাষাতেও একই আঞ্চলিক টান। বাইরের পৃথিবীতে ঘুটঘুটে অন্ধকার, আমি তবু তাকিয়ে রইলাম আকাশ থেকে মাসকাটের রূপ দেখার অসীম আগ্রহে।

৫

হঠাৎ করে সোনার দোকানে এসে পড়লে যা হয়, চারিদিকে শুধু স্বর্ণের দ্যুতি, সোনার হার, সোনার মুকুট, সোনার দুল- হঠাৎ জানালার বাইরে তাকিয়ে আমার সে দশা। চিচিং ফাঁক মন্ত্র পড়ে রত্নভাণ্ডারে প্রবেশ করে আলীবাবার প্রাথমিক যে অনুভূতি হয়েছিল, আমার মাঝে সে অনুভূতি সঞ্চারিত হলো। মাসকাটের আকাশে বিমান উড়ে এলে ওই অনুভূতির সৃষ্টি। গালফ অব ওমানের মুখে ওমানের রাজধানী মাসকাট। সৌদি আরব হলো কিংডম আর ওমান সুলতানেট। ওখানে

রাজা, এখানে সুলতান। বিমান যে ক্রমশই আকাশের পরবাস ছেড়ে ভূমির নীড়ে ফিরে আসার তাগিদে উচ্চতা কমাচ্ছে তা টের পাচ্ছিলাম কিছুক্ষণ ধরেই। নিকষ কালো অঞ্চলগুলো মাটি-না-জল তা বোঝা না গেলেও আঁধারে ঢাকা তীব্র কালোর ভেতর দ্বীপ বা ভূপৃষ্ঠে নির্মিত মানুষের আলোকিত নগরাংশ বা নগর স্বর্ণপ্রভায় জ্বলছিল। প্রধানত হলুদ হলেও লালরঙের বাতিমালা কম ছিল না। কোনো কোনো সড়ক তার বাতিমালা নিয়ে চলে গেছে দূরে বা স্বর্গে। অনেক স্থাপনাকে মনে হলো স্বর্ণনির্মিত প্রাসাদ।

মাসকট বিমানবন্দরে নামার আগে গালফ অব ওমানের জলপিঠ দেখে দুবাইয়ের কথা মনে পড়ল। সেখানেও বিমানবন্দরটি গালফের পাশে আর জলপ্রদেশ থেকে স্থলপ্রদেশে নেমে আসে উভচরী প্লেনগুলো। বোয়িং ৭৩৭ নিরাপদে ভূমিস্পর্শ করে ধীরে এগুতে লাগল বিমানবন্দরের টারমাক ভবনের দিকে। দূরে হলুদ বাতিমালায় পুরোটাই ঢাকা একটি লম্বাটে বহুতল ভবন, অনেকটা বিয়ে বাড়ির মতো সাজানো কিংবা এক সোনালি কেক, দেখে মনে হলো ওটাই টারমাক বিল্ডিং। পরে দেখলাম, ওটা নয়, বিমানটি ধীরে ট্যাক্সিয়িং করে দাঁড়াল তিনটি আলোকিত ভবনের কাছে। ভবন তিনটির ছাদ ছাতার উপরিভাগের মতো বাঁকানো। কাচের ভেতর দিয়ে তাদের অভ্যন্তরীণ জৌলুস আর চাকচিক্য দেখা যাচ্ছিল।

অ্যারাইভাল টানেল থেকে বেরিয়ে ভূমির সমান্তরালে চলা চলন্ত সিঁড়িতে চড়ে অ্যারাইভাল করিডর ধরে এগুই।ছাদের বাতিমালা, দুপাশের গ্রাফিতি নজর কাড়ে। ওমানের কিছু বিখ্যাত স্থান, তার ভেতরে ওমান বন্দর রয়েছে, এর বড়ো বড়ো ফটোগ্রাফ দেয়ালে। সেসব দেখতে দেখতে চলে আসি মূল ভবনে, চোখ রাখি ট্রানজিট কিংবা ট্রান্সফার নামক সাইনপোস্টের দিকে। চলন্ত সিঁড়ি যেখানে শেষ সেখানেই দেয়ালের গায়ে বড়ো করে লেখা 'ট্রান্সফার' শব্দটি। সে দেয়াল পেরুলেই একটি ওয়েটিং জোন যেখানে বসে আছে একদল বিমানযাত্রী। যা লক্ষণীয় তা হলো এদের পোশাকের প্রধান রং কালো। এরা যে একটি দল ওই রঙের সাযুজ্য থেকেই অনুমান করেছিলাম আর সে অনুমান সত্যি হয় যখন সিকিউরিটি চেকের জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছি আর দু-একজনের সাথে কথা বলেছি।এরা ইন্দোনেশিয়া থেকে এসেছে, সৌদি আরব যাচ্ছে ওমরাহ পালন করতে। দলে রয়েছে ৭৫ জন। সারাবছর ধরেই পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে মুসলমানরা সৌদি আরব আসে ওমরাহ পালন করতে। হজ্ব তো আছেই, সেখানে সমবেত হয় বহু লক্ষ মানুষ আর ওমরাহ করে লক্ষ লক্ষ মানুষ। যখন পেট্রোলিয়াম আবিষ্কৃত হয়নি তখন হজ্বই ছিল দেশটির প্রধান উপার্জনের পথ। আজও সৌদি অর্থনীতিতে এর বিরাট ভূমিকা।

সিকিউরিটি চেক শেষে এক লম্বা এসকেলেটর ধরে উঠে আসি বিমানবন্দরটির সবচেয়ে আকর্ষণীয়, অন্তত, জৌলুস, এক্টিভিটি ও স্থাপনাসমূহের নান্দনিকতার বিচারে, সেই

ডিউটি ফ্রি জোন, শপিং আর্কেড ও ফুড জোনে। একেকটি রেস্তোরাঁ একেক নকশার, একেক জোনে ছাদের বাতিমালা একেক সৌন্দর্যের, রয়েছে বহুবিভিন্ন নকশা ও আকৃতির চেয়ার, সোফা, বসবার বেঞ্চ। আমি কী করে যেন ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ি ফুড জোনে। ওমানে তখন রাত তরুণ হলেও, বাংলাদেশে ঘড়ি গড়িয়েছে মধ্যরাতের দিকে। স্মার্ট ফোন ওমান টাইমে নিজেকে ধাতস্থ করে নিলেও ঘড়ি তো সেকেলে, অন্তত সে স্মার্ট নয়। ক্ষুধা যে জেগে উঠেছে আর চোখ যে ঘুমে ঢুলুঢুলু তাতো জেট ল্যাগের প্রভাবেই। আমার মোবাইলের চার্জ শূন্যের দিকে নেমে এসেছে। তার আগে মাসকাট পৌঁছার বার্তা পৌঁছানো দরকার। কিন্তু কীভাবে? এখানে এয়ারপোর্ট ওয়াইফাই সংযোগ পেতে লোকাল টেলিফোন নাম্বার লাগবে। যশবন্ত সিং নামের এক ভারতীয় কর্মী, তার নিজের ফোন নম্বর দিয়ে কানেকশন দিলে আমার পুত্র শান্তকে জানিয়ে দেই আমি ক্লাস থেকে মাস (mass) কাট (Cut) করে মাসকাটে এসে পড়েছি। ইংরেজিতে Muscat শব্দটির দিকে তাকিয়ে লক্ষ করি এর ভেতর Mouse ও Cat অর্থাৎ টম এন্ড জেরি রয়েছে। ইঁদুর দৌড়ের সভ্যতায় আমরা সবাই জেরি আর আমাদের প্রাণান্তকর ছোটাচ্ছে বিগ ক্যাট রাষ্ট্রযন্ত্র।

৬

পকেট নোটবুকে কিছু টুকে নেবার জন্য একটি ফুড জোনে বসেছি, একজন ভারতীয় কর্মীকে দেখি টেবিল পরিষ্কার করছে। তার নাম যশবন্ত সিং। হিমাচল প্রদেশের যুবকটি যখন জানল আমি সিমলা-মানালি নিয়ে ট্রাভেলগ লিখেছি তখন আমার ব্যাপারে উৎসুক হলো, নিজের মেবাইল নাম্বার দিয়ে এয়ারপোর্ট ওয়াইফাইয়ের সাথে কানেক্ট করে দিল। এই এয়ারপোর্টে আমার ট্রানজিট বিরতি পাঁচ ঘণ্টার। পাঁচ ঘণ্টা না খেয়ে থাকব? ওমান এয়ারওয়েজের বাতাস বালিকারা, ওই বায়ুযানের ভেতরেই, খাবার সার্ভ করেছিল সেও তো অনেকঘণ্টা আগের ঘটনা। আমি ম্যাকডোনাল্ডসে গিয়ে একটি বিগ ম্যাকের ভ্যালু প্যাক অর্ডার করি।কাউন্টারের নেপালি চেহারার যুবতী বলে ওর দাম ৩.৯৯ ওমানি রিয়েল। বুঝলাম এ নিশ্চয়ই সৌদি রিয়েল নয়। টাকার অঙ্কে কত আসে বোঝার জন্য আমি ডলারে কত হয় জিজ্ঞেস করি। ১১ ডলার কিছু সেন্ট শুনে একটু দমে যাই, অতঃপর সিদ্ধান্ত নেই ওটাই খাব। টাকার কী অর্থ যদি তা কাজে না লাগে?

ক্রেডিট কার্ডে পেমেন্ট করে ফুড ডেলিভারি কাউন্টারে দাঁড়াতেই এক দশাসই পুরুষ আমার খাবারগুলো- বার্গার, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, কোক সাথে টমেটো কেচাপ, স্ট্র, টিস্যু পেপার ট্রেতে সাজিয়ে দেয়। আমি তো অবাক, এরা জানল কী প্রকারে আমি কী অর্ডার করেছি? সে এবং তার সাথে থাকা আরেকজন নারী, একই প্রকার নেপালি চেহারার, আমাকে একটি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড দেখিয়ে দেয়।

কম্পিউটারে যা টাইপ হয়েছিল, তা ওখানে ভেসে আছে। খাবার জোনে দাঁড়িয়ে আছে আরেক নেপালি চেহারার মেয়ে, দেখতে প্রথম দুজনের মতোই। আমি অবাক হয়ে ভাবি, এরা তিন সহোদরা নয় তো?

আয়েশ করে বার্গার খাচ্ছি, দেখি একটি বড়ো দল, দেখেই বোঝা যায় এরা ওমরাহ করতে সৌদি আরব যাচ্ছে ওপাশের দোকানটিতে ভীড় জমাল। শুনি তারা বাংলায় কথা বলছে। অবশ্য তাদের অবয়ব ও দৈহিক গড়ন দেখেও অনুমান করা যায় তারা বাংলাদেশের। এই ফুডজোনে তিনটি ফুড চেইন আছে-ম্যাকডোনাল্ডস, কেএফসি ও স্পাইস কিচেন । এরা সবাই স্পাইস কিচেন থেকে লাইন করে দাঁড়িয়ে খাবার প্যাক নিচ্ছে। নারীরা পোশাকের উপর গোলাপি রঙের অ্যাপ্রন পরেছেন, ওই কোম্পানি বা দলের দেওয়া যারা ওমরাহ অর্গানাইজ করছে। পোশাকে কোম্পানির সীল বড়ো বিসদৃশ্য দেখাল।প্যাকেজে লেখা ছিল মাসকাটে রাতের আহার, অর্থাৎ গুটি ত্রিশের ঘরে পৌঁছালে মাসকাটি ডিনার, সে মোতাবেক খাচ্ছে ঝাল রান্নাঘর (স্পাইস কিচেন) থেকে সরবরাহ করা বাংলা খাবার।

আমার মোবাইলের ব্যাটারি ততক্ষণে নিঃশেষ। মনখারাপ করে বসে থাকি, কেননা এই অসম্ভব সুন্দর, কী বলা যায় তাকে, রাজকীয় নাকি সুলতানীয়, চতুর্পার্শ্বের ছবি তুলতে পারব না। এখানে মোবাইল চার্জ করার পয়েন্ট আছে অনেক, কিন্তু চার্জিং স্টেশন নেই। লম্বা এক করিডরের একপাশে উঁচু চেয়ার-টেবিল, অন্যপাশে নিচু সোফা, সেখানে এক দম্পতিকে দেখি দুই ক্যাবলে দুটি মোবাইল চার্জ দিচ্ছে। আমি অনুরোধ করতেই বয়সী মানুষটি নিজের মোবাইল খুলে আমার ফোন সে ক্যাবলে কানেক্ট করে দিল আর মুখে বল্ল, তার ফোনে যথেষ্ট চার্জ হয়েছে। সদাশয় মানুষটি গ্রিসের নাগরিক, পেশা অধ্যাপনা। ৩৪ বছর গ্রিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়ে অবসরে গিয়ে এখন দুবছর ধরে পড়াচ্ছেন বাহরাইনের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে।তাঁর বিষয় Fluid Dynamics। আমিও যে ফ্লুইড ডাইনামিক্স পড়েছি। তার প্রমাণ দিতে নেভিয়ার স্টোকস ইকোয়েশন, অয়লার থিয়োরাম, লা প্লাস ট্রান্সফরমেশন ইত্যাদির নামোল্লেখ করি। তিনি অমায়িক হাসেন, আমাকে তার পৃথিবীর কাছাকাছি একজন ভাবেন। ওপাশের নিচু সোফায় বসে থাকা তার স্ত্রী যে গ্রিক নন তা তার অবয়ব ও গড়ন দেখে বুঝি। আমার আই ফোনের চার্জ ৩৩% এ পৌঁছেছে, প্রাচীন ও বনেদী সভ্যতার প্রতীক ফ্লুইড ডিনামিক্সের মতো একটি জটিল বিষয়ের অধ্যাপক চলে গেলেন সৌজন্যবোধের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে। তাদের বাহরাইন ফ্লাইটের সময় সমাসন্ন।

আমি কালো ও দারুণ নরম সোফায় বসে বাইরের দৃশ্য দেখি। এখানে সবকিছু বাঁকা, করিডরের পিলারসারি বাঁকা, বাইরের কাচের দেয়াল বাঁকানো। যে তিনটি বিমান আস্তাবলের ঘোড়ার মতো নিচে ঝিমুচ্ছে তাদের সোজা দেহকেও কেমন

বাঁকা দেখাচ্ছে, তাদের পাখা তো বাঁকাই। রাতের ওই প্রহরে রানওয়ে ধরে কোনো নতুন প্লেন নেমে আসে না, কেমন নির্জনতা ট্যাক্সিওয়েতে। বেঁধে রাখা অনুগত ঘোড়াগুলোর চোখে এন্তার ঘুম!

৭

আমি যখন ম্যাকডোনাল্ডসের আইকনিক বার্গার বিগ ম্যাক খাচ্ছিলাম তখন এক যুবক এসে 'বসতে পারি?' বলে বসে পড়েছিল বিপরীত চেয়ারে। 'বাংলাদেশী?' আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে যুবক জানিয়েছিল তার দেশ ইন্দোনেশিয়া। তার নাম রমজান, সে যে ইংরেজি বলে তাতে পাসমার্ক দেওয়া যায়। সে বাহরাইন যাচ্ছে ভাগ্যান্বেষণে, পরে যাবে সৌদি আরব। সৌদি আরব যাওয়ার বড়ো কারণ মক্কার প্রতি তার প্রাণের টান। সে তার জীবনটা কাটাতে চায় মক্কায়, নিজের দেশ ইন্দোনেশিয়ায় ফিরে যেতে চায় না। এর আগে সে কাজ করত ব্রুনেই দারুস সালামে। সেখানে কিছু বাংলাদেশী তার বন্ধু ছিল। সে বাংলাদেশী বন্ধুদের উদারতা ও আন্তরিকতার প্রশংসা করল।

বাঁকানো করিডরে সোজা হয়ে দাঁড়াই আর এগিয়ে যাই ছবি তুলতে। কাছের ওয়েটিং স্পেসটির ছাদ কাঠের ফালি দিয়ে তৈরি, ছাদ থেকে ঝুলছে কয়েকটি ডানা মেলা পাখি। তার পাশে যে ওয়েটিং স্পেস তার ছাদটি ছোটো ছোটো বাতির চাদরে ঢাকা। ত্রিভুজাকৃতির পাতা নিচ থেকে প্রক্ষেপিত আলোয় উদ্ভাসিত। এরকম পাতা বা ত্রিভুজ দিয়ে সাজানো হয়েছে অনেকগুলা স্তম্ভ ও কয়েকটি গেট। ছোটো বাতির চাদরে আরও একটি স্পেসের ছাদ ঢাকা দেখলাম। ছবি তুলতে গিয়ে আবিষ্কার করি এই বিমানবন্দরের ডিপারচার লাউঞ্জ সম্পাদ্য, উপপাদ্য প্রমাণ করা জ্যামিতির এক গ্যালারি বিশেষ। বিশেষ করে চোখে পড়ে ত্রিভুজসমূহের সরলরেখা বাহু ঊর্ধ্বের উপবৃত্তের কার্ভে গিয়ে থামে। লিফটে চড়ে তেতলায় গিয়ে আমি উপবৃত্তের সম্পূর্ণ রূপটি প্রত্যক্ষ করি। এ ফ্লোরটি হলো ধনীদের জোন, এখানে সবকিছুই বিলাসী। ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিগুলোর লাউঞ্জ, প্রাইভেট লাউঞ্জ, এয়ারপোর্ট হোটেল- সব এ ফ্লোরে। উপবৃত্তের বিরাট ফোকরের মধ্য দিয়ে ডিউটি ফ্রি বা ডিউটি যুক্ত ব্রান্ডশপগুলোর শিয়র দেখা যায়। নিচে তুমুল আয়োজন হলেও ওটা মধ্যবিত্তীয়, বড়জোর উচ্চবিত্তের, এখানে সবকিছুই ধনীদের। আমি এসকেলেটর বেয়ে প্রাইভেট লাউঞ্জ মারজানে উঠেছিলাম, দু-একটি ছবি তুলেছিলাম, ভেতরে প্রবেশাধিকার পাইনি। কেননা, সেটি মেম্বারদের জন্য সংরক্ষিত। আমি দাঁড়িয়ে দেখি ছাদের উপবৃত্তাকার অংশটি দারুণ সুন্দর!

পাঁচ ঘণ্টা ট্রানজিট শুনে প্রথমে ভেবেছিলাম অত সময় কী করে কাটাব। এখন দেখি 'প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন'-এর ঘড়ির কাঁটা দ্রুতবেগে চলতে দেখছে। এই প্রমোদ হলো দর্শনের প্রমোদ, যেমন দেখলাম এক কাঠের ডিঙির পাশে এক ধিঙ্গি

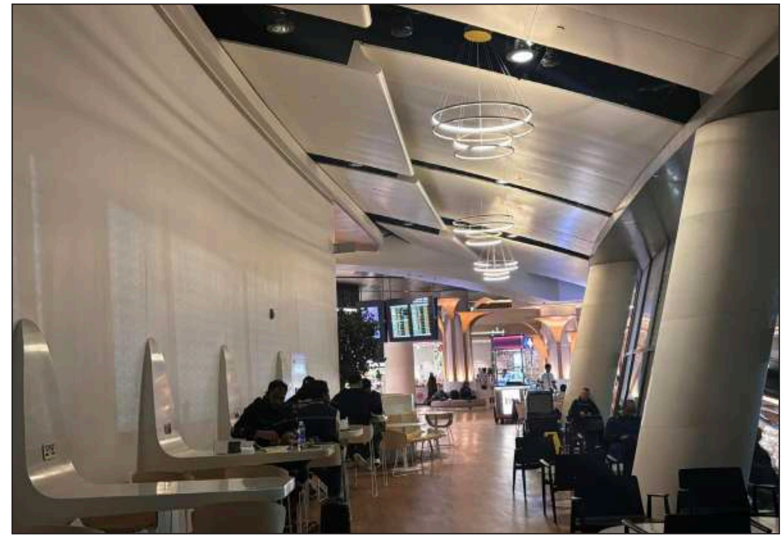

মাসকাট বিমান বন্দর

মেয়ে টানটান হয়ে শুয়ে আছে। বেঞ্চিগুলোতে ঘুমাচ্ছে অনেকে। সীমাকে দেখলাম বিভ্রান্ত হয়ে ডিপারচার গেট খুঁজছে, সাথে একজন মহিলা। আমি ভাবি জামাল কোথায় গেল? পরে মনে পড়ল আমি যে জামালকে সীমার স্বামী ভেবেছিলাম, তা সঠিক নয়। সীমা জানিয়েছিল তারা স্রেফ বন্ধু।

ঘড়ির কাঁটা মধ্যরাত পেরিয়ে গেলে ডিপারচার গেটে চলে যাই। আমি যখন বোর্ডিং পাস দেখাচ্ছিলাম তখন হঠাৎই মনে পড়ল আমার লাগেজ দুটির ট্যাগ কোথায়? নিয়মমাফিক দ্বিতীয় জার্নির বোর্ডিং পাসে থাকার কথা। নেই দেখে চিন্তিত হই। ওমান এয়ারের যে কর্মী বোর্ডিং পাস দেখে কম্পিউটার সিস্টেমের তালিকার সাথে মিলাচ্ছিল আর সমুখে রাখা প্রিন্টেড তালিকা থেকে নাম কেটে দিচ্ছিল, অর্থাৎ উপস্থিত, সেই কালো ও বলশালী মানুষটিরও প্রশ্ন সেটাই। সে আমাকে অপেক্ষা করতে বলে অন্য যাত্রীদের বোর্ডিং পাস পরীক্ষা করতে লাগল।যখন শেষ যাত্রীটিও চলে গেল সে আমাকে ডেকে কম্পিউটার সিস্টেমের একটা রেকর্ড দেখাল যেখানে আমার দুই লাগেজের ট্যাগ নম্বর লেখা। আমাকে বল্ল নম্বরদ্বয়ের ছবি তুলে নিতে।

চলন্ত সিঁড়িতে চড়ে যেখানে নেমে আসি সেটা বোর্ডিং এলাকা। সিঁড়ি থেকেই দেখেছি হলঘরটি বিরাট। যখন ডাক পড়ে বিমানে চড়ার তখন গিয়ে টানেলের ভেতর দাঁড়াই। আমার সমুখে গুনে গুনে আট কালো পোশাক পরিহিতা, কিছু কালো কোট, বেশিরভাগ কালো বোরখা, পরা নারী নিজেদের মাঝে হাসিঠাট্টা করছে। ওদের চোখমুখে আমি আমার পরিচিত অনেক বাংলাদেশী নারীর অবয়ব

খুঁজে পাচ্ছিলাম। এদের দুজন যখন ফার্স্ট ক্লাসের তীর আঁকা আরেকটি টানেলের দিকে গিয়ে ফিরে এলো তখন বলি, No plane there। হাসল মেয়েটি আর তার সাথে কথা বলার ফুরসৎ মিল্ল।

শুধাই, তোমরা কি বন্ধু? নাকি ফ্যামিলি?

হরিণীনয়না বলে, না, আমরা কলিগ।

আলাপন থেকে জানলাম তারা সকলেই সৌদি আরবের নাগরিক, একটি সৌদি ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিতে কাজ করে সকলেই। আমি ভাবি, সৌদি আরব নারী শিক্ষায় যে ইনভেস্টমেন্ট করছে তা দেশটির ভবিষ্যত নির্মাণে বড়ো ভূমিকা রাখবে। তারা যে আফগানিস্তানের তালেবানীদের মতো মূর্খ নয়- সেটা স্বস্তির!

৮

ওমান এয়ারলাইনসের রিয়াদ অভিমুখী ফ্লাইটটি, এটিও বোয়িং ৭৩৭ টার্বোজেট, মাসকাট বিমানবন্দর ছেড়ে গালফ অব ওমানের জলরেখা ধরে এগুতে লাগল উত্তরে। সে যে ক্রমশ পারস্য উপসাগর জলরেখা ধরে উড়ছে তা বুঝতে পারি নিচের দিকে তাকালে। সেখানে ভাসমান জাহাজসমূহের আলো দেখা যায়। সবুজ পোশাক পরিহিতা সবুজ বিমানবালারা কী যেন একটা দায়সারা গোছের স্যান্ডউইচ প্যাক ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ওই মধ্যরাতে খাদ্যের চেয়ে ঘুমই অধিকতর প্রিয়, উপরন্তু এ ফ্লাইটের আশিভাগ যাত্রীই বাংলাদেশি, তারা ভুগছে জেট ল্যাগে, প্রায় সকলেই ঘুমিয়ে পড়ল। 'ঘুমাব না'- এ প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমিও একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। চোখের পাতা জোড় লেগে যাওয়ার আগে মনে পড়ে এক বিপুল আলোকিত নগরী দেখেছিলাম, জানি না সেটাই দুবাই নগরী কি না, তবে আলোর দ্যুতি ছিল স্বর্ণপ্রভ আর দুবাই যে স্বর্ণের নগরী তা আমরা সবাই জানি। মাসকাটে প্লেন যখন ট্যাক্সিয়িং করে রানওয়ের দিকে যাচ্ছিল, সেই মধ্যরাতেও দেখেছিলাম সোনালি কেকের মতো দালানটি সোনার মালা পরে সমান প্রভায় জ্বলছিল। মাসকাট নগরীও কোনো বাতি নিভিয়েছে বলে মনে হলো না।

প্লেন রিয়াদ পৌঁছাবে অতিভোরে বা বলা যায় শেষ রাতে। আমার বন্ধু ডা. আনোয়ারুল হক বলেছিল আমি যেন মোবাইল খোলা রাখি, যাতে আমার হদিস পায়। সে আমাকে বিমানবন্দরে নিতে আসবে (না এসে উপায় কী? তাকে ছাড়া আমি রিয়াদে অচল)। কিন্তু বাস্তবতা হলো আমার মোবাইলের চার্জ ফুরিয়ে গিয়েছিল মাসকাটেই। ঘুমঘুম চোখ নিয়ে আমরা একবিমানভর্তি যাত্রী রিয়াদে নেমেছি ভোর সাড়ে চারটায়। মাসকাট থেকে রিয়াদ যাত্রায় আমার কাছাকাছি বসেছিল এজজন তরুণ সৌদি ইঞ্জিনিয়ার। প্লেনের সিটে সে বসেছিল পা মুড়ে যেভাবে আমরা পাটিতে বসি তেমন ভঙ্গিতে। ওটুকু গ্রাম্যতা ছাড়া সে ছিল পুরোদস্তুর নাগরিক। তার আর আমার মাঝের আসনটি ছিল ফাঁকা। সে যে দুটো

সিট জোড়া লাগিয়ে লম্বা হবার চেষ্টা করেনি তাতেই আমি খুশি। বস্তুত সে ছিল সৌজন্যবোধে ভরপুর এক যুবক।

রিয়াদ ইমিগ্রেশনে, চলন্ত সিঁড়ি বেয়ে নেমে দেখি, ধবধবে সাদা আলখাল্লা পরিহিত, মাথায় সৌদি জাতীয় পোশাকের অনুরূপ কালো রিং (একাল) দিয়ে আটকানো লাল-সাদা ছোটো চেক মুদ্রিত কাপড় (ওথরা) পরিহিত পুরুষেরা যাত্রীদের বিভিন্ন কাউন্টারে পাঠাচ্ছে পাসপোর্ট ভিসা ইত্যাদি পরীক্ষা করার জন্য। অবাক করা বিষয়টি হলো ইমিগ্রশন কাউন্টারে যারা কাজ করছে তারা সকলেই সৌদি নারী। কালো বোরখায় ঢাকা নারীদের রং যে ফর্সা তা বোঝা যায় তাদের কপালের রং দেখে। নাক-মুখ তারা ঢেকে রেখেছে যাতে পুরুষ রূপতস্কররা কোনোকিছু হরণ করতে না পারে। তারা যে আকর্ষণীয়া দেখতে তা বোঝা যায় কালো জলের উপর ভাসমান তাদের ডাগর আঁখি দেখে। আমি বিস্মিত সৌদি আরবে নারীমুক্তির অগ্রগতি দেখে। ইমিগ্রেশন পুলিশের দায়িত্ব পালন করা সকলেই নারী এমন দৃশ্য বাংলাদেশ কিংবা ভারতেও দেখা যায় না। মুশকিল হলো সে নারী আমার দু হাতের যে আঙুলই স্ক্যানার মেশিনে ইশারা করে রাখতে বলে তাদের কোনো ছাপই সিস্টেমের সাথে মিলে না। সে তখন পার্শ্ববর্তীনী সহকর্মীকে আরবিতে কিছু বললে দেখি তিনি এক প্লাস্টিক ব্যাগ বাড়িয়ে ধরেছেন যার ভেতরে জেলির মত স্বচ্ছ তরল। আমি তা আঙুলে লাগিয়ে ফের চেপে ধরি, তবু মিলে না। তিনি তখন আরেক সহকর্মীর কাছ থেকে তরল জেলি ধার করে স্ক্যানার মেশিনের কাচ পরিষ্কার করেন আর আমাকে বলেন আঙুল মুছে ফের চেষ্টা চালাতে। প্রতিবারই ব্যর্থ হই আর আশঙ্কা বাড়ে আমিই আমি কি না? ইমিগ্রেশন নারী পুলিশদের ধৈর্য্য ও সহযোগিতা, তাদের পরস্পরের মাঝে সৌহার্দ্য আমাকে মুগ্ধ করে। আমাকে পরীক্ষায় পাস করিয়ে দিতে তারা তিনজনই যেন বদ্ধপরিকর।

অবশেষে পাস করলাম, মেশিনের নির্বোধ আচরণ ঠেলে সুনয়নাদের করুণায়। এরপর লাগেজ কালেকশন স্টেশন। নির্ধারিত কনভেয়ার বেল্টের সমুখে গিয়ে দেখি স্বদেশী ভাই ও বোনেরা খালি ট্রলি নিয়ে অপেক্ষমান, কয়েকটি মাত্র লাগেজ ঘুরছে, যাত্রীরা যেসব লাগেজের জন্য অপেক্ষা করছেন সেসবের দেখা নেই। আমার দুই লাগেজও মুখ লুকিয়ে রেখেছে। যা হোক একটা সময় লাগেজগুলো আসতে শুরু করল, কামানের গোলার মতো তারা ভূমি থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে বেল্টের উপর থতমত এসে পড়ছে আর প্রাথমিক হতবুদ্ধি অবস্থা কাটিয়ে মেশিন নির্ধারিত পথে ঘুরছে। চিল যেভাবে জলাধার থেকে মাছ তুলে নেয় তেমনি ক্ষীপ্রতায় যাত্রীরা স্ব স্ব লাগেজ তুলে নিচ্ছে। আমিও ঈগল পাখি হই তবে মাছ নয় ছানা ঈগলের মতো লাগেজ দুটো ট্রলিতে তুলি যত্নে।

সবুজ চ্যানেল দিয়ে বেরুচ্ছিলাম, আমাকে কেন জানি না, কাস্টমস অফিসারের পছন্দ হলো। সে আমাকে ব্যাগেজসহ তল্লাশির ঘরে পাঠাল। আমার নিরীহ দুই সুটকেসে এমন কিছু নেই যা স্ক্যানার মেশিন ধরতে পারে। যা হোক গ্রীন সিগনাল পেলাম বেরিয়ে যাবার। ভাগ্যিস আমাকে সুটকেস খুলতে বলা হয়নি। কারো কারো সুটকেসের সবকিছু তন্ন তন্ন করে দেখা হচ্ছিল, সেগুলিকে মনে হচ্ছিল অপারেশন থিয়েটারের টেবিলে পেটকাটা রোগী, নাড়িভুড়ি বের করা।

আগমনকারীদের অভ্যর্থনা জানাতে স্বজনরা দাঁড়িয়ে আছে, আমি কিছুটা দূর থেকেই আমার বন্ধু ডা. আনোয়ারকে দেখতে পেলাম। আমাকে দেখে সে উল্লাসিত, আমিও। ইন্টারনেট ও টেলিফোন সংযোগ ছাড়া মানুষ, জায়গা কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। লিফট বেয়ে নেমে আসি বেজমেন্টে যেখানে আনোয়ার ওর গাড়ি পার্ক করে রেখেছে। পার্কিং লট থেকে বেরুতেই কাঠ ও পাথরের এক প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির কৃত্রিম প্রচেষ্টা চোখে পড়ল। দিল্লি এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসা পথের সাথে কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে রিয়াদ এয়ারপোর্টের বাইরের চেহারার। চোখে পড়ল এক আলেকিত মসজিদের চোখজুড়ানো স্থাপত্য সৌন্দর্য।

এরপর যেটা আবিষ্কার করলাম তা হলো বিরাট প্রশস্ত রাস্তার দুপাশে নগরের তেমন চিহ্ন নেই, রয়েছে প্রান্তরের পর প্রান্তর, মাঠের পর মাঠ বিছানো। কত যে জায়গা শূন্য পড়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই। শহর থেকে কতদূরে এই এয়ারপোর্ট? আনেয়ার বল্ল তার বাসা থেকে ৩৮ কিলোমিটার। সংখ্যাটি শুনে আমি কেঁপে উঠি। বন্ধুকে নিতে সে ৩৮ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে এসেছে। এখন আবার ফিরে যাচ্ছে ৩৮ কিলোমিটার গাড়ি চালিয়ে।আমার প্লেন ভোররাতে আসবে জেনে কাল রাতে সে ঘুমাতে যায়নি, যদি জেগে না ওঠে সেই আশঙ্কায়। বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞ চোখে তাকাই। সে একাগ্রমনে গাড়ি চালাচ্ছে, তার মস্তিষ্কের ভেতর ভীড় করছে কলেজ জীবনের অজস্র স্মৃতি। আমি যে সৌদি আরবে সত্যি সত্যি চলে এসেছি এটা তার যেমন বিশ্বাস হচ্ছিল না, তেমনি আমারও বিশ্বাস হচ্ছিল না। দুই অবিশ্বাসের মাঝে আনোয়ারের সাদা শকট বিশ্বাস নিয়ে ছুটছে রিয়াদ মহানগরীর দিকে।

রূপসী রাবাত

ক্ষমা মাহমুদ

বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা'র জন্মস্থান তানজিয়ের শহর- আটলান্টিক মহাসাগর আর ভূমধ্যসাগর মিলেছে যেখানে, যেখানে দাঁড়িয়ে জিব্রাল্টার প্রণালীর ওপারেই ইউরোপের দেশ স্পেন তথা আন্দালুসিয়াকে প্রায় ছুঁয়ে দেয়া যায় চাইলেই, মরক্কোর ইতিহাসের সাথে যা গভীরভাবে সম্পর্কিত- সেই জায়গাগুলো সকাল থেকেই মোহগ্রস্তের মত ঘুরে ফিরে দেখা শেষ করে, দুপুর গড়ানোর বেশ আগেই আমাদের সাতজনের দলটি যখন পরবর্তী গন্তব্য হিসেবে মরক্কোর রাজধানী শহর রাবাতের দিকে রওনা দেব বলে গাড়িতে উঠতে যাবো, তখন দেখলাম আমাদের চালক রাশিদ ইতিমধ্যে ঘটিয়ে বসেছে সাংঘাতিক এক বিপত্তি।

পার্কিং এলাকার বাইরে আমাদের গাড়ি ঘোরাতে গিয়ে অন্য এক প্রাইভেট কারের সাথে খুবই সামান্য এক

সংঘর্ষ ঘটেছে, এমনই সামান্য যে সংঘর্ষের সেই নমুনা চোখে পড়ে কি পড়ে না! ব্যস, আমাদের ঘণ্টা দেড়েক সেখানেই শেষ। দুই ড্রাইভার কোন সিদ্ধান্ত নেবে না, তারা পুলিশ কল করেছে, তারা আসবে, দেখবে, সব রেকর্ড করবে, তদন্ত করবে, তবে আমাদের মুক্তি। এত আয়োজন, টাকা পয়সা, মূল্যবান সময় খরচ করে অন্য দেশ দেখতে যাওয়ার প্রতিটা মুহূর্ত যে কত মূল্যবান তা যারা ভ্রমণ করেন তারা নিশ্চয়ই জানেন। পুরো দেড়টা ঘণ্টা আমরা পথের মধ্যে, স্রেফ গাড়ির মধ্যে বসে রইলাম এটা মানা যে কি কঠিন ছিল সে কহতব্য নয় কিন্তু মরক্কোর আইন তার থেকেও কঠিন, নিয়মের কোন ছাড় নেই। দুই চালককে আমরা প্রায় মিনতি করলাম, 'তোমরা টাকাপয়সা দিয়ে মিটিয়ে নাও না ভাই'- কিসের কি! 'কাভি নেহি' বলে দুইজন দুই গাড়িতে বসে রইলো। আমাদের গাড়ির চালক রাশিদ আবার বিশাল একজন দার্শনিক! ইংরেজদের ভাষাখানি একদমই তার সড়গড় নয় কিন্তু কথায় কথায় This is life- বলে চুপচাপ গাড়ি চালাতে থাকে, এক্ষেত্রেও গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে 'সবকিছুরে লও হে সহজে'- বলে পুলিশের অপেক্ষায় বসে রইলো। আমাদের গাইড ব্যাটাও দেখি অন্য গাড়ির চালকের সাথে দিব্যি খোশগল্প চালিয়ে যাচ্ছে, ভাবখানা এমন, Don't worry be happy, Every little thing gonna be alright. আমরা শুধু ভগ্ন হৃদয়ে অপেক্ষায় বসে দাঁত কিড়মিড় করছি আর ওদের সবকটাকে শাপ শাপান্ত করছি। পুলিশ যে কোন মুহূর্তে চলে আসবে সেই আশংকায় গাড়ি থেকে নেমে যে আশেপাশে যাবো সেটাও পারছি না অথচ দু'পা এগোলেই বয়ে চলেছে আটলান্টিকের নীল জলধারা। আবার যদি তার পাশে বসে থাকতে পারি তাতেও তো শান্তি, সময়টা তো নষ্ট হয়না। একটু আগেই সেখান থেকে চলে আসার সময় বলছিলাম, 'ইসস্ আরো কিছুটা সময় যদি এখানে থাকতে পারতাম!' অথচ তারপর দেড়ঘণ্টা এখানেই গাড়ির মধ্যে কিন্তু একটা অনিশ্চয়তায় সমুদ্রের পাশে যেয়েও বসতে পারছি না! একেই বলে গ্রহের ফের! রাজধানী রাবাত যার আরবী নাম বিজয়ের দুর্গ, সেই শহর ঘুরে দেখার জন্যে আমাদের যে অল্প সময় বরাদ্দ তার মধ্যে থেকে মহামূল্যবান প্রায় দুটো ঘণ্টা নষ্ট হয়ে গেল!!

অবশেষে এলেন দু'দুটো ঝকঝকে গাড়িতে চড়ে দোহারা গড়নের দুঁদে দুই সুদর্শন পুলিশ মহোদয়! কোন হৈচৈ নেই, কথা কাটাকাটি নেই, তর্ক বিতর্ক কিচ্ছুটি নেই। চালকদ্বয়কে কিছু কথা তারা জিজ্ঞাসা করলো, দেখলো এবং ছবি তুলে নিলো, কোথায় কোন গাড়ির অবস্থান ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। মরক্কোর পুলিশের ছবি তোলা নিষেধ। আমাদের দলের একজন কৌতূহলবসত তাদের তদন্তের ছবি তুলতে গেলে একজন পুলিশ খুবই শীতল চোখে তাকিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলো কেন সে ছবি তুলছে এবং সেটা ডিলিট করতে বললো। যাহোক খুব বেশি হলে বিশ মিনিটের মধ্যে তারা তাদের সব কাজ সেরে যাওয়ার আগে হালকা স্বরে শুধু একটু বললো

বাব উল উদয়া

'সরি, তোমাদের একটু সময় নষ্ট হলো', তবে এর বেশি কিছু না; এই একটু সময় যে আমাদের কাছে কত মহামূল্যবান তা যদি ব্যাটা বুঝতো! তবে সরি যে বলেছে সেই ঢের, কারণ এতটা নম্র এখানকার মানুষ নয় বরং কোথাও কোথাও তাদের কিছুটা উদ্ধতই দেখেছি। মরক্কো যে টুরিস্ট ফ্রেন্ডলি না সেটা বলা যাবেনা আবার যে খুবই ওয়েলকামিং সেই বোধও জাগে না- একটা মিশ্র অনুভূতি তৈরী হয় সবকিছু মিলিয়ে। যাহোক, গাড়ী চললো। আমার মনটা খুবই খারাপ এতটা সময় নষ্ট হওয়ার কারণে! রাতেই আমরা ক্যাসাব্ল্যাংকা ফিরে যাবো, পরের দিনই ঢাকা ফেরার কথা। কত কত দিন ধরে, কত যে পরিশ্রম করে, দিন- সময়, পয়সাকড়ির হিসেব সব মিলিয়ে একটা ভ্রমণসূচি তৈরি করা হয় সে যারা ভ্রমণ করে তারাই শুধু জানে, সেখান থেকে এভাবে অকারণে যদি সময় নষ্ট হয় স বড় কষ্টের। রাবাতে সময় বাড়িয়ে যে একটু ভালো করে সবকিছু দেখবো তার আর কোন সুযোগই নেই, এর মধ্যেই দুপুর হয়ে গেছে। প্রায় ঘণ্টা চারেক পরে বিকেল পাঁচটায় যখন রাজধানী রাবাতে ঢুকলাম, সূর্য তখন প্রায় নেই, তারমধ্যে কেমন যেন একটু বৃষ্টির হুমকিও দেখতে পাচ্ছি। এদিকে শহরের রূপের ছটায় চোখ এক সেকেন্ডের জন্যেও বন্ধ

মরক্কোর সবচেয়ে উঁচু ভবন ষষ্ঠ মোহাম্মদ টাওয়ার

করতে পারছি না, প্রাণটা জুড়িয়ে যাচ্ছে দেখতে দেখতে আর ওদিকে মনের ভেতর শুধু টেনশন কতটুকুই বা দেখতে পাবো, সন্ধে হয়ে এলো বলে কিছুক্ষণের মধ্যেই!

মরক্কোর সবচেয়ে উঁচু ভবন ষষ্ঠ মোহাম্মদ টাওয়ার

শহরের মধ্যে ঢোকার পর থেকেই গাড়ি চলছে কিছুটা ধীর গতিতে, তাতে শহরটা দেখতে সুবিধা হচ্ছে। কিছুক্ষণ বাদে দেখলাম ট্রাম লাইন ধরে এসে গেল এক ট্রাম, পারও হয়ে গেল ধীরে ধীরে। এমন সুন্দর সেই ট্রামের চেহারা যে এতদিন ট্রাম বলতে যে চেহারা চোখে ভেসে উঠতো তা গেল ঘুচে। চলতে চলতেই চোখে পড়লো খুবই আধুনিক আর দৃষ্টিনন্দন এক স্থাপনা, গাইড বললো, গ্র্যান্ড থিয়েটার হল! মনে হলো সিনেমায় দেখা সুন্দর কোন এলিয়েনের সাদা- নীল রঙের মাথা! আরো একটি উঁচু ভবন শহরের সব জায়গা থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম, ষষ্ঠ মোহাম্মদ টাওয়ার, দুবাইয়ের বুর্জ খলিফার আদলে বানানো মরক্কোর সর্বোচ্চ ভবন। তিমি মাছ পানি থেকে মুখ উঁচু করে তুললে যেমন দেখায় ভবনটি দেখতে ঠিক তেমন। এমন সুন্দর এক ভবনের সুন্দর একটা নাম হতে পারতো! রাজা, বাদশাহরা কিছুতেই নিজেদের নামের মোহ ছাড়তে পারে না এই ভবনের নামকরণ তার আরেকটা প্রমাণ। যাহোক প্রায় ছয় লাখ মানুষের শহর রাবাত বর্তমানে রাজধানী হলেও সবচেয়ে বড় শহর নয়, সে স্থান ক্যাসাব্ল্যাংকারই দখলে। মরক্কোর রাজধানী শহরের ঠিকানা অতীতে ইতিহাসের নানান বাক বদলের সাথে সাথে বারবার বদলে গেছে। একেক আমলে শাসকরা তাদের সুবিধামতো রাজধানী শহর পাল্টেছে, তাই মারাকেশ, ফেজ, ক্যাসাব্ল্যাংকা সব শহরই কোন না কোন আমলে মরক্কোর রাজধানী ছিল। ১৯১২ সালে মরক্কো ফরাসি উপনিবেশে পরিণত হলে রাবাত হয়ে ওঠে দেশের প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র তবে ১৯৫৫ সালে স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকেই রাজধানীর বরমাল্য রাবাতের গলায়, সেই সাথে প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্রও বটে।

মরক্কোর বাদশাহ ষষ্ঠ মোহাম্মদ বাস করেন এই শহরেই। প্রতি শহরে একটা করে প্রাসাদ থাকলেও তিনি যে এই শহরে বাস করেন তার প্রমান পাওয়া যাবে সর্বত্র- ঝকঝকে, তকতকে চারদিক, রাজার শহর বলে কথা! তার পিতা দ্বিতীয় হাসান ১৯৯৯ সালে মৃত্যুবরণ করলে তখন থেকে তিনিই বাদশাহ। রাজার বাড়ি পার হওয়ার সময় চোখে পড়লো লাল টুকটুকে পোশাক পরা পাহারাদাররা দাঁড়িয়ে আছে, কেউ কেউ একটু আধটু খোশগল্পেও মত্ত, কত আর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যায়! ভীষণ সবুজ চারদিক, মরক্কোর ঐতিহ্যবাহী ফেজ টুপির মত করে বেশ কিছু গাছ ছেটে রাখা হয়েছে দেখে খুব মজা লাগলো।

ফেজ টুপি পরা গাছগুলো

রাস্তায় গাড়ি চলাচলের পাশাপাশি আলাদা লেন দিয়ে কিছু সাইকেল আরোহীও চোখে পড়ে। এই বিকেলবেলাতেও দেখলাম বিভিন্ন জায়গায় কেউ কেউ রাস্তার পাশগুলো পরিষ্কার করছে। এককণা ময়লা কোথাও আতসি কাঁচ দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাবে না অথচ এরা কি যে পরিষ্কার করে চলেছে কে জানে! পৃথিবীতে কত সুন্দর সব শহরই না রয়েছে! মরক্কোর রাজধানী শহর রাবাত নিঃসন্দেহে তার মধ্যে একটা। এত পরিচ্ছন্ন, এতই ঝকঝকে, এমনই চকচকে আর কোন শহর কি দেখেছি এর আগে? মনে পড়ছে না সত্যিই!

আমাদের গাড়ি গিয়ে থামলো বিশাল এক দুর্গের সামনে যার একপাশে আটলান্টিকের নীল পানি শ্বেত শুভ্র ফেনা তুলে তুলে আছড়ে পড়ছে বিশাল বিশাল ঢেউ হয়ে। ছবিতে বহুবার দেখা 'কাসবাহ উদয়াস' দুর্গ এখন আমার চোখের সামনে যার ভেতরে ঢুকলেই মেদিনা বা পুরনো দিনের শহরটা দেখতে পাবো। কাসবাহ বলতে বোঝায় দুর্গ বা মহল্লা। আমাদের দেশেও কিন্তু অনেক জায়গাতেই এই কাসবাহ শব্দটা প্রচলিত। যশোর শহরের মানুষ হিসেবে পুরাতন কাসবাহ নামে একটা জায়গার কথা জন্ম

মরক্কোতেও রিকসা চলে তবে এরকম

থেকেই জানি যেখানে আমার মায়েরও জন্ম। মরক্কোর প্রায় প্রতিটা শহরের রয়েছে এই কাসবাহ আর মেদিনার গল্প। ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বের জন্য রাবাতের এই মেদিনা বা পুরনো শহরটি ২০১৪ সালে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে মরক্কোর বহু শতাব্দীর প্রাচীন ভবন, দুর্গ এবং ঐতিহাসিক স্থাপনার অগুণতি নিদর্শন।

মেদিনার রাস্তা

খ্রিস্টপুর্ব সময় থেকেই মরক্কো বহু জাতি যেমন, ফিনিশীয়, বার্বার, মৌরিতানীয়, ভিসিগথ বা জার্মান, রোমান, বাইজেন্টাইন প্রভৃতির শাসনে ছিল। সপ্তম শতকে আরবরা এদেশে প্রবেশ করলে তখন থেকেই এখানে ইসলাম ধর্মের প্রসার ও প্রভাব বাড়তে শুরু করে। দ্বাদশ শতকে আলমোহাদ সাম্রাজ্যের সময়কালে রাবাত গুরুত্বপূর্ণ নৌঘাঁটি হয়ে ওঠে এবং শহরটির দ্রুত প্রসার ঘটে তবে এই সাম্রাজ্যের পতনের পর শহরটি প্রায় পরিত্যক্তও হয়ে পড়ে। ফরাসি ঔপনিবেশিক সময়কালে আবার এই শহরের গুরুত্ব বেড়ে যায় যখন ফরাসিরা একে প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলে। উনিশ শতকের দিকে মরক্কোর আরেক ঐতিহাসিক শহর ফেজ থেকে উদয়া নামের এক জনগোষ্ঠীকে স্থায়ীভাবে বিতাড়িত করা হলে তাদের একাংশ এই বিরান জায়গায় এসে বসবাস শুরু করলে তাদের নামানুসারে এই মহল্লার নাম হয়ে ওঠে, কাসবাহ উদয়াস রোমান ভাষায় যার অর্থ 'উদয়ীদের দরজা' যা মরক্কোর এক অনিন্দ্যসুন্দর স্থাপনা। এই স্থাপনার দেয়ালে দেয়ালে গাথা আছে শত শত বছরের প্রাচীন বার্বার, ইহুদি, আরব এবং আন্দালুসীয় সংস্কৃতির গল্প। আটলান্টিক মহাসাগরের পাড়ে, বো রেগ্রেগ নদীর মুখে অবস্থিত এই কাসবাহ আজও এই শহরের প্রধান পর্যটন আকর্ষণ।

সমুদ্রের অংশটা বাদ দিয়ে একটু ধূসর রঙের পাচিল দিয়ে ঘেরা জায়গাটার চতুর্দিকের 'মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য' সুন্দরে ডুবে আছে আমার চোখ! তবে সময় আমাদের হাতে কম, গাইডের তাড়ায় একটুও দেরি না করে চারদিকে তাকাতে তাকাতে তার পিছু নিলাম। দুর্গের ভেতরেই মেদিনা বা পুরনো শহরটা, যেখানে ঢুকে পড়তেই মনে হলো আমি শত শত বছর আগের কোন এক পৃথিবীতে ঢুকে পড়লাম। মরক্কোর অন্যান্য শহরের মেদিনার মতোই এটাও একই রকম ঝলমলে এক প্রাচীন দুনিয়া যার আকাশে বাতাসে পুরনো দিনের গল্প ভেসে বেড়ায়, পুরনো সেই সুবাস গায়ে মেখে নিতে নিতে এই মাটির সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় ঘটতে থাকে। মেদিনায় ঢুকতেই দৃষ্টি চলে যায় অনিন্দ্যসুন্দর কারুকার্যময় বিশাল এক কাঠের দরোজার দিকে, নাম তার বাব আল- উদয়া বা রোমান ভাষায় বলে মহান দরজা। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে নির্মিত এই দরজাটি কাসবাহর স্মারক ফটক হিসাবে তৈরি হয়েছিল যাকে মরক্কোর স্থাপত্যের মধ্যেই সবচেয়ে সুন্দর দরজাগুলির একটি হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

বাব আল- উদয়া

বাব আল- উদয়া পার হয়ে সামনের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাই- এক পাশের সাদা দেয়াল জুড়ে একতলা সাদা রঙের সব বাড়ি, যার ভেতরে অপূর্ব নকশার কিছু দরজাও চোখে পড়ে, নামও লেখা আছে প্রত্যেকটার সামনে। একটা দরজার সামনে লেখা 'দার বারাকা' - এরাও দেখি দরজাকে দার বলে! দারের উপরে সুন্দর সব বাতি ঝোলানো। বাতিগুলো রাতের বেলা পরপর জ্বলে উঠলে পুরো শহরের এই লম্বা পথটা কি সুন্দর লাগতে পারে তা কল্পনায় দেখার চেষ্টা করলাম।

এই বাড়িগুলোকে বলে রিয়াদ, মরক্কোর রিয়াদ সংস্কৃতি এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। বাড়িগুলোর প্রাচীন আবহ বজায় রেখে হোটেলের মতো ভাড়া দেওয়া হয়। মানুষ অতীতের এক দুনিয়ায় কদিন বাস করার অবিস্মরণীয় এক সুখস্মৃতি নিয়ে সেখান থেকে ফেরে যে স্মৃতি আজীবন তার মনে রয়ে যায়। আধুনিক মরক্কো তাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের সাথে যে মেলবন্ধন ঘটিয়েছে তার অভিনবত্বেই মানুষ মুগ্ধ হয়ে যায়- পুরো মরক্কো জুড়ে এই ঐতিহ্য আর আধুনিকতার রজ্জু টানাটানি মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো। অতীতকে এই দেশের মানুষ শুধু ফ্রেমে বাঁধিয়েই রাখেনি সেখানে সাড়ম্বরে প্রাণের মেলা বসিয়েছে, যেখানে পতঙ্গের মত পর্যটকরা ছুটে আসে বিশেষ করে পাশের দেশ স্পেনসহ ইউরোপীয়দের একটা বড় অংশ সারা বছরই এখানে থাকে। পর্যটন থেকে মরক্কোর প্রচুর আয়-রোজগার বলাই বাহুল্য। নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে, আমাদের এমন কত শত ঐতিহাসিক স্থান পড়ে আছে দেশজুড়ে, ধুলোয়

মিশে যাচ্ছে প্রতিদিন! আমরাও ইচ্ছা করলেই পারি সেগুলোকে এভাবে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে কিন্তু আসলে আমাদের সে ইচ্ছে করে না কখনও!

অপূর্ব এই মেদিনা তার পুরনো আবহে যেন এক অন্য দুনিয়ায় ঢুকিয়ে নিল আমাদের এক লহমায়, পুরো পথ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে মনে হয় আমার আরো চার জোড়া চোখ থাকলে কি ভালোই হতো, দুই চোখের উপর চাপ বেশি পড়ে যাচ্ছে; একদিকে বিচিত্র ধরনের মানুষজনের বিচিত্র চেহারা, পোশাক, হাঁটাচলা দেখছি অন্যদিকে যে রাস্তা পেরিয়ে চলেছি সে জায়গার অপরূপ প্রাচীন আবহ আর সৌন্দর্য মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে। কিছু কিছু বাড়ির সামনে কাঠের দরজাওয়ালা দোকান- সে সব দোকানে একদম টাটকা ফলের রস নিয়ে দোকানদাররা টুরিস্টদের নীরব আহবান জানাচ্ছে, আমাদের সেসব চেখে দেখার সময় একদমই নেই, তাড়াহুড়োয় করুণ চোখে সেদিকে তাকিয়েই জোর কদমে হাঁটতে থাকি আর রাশিদকে মনে মনে গালি দিই, সে ব্যাটা গাড়িটা সাবধানে ঘুরালে আমাদের দুই ঘণ্টা ওখানে নষ্ট হয়না আর আমরাও এই উদয়া ডিলাইটসে বসে এক গ্লাস টাটকা আনারের রস অন্তত চেখে দেখার সময় পেতাম!

দোকানে থরে থরে সাজানো স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী সব স্যুভেনিরের দিকেও চোখ বুলিয়ে যেতে থাকি চলতে চলতে, সেখানে ঝোলানো বিচিত্র সব ছবি যা এদেশের বিচিত্র জীবনের গল্প বলছে- জীবনযাত্রা, শহর, মানুষ, বিখ্যাত নানান স্থাপনা! স্যুভেনিরের সুসজ্জিত দোকান

উজবেকিস্তানের প্রাচীন শহর বুখারার শত গলির কথা মনে পড়ে গেল- সেই ঐতিহাসিক শহরও এরকমই শত সহস্র বছরের ঐতিহ্যের ডালি সাজিয়ে বসে আছে, দিনের পর দিন যার রূপ, রস, গন্ধে অবগাহন করলেও আশ মেটে না। আমাদের সময়ের বড় স্বল্পতা, দৌড়াচ্ছি ছয় ফুটি লম্বু রাম গড়ুড়ের ছানা গাইড হুসেনের পিছু পিছু, সবসময়ই সে গোমড়ামুখো দৌড়ের উপর থাকে আর আমি বেশি থামি, দেখি এবং ছবি তুলি বলে আমার উপর সে একটু বিরক্তও।

দুপাশের বিচিত্র রকমের মানুষের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছি।! বিশাল লম্বা লম্বা আরব বা আফ্রিকান অথবা ইউরোপিয়ান নারী পুরুষের কোন অভাব নেই। বিভিন্ন দেশের প্রচুর টুরিস্টের কারণে মরক্কোর সব জায়গার মানুষের মধ্যে একটা বহুমাত্রিক চেহারার দেখা পাওয়া যায়। আবার ওদের নিজেদের চেহারার মধ্যেও এত বিচিত্র মিশেল আছে যে কে পর্যটক আর কে স্থানীয় বোঝা মুশকিল, অবশ্য ওদের আলখাল্লা ধরনের লম্বা পোষাক আর মেয়েদের হিজাব সেসব বোঝার এক বড় সহায়ক। বিড়াল প্রীতির কারণে নাদুস নুদুস অনেক বিড়াল আমার চোখে পড়লো। মরক্কোর মানুষ এই আদুরে প্রাণীদের খুব যত্ন করে বলতেই হবে, রাস্তায় কত জায়গায় দেখেছি বাটি ভর্তি দুধ দেয়া থাকে আর বিড়ালগুলো এসে চুকচুক করে খায়। এই লম্বা রাস্তা দিয়ে এত যে মানুষ হাঁটছে তার পরেও মনে হচ্ছে রাস্তাগুলো একটু আগেই কেউ লাইজল মেশানো

সাবানপানি দিয়ে মুছে রেখে গেছে। মাথার উপর খোলা আকাশ, কিছু কিছু বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেছে পরিষ্কাক ঝকঝরে গলি, এই গলি যে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যায় তা স্থানীয়রা ছাড়া কারো পক্ষে বের করা অতি দুরূহ! গলি গলি তস্য গলি

সহস্র গলির দেশ এটা - ইতিমধ্যেই মারাকেশের জামা আল-ফিনা, নীল শহর শেফশাওয়েন, ঐতিহ্যবাহী ফেজ আর তানজিয়ের শহরে ইবনে বতুতার সমাধি খুঁজতে গিয়ে এই গলির গোলকধাঁধায় ধেঁধে এসেছি বিস্তর!

শেষ অব্দি পুরো পথ পার হয়ে গিয়ে যা চোখে পড়লো সুদূরতম কল্পনাতেও তা ছিল না! বিশাল আটলান্টিকের নীল জলরাশি আমার সামনে, তার ধার দিয়ে রয়েছে বড় এক চত্বর। লোকজন বৈকালিক ভ্রমণে বের হয়ে সমুদ্রের হাওয়া খেতে খেতে আড্ডা, গল্পগুজবে মেতে আছে। সময়টা সূর্যাস্তের তাই অনেক মানুষ সমুদ্রঘেরা সেই খোলা চত্বরে কিন্তু কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নেই!

সুন্দর করে বাঁধিয়ে রাখা সমুদ্রের পাড়, নানাভাবে পানির ভেতর দিয়েই হাঁটাচলা, জলকেলি করার ব্যবস্থা, মানুষের স্বাচ্ছন্দের জন্যে সব ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। দূরে এক কোনায় জলের গা ঘেঁষে দেখা যায় একটা প্রহরীদের ঘর, কিছুদূর পরপর কামান

ফেজ টুপি পরা গাছ

স্যুভেনির সজ্জিত দোকান ও দার শরীফ

রাখা আছে সুড়ঙ্গ থেকে সমুদ্রের দিকে মুখ করে। সাধারণত শত্রুর হামলা ঠেকানোর লক্ষ্যেই নজরদারির সুবিধার কথা ভেবে সমুদ্রের পাশে এমন দুর্গ বানানে হতো।

সিগাল উড়ছে গোটা আকাশ জুড়ে, সেই সাথে উড়ছে মরক্কোর লাল পতাকা সব জায়গায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এ দেশের মানুষজন যেন খুবই সুখী, স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই বাস করছে। আমেরিকার সাথে মরক্কোর বহু পুরনো অত্যন্ত মজবুত কূটনৈতিক সম্পর্ক- সেই সুফল ভোগ করে দেশটা। আরব বসন্তের সময়ও কোন ঝামেলা হয়নি তেমন- স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা এদের উন্নয়নের অন্যতম কারণও নিঃসন্দেহে।

সময় কম থাকলেও প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্তই আমরা আটলান্টিকের বাতাস গায়ে মেখে, মরক্কোর বিখ্যাত আতাই চা বা পুদিনা চার স্বাদ নিতে নিতে রাবাত শহরের সৌন্দর্যে বুঁদ হয়ে রইলাম।

হুসেনের ডাকে হুশ ফিরলো, যেতে হবে আরেক জায়গায়, পা একটুও সরছে না কিন্তু দিনের আলো শেষ হয়ে আসছে যে! মেদিনা থেকে বের হয়ে আসতেই চোখে পড়ে কয়েকটা একই রকমের দেখতে নীল রিক্সা, ঐ বিশাল চত্বরের মধ্যেই যাত্রী নিয়ে সমুদ্রের কাছ থেকে আবার দুর্গ পর্যন্ত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কি যে ইচ্ছে হলো নীল রিক্সাটাতে একটু উঠে পুরো জায়গাটা ঘুরে আসি কিন্তু সময় যে নেই গোলাম হোসেন! কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটা রিক্সার ছবি তুলতে গেলে রিক্সাওয়ালা হাত দিয়ে নিষেধ

করলো। মরক্কোর মানুষজন ছবি তুলতে একদম পছন্দ করে না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখেছি ছবি তুলতে গেলে হাত দিয়ে আড়াল করে অথবা শীতল চোখে তাকায়। ছবি তুলে আরাম পেয়েছিলাম উজবেকিস্তানে, তোলার আগে ওরা নিজেরাই কাছে এসে বলতো, ছবি তোল, ছবি তোল! ভারী মজার মানুষ এই উজবেকেরা। মরক্কোর মানুষ ততটাই বেরসিক এবং একটু যেন অহংকারীও। সেই সাথে টিপসের প্রতি এদের অত্যধিক ভালোবাসা মাঝে মাঝে বাটপারির পর্যায়ে পড়ে যায় সে কথা না বললেই নয়!

কাসবাহ থেকে আমাদের গাইড এবার আমাদের নিয়ে যায় রাজা পঞ্চম মোহাম্মদের সমাধি ও তৎসংলগ্ন অসমাপ্ত মসজিদে সেটাও এখানকার খুব বিখ্যাত এক ঐতিহাসিক জায়গা। সন্ধ্যা ঝুপ করে নেমে আসার আগে চোখের দেখাটা অন্তত দেখে নিতে চাই সেই ঐতিহাসিক সমাধির! গাড়ি গিয়ে থামলো গেটের একদিকে। বাইরে সেই লাল টুকটুকে ড্রেস পরা প্রহরীরা মূর্তির মত ঠায় দাড়িয়ে। ভেতরে ঢুকে বিশাল চত্বরে অসমাপ্ত সেই মসজিদ আর খুবই সুন্দর এক মার্বেল কাজের সমাধি যার মনকাড়া নকশা, দেয়াল জুড়ে অপূর্ব মোজাইক, ক্যালিগ্রাফির কাজ যে কারো ভালো লাগবে। রাজা পঞ্চম মুহাম্মদ এদেশে অত্যান্ত সন্মানিত মানুষ ছিলেন। ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল থেকে মরক্কোকে মুক্ত করে স্বাধীনতা নিশ্চিত করেন, ১৯৫৭ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু এদেশের বাদশাহ ছিলেন।

সন্ধ্যা পুরোপুরি তার ঘোমটা নামিয়ে ফেললে আমরা বো রেগ্রেগ নদীর পাশে বিশাল চত্বরের একটা মানুষে গমগমে রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসি। মরক্কো আসার আগেই আমাদের বিখ্যাত ভ্রমণ লেখক মঈনুস সুলতানের মরক্কো নিয়ে ভ্রমণগল্প 'মরক্কোর মারাকেশে ও জাবালে আটলাসে' পড়ার মধ্যে দিয়ে এই নদীর সাথে আমার পরিচয় ঘটেছে। এককালের বড় বন্দর এখন পলি জমে বন্ধ হয়ে গেলেও নদীতে নানান নৌকার বহর আলোকিত করে রেখেছে পুরো জায়গা। হালকা একটু বৃষ্টি হওয়ার কারণে ঝকঝকে জায়গাগুলোতে নানারঙের বাতির এক বিভ্রম তৈরী হয়েছে। অনেক মানুষ এসেছে সন্ধ্যায় নদীর মনোরম হাওয়া খেতে। যথেষ্ট মানুষের আনাগোনা, খোশগল্পের দৃশ্যকল্প কিন্তু ঠেলাঠেলি, তীব্র আওয়াজ কিছু দেখছি না। কি খাবো মেন্যু দেখে বলে দিলাম রেস্তোরাঁর ওয়েটারকে। খাবার আসতে থাকুক সেই ফাঁকে আমি টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যেই বাইরে গিয়ে নদীর কাছে চত্বরে গিয়ে দাঁড়াই। নদীর বয়ে চলা পানিতে আশপাশের সমস্ত কিছুর রং প্রতিফলিত হয়ে দারুণ এক শিল্পকর্ম তৈরি হয়েছে যা দেখতে ভীষণ ভালো লাগছে। হঠাৎ দলের বন্ধু রাদিয়ার গলা ভেসে এলো, 'ক্ষমা আপা এখানে আসেন' ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি রাদিয়া আর সামীও, এক জোড়া টোনাটুনি ওরা, আগেই রেস্তোরাঁর বাইরে খাবার নিয়ে বসেছে। আমাদের দলের আরো কয়েকজন বসেছে ভেতরে। আমি জোরে চেঁচিয়ে বলি, 'তোমরা খাও, আমি এখানে দাঁড়িয়ে দেখি

একটু।' সত্যিই একদম নড়তে ইচ্ছা করছিল না রাতের সেই বৃষ্টি ভেজা, ভারী মোহনীয় বো রেগ্রেগ নদীর পাশের জীবন থেকে! মনে হচ্ছিল, অনন্তকাল বসে থাকি এখানে, দেখতে থাকি এর পাশের বয়ে চলা জীবন!

বো রেগ্রেগ নদী

শুনেছি নদীর ওপাশেই আছে এক পুরনো শহর চেল্লা, আরবি ভাষায় যা সালাহ বা সালে, মরক্কোর অন্যতম প্রাচীন আরেক শহর যে শহরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব কালে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে এটা পুরোপুরি রোমের সাথে সংযুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রাচীন বার্বার বা মৌরিতানীয় রাজ্যের অধীনে ছিল। রোমানরা সালা কলোনিয়া নামে এখানে একটি শহর তৈরি করেছিল যার খননকাজ থেকে জানা যায় যে রোমান কাঠামো নির্মাণেরও আগে এখানে মৌরিতানিয়ান কাঠামো বিদ্যমান ছিল। এই অঞ্চলে পাওয়া ভিসিগোথিক এবং বাইজেন্টাইন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি থেকেও জানা যায়, সালে এবং রোমান ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগ ছিল যা সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর আফ্রিকায় বাইজেন্টাইনদের উপস্থিতির প্রমাণ তবে পঞ্চম শতক থেকে সালে শহরটি পরিত্যক্ত হতে শুরু করে। আরবরা সপ্তম শতকে এখানে এসে ইসলামি প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে। এত প্রাচীন শহরটা ঘুরে না দেখতে পারার আফসোস নিয়ে মনে মনে ভাবি, আসলে প্রতিটি জায়গায় নুন্যতম তিন বা চারদিন না থাকলে সেই জায়গার কোনকিছুই ঠিকমত অনুভবই করা যায় না।

বিকেলের কালো মেঘ এখন টিপটিপ বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়া শুরু হয়েছে। বো রেগ্রেগ নদীর পানিতে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো, ঝলমলে শহরের বিচিত্র আলোয় যেন ইলোরা অজন্তার অপরূপা সব ভাস্কর্যের মতো বিচিত্র ভঙ্গিতে প্রতিফলিত হচ্ছে। কি ভীষণ সুন্দরী এক রাত! আমি দাঁড়িয়ে আছি তারও চেয়ে সুন্দরী এক প্রাচীন নদীর প্রাচীনতম নগরদ্বারে!

গোবি মরুভূমি

জিকরুর রেজা খানম

চেংগিস খানের দেশ মংগোলিয়ায় যখন যাই তখনই টার্গেট ছিল গোবি মরুভূমিতে যাওয়া। কেন জানি না মরুভূমির প্রতি আলাদা আকর্ষণ আছে আমার। সুজলা সুফলা দেশে বাস করি বলেই হয়ত অচেনা আবহাওয়ার মরুভূমির প্রতি এই আকর্ষণ। গোবির কাছাকাছি এক গের ক্যাম্পে ছিলাম একদিন একরাত। গের ক্যাম্প হলো যাযাবর মংগোলিয়ানরা আদিতে এবং এখনও যে তাঁবুতে থাকে সেই তাঁবুতে থাকা এবং তাদের জীবনধারণের সাথে পরিচিত হওয়া। গের মানেই তাঁবু। এগুলো গোলাকৃতির হয়।

মংগোলিয়ার এই গের ক্যাম্পে ট্যুরিস্টদের রাখা হয় যাতে তারা স্থানীয় নোমাডদের জীবনাচরণ, খাদ্যাভাস, কালচার এসব সম্পর্কে জানতে পারে।

এখনও মংগোলিয়ার অনেক মানুষ আগের মতোই যাযাবরের জীবনযাপন করে। রাজধানী উলানবাটোরের আশেপাশেও গের বা তাঁবুর দেখা পেয়েছি। তবে আজ গের নয়, বলবো শুধু স্বচক্ষে দেখে আসা গোবি মরুভূমির কথা।

প্রথমেই আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ব্যাক্ট্রিয়ান ক্যামেলে সওয়ার হতে। এই দুই কুঁজ বিশিষ্ট বিশেষ ধরনের উট কেবলমাত্র এই মরুভূমিতেই পাওয়া যায় জানতাম। পরে শুনেছি লাদাখেও নাকি এই উট আছে। এদের অসহনীয় ঠান্ডা সইবার ক্ষমতা আছে। গোবি মরুভূমি অন্যতম শীতল মরুভূমি, লাদাখও প্রচণ্ড শীতল।

গোবির টিলার মতো উঁচু যে জায়গায় মধ্যবয়সী গাইড ইদ্রি আমাদের নিয়ে গেল তাতে দুটি গের বা তাঁবু ছিল। অবশ্য তাতে বাস করে একটিই পরিবার বা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি। দাদা দাদি মা বাবাভাইবোন চাচা চাচিসহ পুরো একটি পরিবার। দুধের তৈরি শক্ত শক্ত নোনতা তক্তি জাতীয় চকলেটের মতো খাবার এবং চা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়েছিল আমাদের। বাক্যালাপ অবশ্য মধ্যবয়সী গাইড ইদ্রি মারফত করা লাগলো। মংগোলিয়ান ভাষা ও রাশান ভাষার চল এখানে। ইংরেজি খুব একটা জানে না কেউ।

তারপর আমরা গেলাম দুই কুঁজ বিশিষ্ট উটে চড়ার জায়গায়। ছয়টা বড় বড় উটে শ্বেতাঙ্গ ছয়জন অল্পবয়সী ট্যুরিস্ট সারিবেঁধে আসছিলো। দূর থেকে ভারী চমৎকার দেখাচ্ছিল কাফেলাটিকে। ইদ্রি যখন জানালো এই ছয়টি উটই একঘণ্টা করে আমাদের পালা করে গোবিতে ঘুরিয়ে আনবে। তখন উটের পরিশ্রম করার ক্ষমতা আর সহ্যশক্তি দেখে অবাক লাগেনি তবে একটু খারাপ লাগছিল। সকাল থেকে নিশ্চয়ই এদের দিয়ে এইকাজই করানো হচ্ছে! মরুভূমির জাহাজতো আর এদের এমনি এমনিই বলা হয় না!

আমরা যেহেতু বারোজনের দল তাই দুইবারে যেতে হবে। শুনে আমি বললাম,

আমি পরের ট্রিপে যাবো। না গেলেও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আগে বাচ্চারা, মানে অল্পবয়সীরা যাক।

বলে আমি চত্বরটার আরেক পাশে চলে এলাম। সাবিরা জ্বরে কাহিল হয়ে একটা বেঞ্চে বসেছিল। সাথে ছিল ইফ্রিত, জার্জিনা, মেহতাজ। ওরা উটে চড়বে না। মেহতাজের জীবজন্তুতে এলার্জি। আর এই উটগুলো কি গোসল করে? কে জানে! আবছা একটা জানোয়ার জানোয়ার গন্ধ আমি নিজেই পেয়েছি। কিন্তু তাতে উটে চড়া বন্ধ থাকবে না। মাঠে ঘাটে কোথায়ই বা এই উট পাবো? তাই এখানেই ব্যাক্ট্রিয়ান উটে চড়বো, তারপর ক্যাম্পে ফিরে গরম পানিতে গোসল করে নিলেই হলো!

আমরা সবাই মিলে বেশ ছবি টবি তুলছি, হঠাৎ কে যেন এসে বললো,

আন্টি, একটা উট খালি যাচ্ছে, আপনি যান, নয়তো পরেরবার একা একা যেতে হবে। আর কেউ নাই উটে চড়ার।

শুনে আমি কোনদিকে না তাকিয়ে হুড়মুড়িয়ে অকুস্থল পৌঁছে যে উটটা হাঁটুমুড়ে বসেছিল, তার পিঠের উপরে নিজের একখান ঠ্যাং তোলার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম। চেষ্টা করলেইতো আর হয় না। বিশালদেহী উট, আমার বলে এখানে যতবার মিনিবাসে উঠছি ততোবার ডান হাতে বাম পায়ের গোছা ধরে পাদানিতে তুলে দিতে হচ্ছে। দুই হাঁটু ফেলে দেয়া পায়ের এতো জোর নাই যে নিজে নিজে লাফ দিয়ে উঠে যাবে! মিনিবাসের পাদানির তুলনায়তো পাহাড়ের উপর পা তোলার চেষ্টা করছি! যে মোংগল নোমাড ব্যক্তিটি উটের দড়িখানি ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি খানিকক্ষণ দেখে কোন বাক্যবিনিময় ছাড়াই গোড়ালির কাছে আমার পায়ের গোছাখানি ধরে কোন কেতায় কি করছে জানি না, দেখি আমি দিব্যি উটের পিঠে বসে আছি! উটওয়ালা দুইদিকের একটুকরো কাঠের উপর আটকানো লোহার আংটাতে আমার দুইপা আটকে দিল। তাতে বসতে সুবিধাই হলো। আমি বসতেই উট চলা শুরু করলো। সাহারায় সব উট সারি বেঁধে শুয়ে ছিল এবং পেছন দিক থেকে উঠা শুরু হয়েছিল। অল্পবয়সী দুই সহিস জানিয়েছিল সামনের উটকে দাঁড়াতে দেখলে নাকি বাকিগুলোও দাঁড়িয়ে যাবে, বসে পড়লে সবকটা বসে যাবে। হতেও পারে। এখানেও আমার উটের পেছনে কোন উট ছিল না। কিন্তু উটওয়ালা উটগুলোকে বাঁধার সময় সাবিনের উটকে সবার পেছনে বাঁধলো। তারপর চলা শুরু হলো। দেখি উটওয়ালার সাথে সাথে হেঁটে চলেছে ইদ্রি আর জাফরিন। ভীষণ অবাক হয়ে বললাম,

জাফরিন! উটে উঠবে না?

করুণ মুখে জাফরিন বললো,

আন্টি, আর উট নাই। ছয়টাই ছিল!

হায় আল্লাহ! কি বলো! উট নাকি খালি যাচ্ছে, তাইতো আমি এসে উঠলাম! আসো, আমি নেমে যাই, তুমি উঠো। আমি সাহারায় উঠেছি। এখানে না উঠলেও চলবে!

না না আন্টি, আপনি যান। আমি হেঁটেই যাই।

বার বার বলার পরেও কিছুতেই রাজি হলো না। দলটা অতিমাত্রায় ভদ্র। এই জাফরিন মেয়েটির চরিত্রে আলাদা একটা মাধুর্য আছে। চেষ্টা করেও ওর উপর কেউ বিরক্ত হতে পারবে না। এই যে বার বার বলছি থামো, আমি নেমে যাই!

কেউ কর্ণপাতই করলো না। উটকে কমান্ড শুনানো আমার কাজ নয়। এমন গিল্টি লাগছিলো। বাচ্চা মেয়েটা হেঁটে যাচ্ছে। কিন্তু উটওয়ালা আর ইদ্রি সামনে দিব্যি গল্প করতে করতে হেঁটে যাচ্ছে যেন আমার চেঁচামেচি তারা শুনতেই পাচ্ছে না!

এদিকে দুইকুঁজের মাঝখানে হলো স্যাডেল বা গদি। কিন্তু ধরার কিছু নাই। ধরতে হলে ঐ কুঁজই ধরতে হবে। একবার খামচে ধরেও ফের ছেড়ে দিলাম। এভাবে ধরলে উট নির্ঘাত ব্যথা পাবে। আবার উট চলে হেলেদুলে। খাড়া হয়ে বসেও এদিক ওদিক দুলতে হয়। শেষে কুঁজ ঘেঁষে স্যাডেলের যে বেল্ট সেটা

গোবি-২

কায়দা করে চেপে ধরলাম। এইরকম পাহাড়ের মত উটের পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়লে হাঁড়গোঁড় একটাও আস্তো থাকবে না। অল্পদূর যাওয়ার পরেই

আচমকা আমার পেছন থেকে সাবিন হাউ মাউ করে চেঁচিয়ে উঠলো,

আন্টি দেখেন আমার উটটা কি শুরু করেছে! আমি পায়ে ব্যথা পাচ্ছি! দুই উটের মাঝখানে আমার পা চাপা পড়েছে। উটটা কিছুতেই পেছনে থাকছে না। খালি সামনে চলে যাচ্ছে!

তাকিয়ে দেখি সাবিনের উট অল্পবয়সী, পেছনের কুঁজ এখনো গজায়নি, অল্পবয়সের তাড়নায় আর হালকা পাতলা সোয়ারি পেয়ে তড়বড় করে ছুটতে লেগেছে। উটগুলো পরপর একই দড়িতে পরস্পর বাঁধা না থাকলে নির্ঘাৎ সবার সামনে চলে যেতো। জাফরিনকে উটে তুলতে নেমে যাওয়ার জন্য আমার চেঁচামেচিতে যেমন কেউ কান দেয়নি, তেমনি সাবিনের চেঁচামেচিতেও কেউ কান দিল না। যেমনি সবাই চলছিল তেমনি চলতে লাগলো। যেন কিছুই হয়নি, কিচ্ছুটি ঘটেনি। মনে পড়ে গেল সাহারায় পেছনের উট ঠিক এমনি করে এগিয়ে এসে খচমচ করে আমার জামার প্রান্ত চিবুনো শুরু করেছিল তখন ভয়ের চোটে আমি একেবারে মাতৃভাষায় চেঁচাতে শুরু করেছিলাম ‘উট আমাকে খেয়ে ফেললোগো’ বলে। সবচাইতে মোটাতাজা উঁচু উটে চড়েছিলাম, জানতাম না ওটাই ছিল লিডার, সবার আগে চলবে। তাই অল্পবয়সী সহিস আমার পাশেই ছিল। ছেলের চেয়েও কমবয়সী। সে আমার চেঁচানি শুনে হাসতে হাসতে পাশের উটের মুখ থেকে আমার জামার অংশ টেনে বের করে বেটাকে একটু পিছিয়ে নিয়ে বলেছিল,

ডোন্ট ক্রাই! ইটস ওকে! ওকে! ডোন্ট বি এফ্রেইড! হি ইজ ভেরি জেন্টেল! হি ক্যান্ট ইট ইউ!

বলার সময় তার হাসিমুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল বেদম মজা পাচ্ছে, হাসির চোটে তার চোখদুটি কুঁচকে উঠেছিল। হাসির কারণ উট কোন ভয়ংকর জন্তুর পর্যায়ে পড়ে না আর আমার মত হুমদো বয়স্ক মহিলা কিনা খেয়ে ফেললোগো বলে চেঁচাচ্ছে! বাংলা হলেও চোখমুখ দেখে আন্দাজ করে নিয়েছিল কি বলছি! তখন আমি চেঁচামেচিতো চেঁচামেচি! ভয়সুদ্ধ একদম গিলে ফেলেছিলাম। ইজ্জত কা সওয়াল হ্যায়! কিন্তু পুরো পথটুকু পেছনের উটটি বার বার এগিয়ে এসে কিছু না কিছু মুখে দেবার বা চাটার চেষ্টা করেই গেছে, করেই গেছে! আর তাতে আমার পা এই সাবিনের মতন দুই উটের মাঝখানে চাপা পড়ছিল। কিন্তু কেউ আমাদের কথায় কান দেয়া দূরে থাক, ফিরেও তাকায়নি! গোবিতেও তাই। অগত্যা দুজনেই চিল্লামাল্লা বাদ দিয়ে চারিদিকের দৃশ্য উপভোগে মন দিলাম।

গোবি-৩

যাচ্ছি বণ্য গুল্মে ছাওয়া গিরিখাত বা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে কখনও সমতল ভূমির উপর দিয়ে। মরুভূমিতে উটে চড়ছি নিচে বালির ডিউন দূরে থাকুক, বালিই নাই! ভাবছিলাম সামনে নিশ্চয়ই বালি পাবো। যেখান দিয়ে যাচ্ছি তাকে মরুভূমি কইলে অন্য মরুভূমিরা রাগ করতে পারে। কিন্তু চারিদিকের দৃশ্যাবলী, এককথায় অপূর্ব! দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। অন্য ধরনের দৃশ্যপট। এমন মরুভূমি আগে কখনও দেখিনি, এমন প্যানোরোমিক ভিউও নয়। সবকিছুই যেন আলাদা রকম। দেখতে দেখতে আমরা ঘুরে ফিরে যেখান থেকে উঠেছিলাম, সেখানেই ফিরে এলাম এবং কারো সাহায্য ছাড়াই দিব্যি নেমে এলাম। নেমেই ইদ্রিকে পাকড়াও করলাম,

এর নাম বুঝি ডেজার্ট? স্যান্ড নাই, ডিউন নাই, কিচ্ছু নাই! এটা ডেজার্টই না! গম্ভীর হয়ে সিরিয়াস মুখে ইদ্রি বললো,

আসলে আমরা যেখান দিয়ে ঘুরেছি সেটা ওয়েসিস। তবে গোবি মরুভূমির সবজায়গায় বালি পাবে না। এটা একটু অন্যরকম মরুভূমি। তোমাদের ডিউনে নিয়ে যাবো। তখন দেখবে ওটা মরুভূমিই মনে হবে। তবে গোটা মরুভূমিতে ডিউন মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট।

ফের মিনিবাসে উঠে যাত্রা শুরু। একজায়গায় এসে গাড়ি থেমে গেল, সামনের একচিলতে স্রোতধারার উপরে কাঠের পাটাতন দেয়া মানুষ পারাপারের রেলিংবিহীন সাঁকোরমত। ওটা পার হলে কিছুদূরে দেখা যাচ্ছে গোবি মরুভূমির উঁচু উঁচু বিশাল বিশাল বিশাল বালিয়াড়ি। কিন্তু অতখানি হাঁটা আমার পোষাবে না। অবস্থাটা বুঝে সাবিরা ইদ্রিকে বললো, দেখ, আমাদের সবাই অতদূর হেঁটে যেতে পারবে না। ডিউনের কাছাকাছি গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না?

ফের গাড়ি ঘুরিয়ে অনেকখানি ঘুরে তবে ডিউনের গোঁড়ায় গিয়ে গাড়ি থামলো। বালিয়াড়ি বা বালির পাহাড়গুলো এতো চমৎকার, যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছিল আয় আয়। দূর থেকেই দেখছি অনেক মানুষ বালির পাহাড়ে উঠে সর সর করে স্লিপারে নামার মত নামছে। বিকেলের আলোতে হলুদ রঙগা বালি যেন সোনার মত জ্বলজ্বল করছে। বইয়ে যেমন লেখে ঠিক তেমনি হিরন্ময় একটি চিত্র যেন আঁকা চোখের সামনে। তার এমনই আকর্ষণ যে হুড়মুড় করে সবাই নেমে গেল, এমনকি জ্বরে কাবু সাবিরা পর্যন্ত!

সেভেনে পড়ুয়া ছেলে সাদিককে পেছনে ফেলে মা নাহিদও দলের সাথে। আমি পেছনে পড়বো খুব স্বাভাবিক। সাদিক দেখি একটা গাছের লম্বা শিকড় বালি থেকে টেনে টেনে তুলছে। গোটা এলাকায় এক মানুষ সমান উঁচু এই একটা গাছই দাঁড়িয়ে মাথায় কিছু পাতা আর চিকন চিকন ডালপালা নিয়ে। বললাম,

কি কর সাদিক?

দেখছি এটা কতদূর গেছে।

ছেড়ে দাও, নয়ত মরে যাবে গাছটা। আসো, আমার কিছু ছবি তুলে দাও, আমিও তোমার ছবি তুলে দেই।

আমি ছবি তুলি না আন্টি। আপনাকে তুলে দিচ্ছি।

সেকি! আমিতো তোমার হাতেই সবসময় ডান্ডা লাগানো মোবাইল দেখি!

মা আমাকে দিয়ে ছবি তোলায়। আমি নিজের ছবি তুলি না।

এতোটুকু ছেলের মুসুল্লিপনায় আমার মুখে আর কথা ফুটল না। কিছু ছবি টবি তুলে বালির টিলায় কিছুদূর উঠে বুঝলাম এ আমার কম্ম নয়। একপা এগুলে তিনপা গড়িয়ে নামা লাগে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চারিদিকের অসামান্য সৌন্দর্য দেখে ফিরে এলাম গাড়িতে। বসে বসে দেখলাম সোনালি আলো আস্তে আস্তে গাঢ় হলো, আকাশের নীল মিলিয়ে গিয়ে রক্তিম আভায় পশ্চিমাকাশ কি অপরূপ রূপে সেজে উঠলো। পট করে মনে পড়ে গেল উড়িশ্যার চিল্কা লেকের আর মাদ্রাজের সমুদ্রপারের সূর্যাস্তের কি অসাধারণ বর্ণনা সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছেন। কিন্তু হায়! মুজতবা আলী একজনই। তার মত কলমের জোর বা পান্ডিত্য কোনটাই আমার নাই। থাকলে আমিও আমার পাঠকদের এই অপরূপ

সৌন্দর্যের কিছু নমুনা দেখাতে পারতাম।! সে যখন হবার নয় তখন তার চাইতে গোবি মরুভূমি সম্পর্কেই কিছু তথ্য দিয়ে নেই।

গোবি চীনের উত্তরে ও মঙ্গোলিয়ার দক্ষিণে বিস্তৃত একটি শীতল মরুভূমি। উইকপিডিয়া বলছে বিশ্বের ষষ্ঠ , আবার কোথাও পেলাম এটি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মরুভূমি। উইকপিডিয়ার তথ্যই সঠিক।

প্রায় ১৩ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের গোবি একটি অদ্ভুত ধরনের মরুভূমি। যার বৈশিষ্ট্যগুলো অন্য মরুভূমির চাইতে অনেক খানিই আলাদা। অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল চরম তাপমাত্রা, শীত গ্রীস্মে যার উঠানামার রেশিও ভয়ানক টাইপ। মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রি থেকে পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

গোবিতে বৃষ্টিপাত হয় না কারণ হিমালয় আর্দ্র বাতাস আটকে দেয়। এতে তেমন আশ্চর্য হইনি, কারণ বিশ্বের অধিকাংশ মরুভূমিই এমন বৃষ্টিবিহীন। কোথায় যেন পড়েছিলাম , খুব সম্ভব সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখায়, ঠিক মনে পড়ছে না। সুদানের সাহারা মরুভূমিতে একবার কয়েক ইঞ্চি বৃষ্টি পড়েছিল। তাতে বাচ্চা বুড়ো মেয়ে পুরুষ সবাই কেয়ামত নেমে এসেছে ভেবে ভয়ানক ভয় পেয়ে কান্নাকাটি ছুটোছুটি শুরু করেছিল। কাজেই গোবিতে বৃষ্টি হয় না এ আশ্চর্যের কিছু নয়। আশ্চর্যের হলো গোবিতে তুষারপাত নিত্যকার ঘটনা। তবে চিন যে কারিগরি শুরু করেছে তাতে গোবি আর কতদিন গোবি থাকে বলা মুশকিল। গোবির ধূলিঝড় প্রায়ই বেইজিং পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর বালুর স্তর বিছিয়ে বেইজিংয়ের জীবনযাত্রা স্থবির করে ফেলে। চিন তাই গোবির উৎপাত ঠেকাতে বিশাল এক কর্মযজ্ঞ শুরু করেছে। তাদের প্রান্তের মরুভূমিতে ব্যাপক হারে মরুসহিষ্ণু গাছ লাগানো শুরু করেছে এবং অনেকদূর এগিয়েও গেছে। এই বনায়ন নিঃসন্দেহে গোবির চেহারা পাল্টে দেবে, পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাবে, তাতে ভালো হওয়ার পাশাপাশি খারাপও হবে কিছু কিছু তা চোখ বুঝেই বলে দেয়া যায়। তবে তের লক্ষ বর্গ কিমির সবটা বনায়ন হতে বহুযুগ লেগে যাবে, তাছাড়া সবটুকু গোবিতো আর চিনের নয়। ১৩ লাখের মধ্যে পাঁচ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার গোবির মালিক মংগোলিয়া। তাই এসব আলোচনা বাদ দিয়ে গোবির বর্তমান তথ্য নিয়েই নাড়াচাড়া করা যাক।

গোবি মরুভূমির বেশিরভাগ অংশই বালুকাময় নয়, বরং পাথুরে এবং রুক্ষ। এই বৈশিষ্ট্যই একে অন্যান্য বালুকাময় মরুভূমির থেকে আলাদা করেছে। ৩৩টি উপমরুভূমি নিয়ে হলো গোবি। যাদের প্রতিটির আবার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। যদি ভেবে থাকেন গোবি বালু বিছানো বিশাল এক ভূমি তাহলে ভুল করবেন। মাত্র তিরিশ পার্সেন্ট বালু আর পাঁচ পার্সেন্ট ডিউন বা বালিয়াড়ি আছে গোবিতে।

গোবি-৪

তিরিশ পার্সেন্ট বালু নিয়েই গোবি ভেল্কি দেখায়। এশিয়া জুড়ে বালি ছড়িয়ে দেয়। চিন ছাড়াও কোরিয়া জাপানসহ বিভিন্ন দেশে গ্রীস্মকালে গোবি মরুভূমির বালি পৌঁছে যায় যা শ্বাসকষ্টজনিত রোগিদের জন্য অত্যন্ত বিপদজনক।

প্রাচীন সিল্ক রোডের একটি অংশ গিয়েছিল এই গোবির ভেতর দিয়ে। এই রোডের কিছু জায়গায় ছোট ছোট শহর বা লোকালয় ছিল যার বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অপরিসীম। ত্রয়োদশ শতকে চেংগিসীয় সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সাথে সাথে সিল্ক রোডের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার জন্য মোংগলরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছিল।

মংগোল ও চিনা পশুপালক নোমাডরা এই গোবি অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে। প্রাচীনকাল থেকেই এরা গোবির উপর নির্ভরশীল।

বালি ছাড়াও গোবিতে আছে টিলা গিরিখাত অল্পকিছু গাছপালা ও গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ।

পৃথিবীর সবচাইতে বেশি ও সবচাইতে অক্ষত ডাইনোসরদের ফসিল পাওয়া গেছে এই গোবিতে।

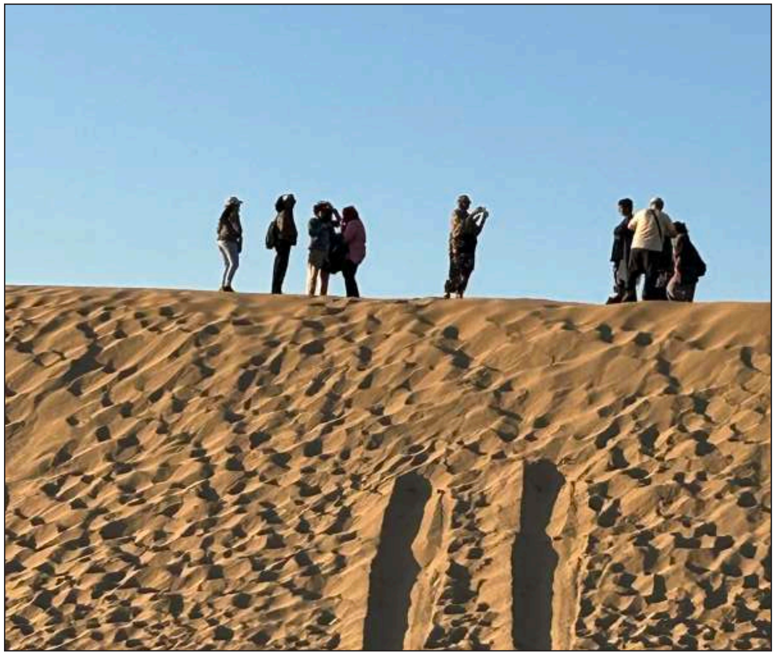

গোবি-৫

এখনও গোবি মরুভূমিতে বিচিত্র ও বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীর বাস। প্রজাভালস্কি নামের অতি প্রাচীন বুনো ঘোড়া বাস করে এখানে। যদিও কমতে কমতে এদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র এক হাজারে।

গোবি বাদামি ভাল্লুক নামের দুস্পাপ্য ভালুক বাস করে গোবিতে। জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানান কারণে এদের সংখ্যা এখন নেমে এসেছে পঞ্চাশে। দুই কুঁজওয়ালা ব্যাকট্রিয়ান ক্যামেলের কিছু অংশ মানুষের পোষমানা। কিন্তু এদের একটা বড় অংশ বুনো এবং এদের বসবাস এই গোবি মরুভূমিতে। অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু এই বুনো প্রাণীটি গোবির প্রচণ্ড তাপ ও শীতলতা সহ্য করে আজও টিকে আছে।

সোনা তামা কয়লা ও কিছু তেলসহ কিছু খনিজ পদার্থ আছে এই মরুভূমিতে। মংগোলিয়ার অংশে কিছু কিছু উত্তোলনও শুরু হয়েছে।

গোবি মরুভূমিতে ইয়ারদাং নামে পরিচিত কিছু প্রস্তরভূমির গঠন রয়েছে, যা খুবই আকর্ষণীয় এবং রহস্যময়।

গোবি মরুভূমিতে খংগো নামের বালির টিলা রয়েছে যা ১৮৫ কিমি দীর্ঘ এবং এরা বিকট শব্দে গান গায় বা বুমবুম বা গুনগুন শব্দ করে। এজন্য এদের সিংগিং টিলা নামে ডাকা হয়। বিজ্ঞানীরা এখনো নিশ্চিত হতে পারেননি কেন এই বালির টিলাগুলো এমন শব্দ করে।

এছাড়াও কিছু কিংবদন্তি ছড়িয়ে আছে গোবিতে। এখানকার মানুষ বিশ্বাস করে গোবিতে ড্রাগন বসবাস করে যারা শীতকালে কূপের ভেতর নিদ্রা যায়। ড্রাগন যেহেতু জল ও স্থলের প্রাণী তাই তারা শীতকালে কূপের ভেতরে থাকে। স্থানীয় কেউ যদি এমন কূপের দেখা পায় তবে তা পবিত্র জ্ঞানে সাদা ভেড়ার পশমের তৈরি চাদর বিছিয়ে সেই স্থান ত্যাগ করে। এছাড়া স্থানীয়রা বিশ্বাস করে এই গোবি মরুভূমিতে একপ্রকার কীট আছে যা দেড় মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এরা এতোই বিষাক্ত যে এর ছোঁয়া লাগলেই মানুষ মারা যায়। এনিয়ে একটি হলিউডি মুভিও নির্মিত হয়েছে যদিও ড্রাগনের মতোই বাস্তবে এই কীটের দেখা পাওয়া যায়নি।

মোটকথা গোবি মরুভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং ঐতিহাসিক স্থানগুলো পর্যটকদের কাছে খুব জনপ্রিয়। এটি এমন মরুভূমি যা একটি বিশাল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ স্থান, যেখানে ইতিহাস, প্রকৃতি এবং সংস্কৃতির এক অপূর্ব মিলন ঘটেছে।

এসব তথ্য নেট ঘাটলে যে কেউ পেয়ে যাবেন, কিন্তু চোখে দেখার যে রোমাঞ্চকর অনুভূতি, তা পেতে হলে মংগোলিয়ায় আসতে হবে বা চিনে যেতে হবে। যারা প্রকৃতিপ্রেমী, তাদের বলবো মংগোলিয়ার প্রান্তের গোবিতে আসতে। চিনারা হলো ব্যবসাদার জাতি, তাদের দিকের গোবিতে নাকি পার্কের মতো করে নানানরকম আধুনিক রাইড টাইডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সেখানে মরুভূমির আমেজ কতোটা পাওয়া যাবে জানি না। সে তুলনায় মংগোলিয়ার গোবি এখনও অনেকটাই আদিম রয়ে গেছে, সেই সাথে আছে আদিম যাযাবর জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন নিজের চোখে দেখার সুযোগ।

নায়েগ্রা

ড. নাঈমা খানম

কানাডার ব্রাম্পটনের শান্ত শহরে ফেব্রুয়ারির শুরুর এক হিমশীতল ভোর। আকাশে মৃদু আঁধার, বরফে ঢাকা নিঃশব্দ রাস্তাঘাট। ভোরের আলোয় যাত্রা শুরু হয় আমাদের, সিক্সসিটেড গাড়ির স্টিয়ারিং হাতে ভাতিজা রফিক, তার পাশের আসনে জজসাহেব। পেছনে বসেছি দুই ছেলে ও আমি। আমাদের অদম্য কৌতূহল, চোখে একরাশ স্বপ্ন আর হৃদয় জুড়ে এক রোমাঞ্চকর উত্তেজনা। গন্তব্য কিংবদন্তি নায়েগ্রা ফলস।

বরফের আবরণে ঢাকা চারপাশ, গাড়ির জানালায় জমে থাকা কুচি বরফের জলকণা আর ছেলেদের দুরন্ত খুনসুটি — সব মিলিয়ে ভ্রমণের শুরুটাই ছিল যেন স্বপ্নের মতো। গাড়ির ভেতরেই হাসি-ঠাট্টায় মেতে রইল ছেলেরা, সামনে কথা বলছিল জজসাহেব আর ভাতিজা রফিক। জানালার বাইরে ভেসে যাচ্ছিল সবুজ বনভূমি, ছড়ানো ছিটানো ছোট্ট ছোট্ট শহর আর নদীর ধারা যা অপার এক আনন্দের উৎস হয়ে রইল আমার চলার পথে। প্রকৃতি যেন আমন্ত্রণে ধীরে ধীরে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের এক বিস্ময়ের জগতে।

প্রায় দেড় ঘণ্টার ড্রাইভের পর, রাস্তার পাশে ঝিরঝিরে গর্জন শোনা যাচ্ছে। দূরে দেখা যাচ্ছে মেঘের মতো ছড়িয়ে থাকা ধোঁয়া - নায়েগ্রার জলরাশির আতিশয্য যেন আমাদের ডাকছে। শুনেছি, প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩,১৬০ টন জল নায়েগ্রা ফলস দিয়ে গড়িয়ে পড়ে। এটি বিশ্বের অন্যতম সর্বাধিক জলপ্রবাহের জলপ্রপাত। শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য নয়, বিদ্যুৎ উৎপাদনেও নায়েগ্রা গুরুত্বপূর্ণ — এখানকার জলশক্তি থেকে কানাডা ও আমেরিকা বিপুল পরিমাণ জল বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে থাকে। গাড়ির গতি বাড়াল রফিক, যেন দ্রুত সেই প্রাকৃতিক বিস্ময়ের মুখোমুখি হতে পারি।

গাড়ি পার্ক করতেই ছেলেরা লাফিয়ে নামল। আসা পর্যন্ত তাদের অবচেতন মনে নায়েগ্রা ফলসের যে ছবি মনে গাঁথা ছিল, প্রথম দর্শনে তা হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া মুহূর্ত যেন! ঠান্ডা বাতাসে শরীর কাঁপলেও উত্তেজনায় তা অনুভব হচ্ছেনা। পায়ে পড়ে থাকা তুষারের খটখটে আওয়াজের সঙ্গে আমরা এগুতে থাকি ঝরনার ধার বরাবর ফলসের মূল ভিউপয়েন্টে। সামনে খুলে গেল এক অপার বিস্ময়ের জানালা। বিশাল এক জলপ্রাচীর — হর্সশু ফলস। অদম্য শক্তিতে অনেক উঁচু থেকে জল ছুটে চলেছে নীচে, মায়াময় কুয়াশা ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। বিস্তৃত বিশাল জলরাশি চোখ আর মন দুটোই জুড়িয়ে দিল আমাদের। আপ্লুত আর বিস্মিত আমরা, নায়েগ্রা জলপ্রপাতের ভীমগর্জনে জলের অবিশ্রান্ত পতন দেখে। জলের ধারার এ পতনের শেষ নেই যেমন, বিরতিও নেই তেমনি। পড়ছে তো পড়ছেই। বিশাল জলরাশি গর্জন করতে করতে আছড়ে পড়ছে নীচের দিকে। হর্সশু ফলসের বিশালতা দেখে মনে হচ্ছে, যেন পৃথিবীর সমস্ত শক্তি এখানে একত্র হয়েছে। কান পাতলে শোনা যায় প্রকৃতির নিজস্ব সুর — একটানা, গভীর, মহাকাব্যিক।

ছেলেরা খুশিতে দৌঁড়ে বরফ নিয়ে খেলায় মেতে উঠল।শীতে জমে থাকা ইউক্যালিপটাস গাছের ডালপালা থেকে বিভিন্ন শেপের বরফের দলা হাতে তুলে নিচ্ছে এবং একে অন্যের দিকে ছোড়াছুড়ি করছে। আমরা দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলাম। ঠান্ডা বাতাসে উড়ে আসা জলকণা আমাদের মুখ ছুঁয়ে যাচ্ছে — প্রকৃতির স্পর্শ প্রাণে প্রাণে অনুভূত হচ্ছে যেন। বুকের ভেতর এক অদ্ভুত শিহরণ বয়ে গেল প্রথমবার হর্সশু ফলসের ঝাপটানো জলরাশির দেখা পেয়ে!

উপর থেকে নিরন্তর পতন, প্রচন্ড শক্তি আর অপূর্ব সৌন্দর্যের এক দুর্ধর্ষ মিলন। আমেরিকা থেকে এর শোভা পুরোপুরি দেখা যায় না। নায়েগ্রা ফলসের দৃশ্য কানাডা থেকেই বেশি ভালো দেখা যায়। মুগ্ধতায় দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ চারপাশের কোলাহল ভুলে, শুধু জলপ্রপাতের গর্জন শুনি। পাশেই ছিল ব্রাইডাল ফলস — সূক্ষ্ম,

শান্ত, যেন সাদা রঙের স্বপ্ন। আর একটু দূরে আমেরিকান ফলস, দৃঢ় আর শক্ত মেজাজে দাঁড়িয়ে থাকা প্রকৃতির এক অনন্য সৃষ্টি।

নায়েগ্রা ফলস সৃষ্টি হয়েছে ন্যাগারা নদীর জলধারার ফলে, যা মূলত এরি লেক থেকে শুরু হয়ে অন্টারিও লেক পর্যন্ত প্রবাহিত। বরফ যুগের শেষ দিকে, প্রায় ১২,০০০ বছর আগে, হিমবাহের গলনজল এই নদী ও ঝরনার সৃষ্টি করে মূলত তিনটি পাশাপাশি অবস্থিত ভিন্ন জলপ্রপাত নিয়ে নায়েগ্রা জলপ্রপাত গঠিত। এই তিনটি জলপ্রপাতের মধ্যে সবচেয়ে বড়টি, ঘোড়ার খুরের মতো দেখতে হর্স্‌শু ফলস বা কানেডিয়ান ফলস। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক স্টেটের সীমান্তে এটি অবস্থিত। তুলনামূলকভাবে ছোট দুটি জলপ্রপাত হলো আমেরিকান ফল্‌স এবং ব্রাইডাল ভেইল ফল্‌স, যারা যুক্তরাষ্ট্র সীমানার অন্তর্গত। ব্রাইডাল ভেইল ফল্‌স হর্সশু ফল্‌স থেকে গোট আইল্যান্ড এবং আমেরিকান ফল্‌স থেকে লুনা আইল্যান্ড এর মাধ্যমে পৃথক করা হয়েছে, দুটি দ্বীপই যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত। প্রায় বিশতলা বাড়ির সমান উচ্চতা থেকে লাফ দিয়ে ফলসের নীচে যে বিশাল গহ্বরে প্রবল বেগে নায়েগ্রা নদীর জল এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার গভীরতাও অনেকটা এই জলপ্রপাতেরই সমান,গহ্বরটি ১৮৪ ফুট গভীর। জলের ঝাপটায় সেখানে সারাক্ষণই ঘন কুয়াশায় ঢেকে থাকে বলে এর নাম দেয়া হয়েছে 'দ্য মেইড অব দি মিস্ট পুল'।

জলপ্রপাতের উঁচু পারে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকা সহস্র পর্যটকের ভিড়। ভীমগর্জনে জল যখন আকাশ ছুঁয়ে পতিত হচ্ছে নিচের অতল গহ্বরে, এক মায়াময় দৃশ্যের অবতারণা হয় যা রূপকথার জগতের মতো মনে হলো আমার। সূর্যের আলোয় সেই সাদা ধূসর জলরাশি রঙিন রূপকথার মতো ইন্দ্রধনু গড়ে তুললো। কুয়াশার মতো ছিটে এসে গায়ে লাগে, মনে হলো মেঘভাঙা বৃষ্টির দুয়ার খুলে গেছে, আর সেই রুদ্ররাজ দৃশ্যের অবস্থানের মাঝে দাঁড়িয়ে দেখলাম রোদবৃষ্টির দোলাচলে ঝলকে উঠল আকাশ, এক অপার্থিব দৃশ্যের সূচনা হলো, ধরা দিল রংধনু এ এক অপার্থিব দৃশ্য। আমেরিকার বিশাল চারটি লেক- লেক মিশিগান, লেক হুরণ, লেক সুপেরিয়র এবং লেক ইরির জল এসে মিশেছে নায়েগ্রা নদীতে। তারপর অনেক খানা-খন্দক, পাহাড়, উপত্যকা পেরিয়ে নায়েগ্রা নদীর জল ঝাঁপিয়ে পড়ছে অনেক নীচে এক বিশাল গহ্বরে। প্রতি মুহূর্তে নায়েগ্রা জলপ্রপাত দিয়ে গ্যালন গ্যালন জল পড়লেও সেই জল কিন্তু কোথাও জমা হচ্ছে না। সেই জলের ধারা গিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে কানাডার লেক অন্টারিওতে।

সন্ধ্যায়, যখন জলরাশির ওপর রঙিন আলো নেমে এল, তখন পুরো দৃশ্যপট যেন এক জাদুকরী রূপ নিল। রাতের বেলা লেজার আলোর খেলা জলপ্রপাতকে করে তোলে এক রূপকথার রাজ্য। প্রতিটি মুহূর্তেই নায়েগ্রা তার রূপের ভিন্ন মাত্রা উন্মোচন করে, যেন প্রকৃতি নিজেই এক শিল্পী হয়ে রঙতুলি দিয়ে জল আর আলোয় এঁকে চলেছে

এক অবিনাশী চিত্র। আলো আর পানির খেলায়, মনে হচ্ছে আমি যেন কোনো পরীদের দেশে হারিয়ে গেছি। ঝরনা ঘুরে আমরা যখন ক্লিফটন হিলে আসি, সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ক্লিফটন হিলের আলোকময় রাত যেন একেবারে অন্যরকম রূপ নিয়েছে — চারদিক রঙিন আলোয় ঝলমল করছে। বাচ্চাদের আনন্দের শেষ নেই। আমরা Ripley's Believe It or Not Museum, Movieland Wax Museum আর Niagara Skywheel দেখলাম। বিশাল স্কাইহুইলে উঠে পুরো নায়েগ্রা শহরকে ওপর থেকে দেখার অভিজ্ঞতাই অসাধারণ। চারদিকে ঝিকিমিকি আলো, দূরে ঝরনার গর্জন — এক স্বপ্নের শহর যেন।

শীতের সন্ধ্যায় ঘুরে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তখন ঢুকে পড়লাম বিখ্যাত Fallsview Casino Resort এলাকার Galleria Shops-এ। এখানে আছে অনেক নামকরা ব্র্যান্ড — Michael Kors, Swarovski, Roots Canada ইত্যাদি। ছেলেদের পছন্দে কিনলাম কিছু ছোট্ট গিফট আর স্যুভেনির। ঘুরে এসে ঢুকলাম পাশেই থাকা Starbucks Niagara Falls-এ। গরম ক্যাপুচিনোর কাপ হাতে নিয়ে গরম হাওয়া মুখে লাগতে লাগতেই জানালার ওপার থেকে ঝরনার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ঠান্ডা বরফ আর কফির উষ্ণতায় যে অপূর্ব মিশ্রণ, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।

নায়েগ্রা নামটির উৎস নেটিভ ইরোকুয়াস গোত্রের "অনগিয়াহরা", অর্থাৎ 'বিশাল জলরাশি'। এটি ক্যানাডা ও আমেরিকার সীমান্তজুড়ে বিস্তৃত হলেও, কানাডা থেকেই ফলসটির প্রকৃত সৌন্দর্য সবচেয়ে ভালো দেখা যায়। কানাডার দিক থেকে দেখা যায় হর্সশ্যু ফলস অশ্বক্ষুরাকৃতির সেই বিস্ময়কর জলপ্রপাত, যেখানে প্রতি মুহূর্তে পতিত হয় ৭৫,০০০ গ্যালন জল, আর তা গিয়ে মিশে কানাডার লেক অন্টারিওতে।তবে নায়েগ্রা শুধু জলপ্রপাত নয়, বরং এক বিস্তৃত প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা।

নায়েগ্রা জলপ্রপাত কানাডিয়ান দিক থেকে হর্সশু ফলসের দুর্দান্ত দৃশ্য দেখার জন্য বিভিন্ন আকর্ষণ ও কার্যক্রমের সুযোগ করে দেয়। কানাডিয়ান দিকটি হর্সশু ফলসের আইকনিক দৃশ্য এবং আমেরিকান ফলসের নিকটস্থতার জন্য পরিচিত। বিশ্ববিখ্যাত ও সবচেয়ে বড় হর্সশু ফলসের শক্তিশালী ও মন্ত্রমুগ্ধকর দৃশ্য উপভোগ করতে এই এলাকায় নৌকা ভ্রমণ বা মেইড অব দ্য মিস্ট বোট বা জার্নি বিহাইন্ড দ্য ফলসের মাধ্যমে সুযোগ রয়েছে রেইনকোট আর লাইফ জ্যাকেট পরে প্রবল ঝাঁপটায় প্রপাতের খুব কাছে যাওয়ার। কিচ্ছু দেখা যায় না, শুধু কানে তালা লাগানো গর্জন আর সজোরে দুলতে থাকে বোট, অভিজ্ঞতা হয় ভয়াবহ, মনে হয় মৃত্যু থেকে ফিরে আসা নতুন জীবনের স্বাদ ।

বিখ্যাত স্কাইলন টাওয়ার থেকে জলপ্রপাত এবং চারপাশের এলাকার ৩৬০-ডিগ্রি প্যানোরামিক দৃশ্য উপভোগের রোমাঞ্চকর ব্যবস্থা ছাড়াও আছে আরো কত কি!

জলপ্রপাতের উপর দিয়ে জিপলাইনে উড়ে যাওয়ার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হতে পারে পর্যটকের জীবনের এক বিরাট স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। প্রপাতটাকে ভালোভাবে দেখার জন্য যেমন বোটে করে ফলসের নীচে যাওয়া যায়, তেমনি হেলিকপ্টারে চড়ে ফলসের ওপর দিয়েও ঘোরা যায়, এবং ঝুঁকিপূর্ণ হলেও পর্যটকদের কাছে খুবই জনপ্রিয় এই হেলিকপ্টারে চড়ে ঘুরে নায়েগ্রা জলপ্রপাত দেখা । আবার সুড়ঙ্গপথে হেঁটে বা এলিভেটরে দিয়ে জলপ্রপাতের নীচে যাওয়া যায়, আর সামান্য দূরে রেলিং ধরে দাঁড়িয়েও জলপ্রপাতের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। এছাড়া, রাতে আমেরিকা এবং কানাডা দু'দেশ থেকেই জলপ্রপাতের ওপর লেজার বীম দিয়ে আলোকসম্পাত করা হয়। সে এক নয়ন মনোহর মায়াবি দৃশ্য।

এছাড়া, লুনা দ্বীপে জলপ্রপাতের ধার ঘেঁষে সারি সারি কাঠের পাটাতন দিয়ে সিঁড়ি বানানো হয়েছে, এই সিঁড়ি দিয়েও ব্রাইডাল ভেইল ফলসের পেছনে যাওয়া যায় যেখানে রয়েছে বাতাসের গুহা। নায়েগ্রা পার্কস কমিশনের আওতাধীন বিভিন্ন পার্ক ও উদ্যান ঘুরে দেখা, কেনাকাটা এবং খাবারের মতো নানা আকর্ষণও রয়েছে। নায়েগ্রা ফলসের দু'পারেই গড়ে উঠেছে প্রচুর হোটেল, মোটেল- আছে ক্যাসিনো ও স্যুভেনিয়ারের দোকান, পার্ক, ছোটদের জন্য আছে ফানফেয়ার। অনেক নবদম্পতি নায়েগ্রা ফলসে হানিমুন করতে আসে, তারা ফলসের পাশে দাঁড়িয়ে ফটোশুট ও ভিডিওগ্রাফি করে থাকে স্মৃতিময় সময়কে বন্দী করে রাখার জন্য।

কানাডার সীমানায় ফলসের সাথে বিশাল এলাকা জুড়ে মনোরম উদ্যান, কুইন ভিক্টোরিয়া পার্ক রয়েছে। পার্কের ছায়াঘেরা পথ, বিশাল ফুলঘড়ি যার প্রতিটি পাপড়ি প্রকৃতির রঙে আঁকা, আর ছোট্ট জাদুঘরে ধরে রাখা ইতিহাস—সব মিলিয়ে এক পরিপূর্ণ ভ্রমণের আবেশ জাগায়। পাহাড়ের ঢালে আছে একটি বিশালাকার ঘড়ি। এই ঘড়িতে কোনো নম্বর লেখা নেই, লেখা আছে নায়েগ্রা পার্কস। সবুজ ঘাসের বুকে লাল ফুল দিয়ে তীরের আকৃতি দিয়ে তার ওপর হলুদ ফুল দিয়ে একেকটি অক্ষর লেখা। প্রতিবছরই এই ঘড়ির ফুলগাছগুলো বদলে ভিন্ন রঙে এবং ঢঙে করা হয়। পাহাড়ের নীচে গুহার ভেতরে ছোট্ট একটি মিউজিয়াম আছে, সেখানে সেইসব ফটো বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে।

প্রতি বছর বিশ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ আসে নায়েগ্রা ফলসের শোভা দেখতে। নায়েগ্রার সৌন্দর্য এখানকার মানুষের জীবনযাত্রায় এক আলাদা প্রাণশক্তি যোগ করেছে। নায়েগ্রা ফলস শহরটি মূলত পর্যটননির্ভর। স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবন জীবিকা পর্যটকদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হোটেল, রেস্টুরেন্ট, দোকান, ট্যুর গাইড সার্ভিস, পরিবহন — সবই ফলসের দর্শনার্থীদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। বসন্ত থেকে শরৎ পর্যন্ত এখানে পর্যটকের ঢল নামে, তবে শীতে যেমন

আমরা ফেব্রুয়ারিতে গিয়েছিলাম কিছুটা কম থাকে ভ্রামণিক। তবে শীতের সৌন্দর্য অন্যরকম, এ সময় বরফঢাকা ফলসের এক মোহময় রূপ দেখা যায়।

জলপ্রপাতের আশেপাশের সবটা জায়গায় প্রচন্ড শীতল জলের ঝাপটা, যা বাষ্পীভূত হয়ে বৃষ্টির রূপ ধারণ করে। এজন্য নায়েগ্রা ফলসের আশেপাশের এলাকায় সবসময়ই একটু বেশি ঠান্ডা থাকে। ভারী রেইনকোট না পরলে ভিজতে হয়, নয়তো শীতে কাঁপতে হয় আর জলপ্রপাতের শোভা উপভোগ করা যায়না ঠিকমত। হৃদয়ে গেঁথে থাকা নায়েগ্রা সফর শেষে

ক্লান্ত শরীর আর পরিপূর্ণ আনন্দ নিয়ে আমরা ফিরছি। গাড়িতে বসে পেছনের সিটে ঘুমিয়ে পড়া ছেলেদের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, আজকের দিনটিই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ স্মৃতিগুলোর একটি হয়ে থাকবে। আর আমার কাছে নায়েগ্রা শুধু একটি জলপ্রপাত নয়, এটি এক অপূর্ব অভিজ্ঞতাঃপ্রকৃতির সামনে মানুষের ক্ষুদ্রতা আর বিস্ময়ের এক অনবদ্য উপলব্ধি।

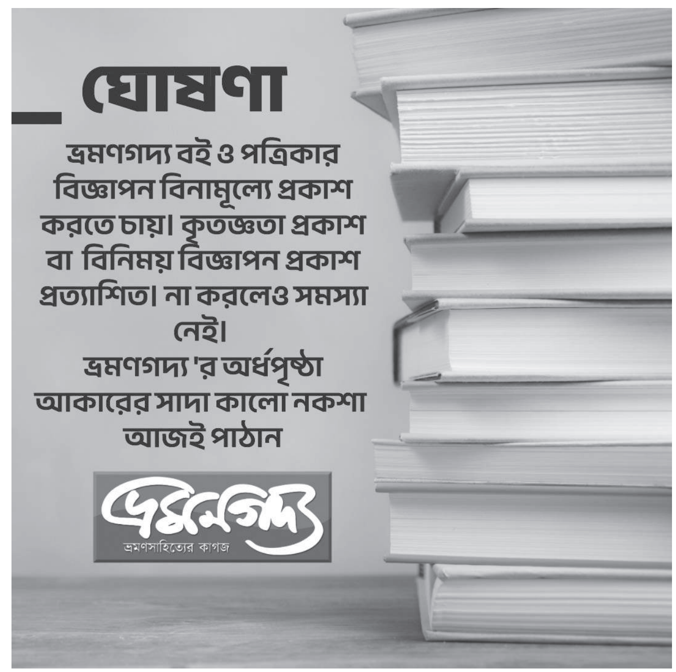

বলিহার জমিদার বাড়ি

ড. ডি. এম. ফিরোজ শাহ্

কর্মোপলক্ষে ধান-চাউল আর আমের জেলার নওগাঁ শহরে এসেছি আটমাস হতে চলল কিন্তু শহরের বাইরে কোন দ্রষ্টব্য স্থান দেখা হয়নি যা আমার বৈশিষ্ট্যের বিপরীত। তবে এ না যাওয়ার পিছনে অনেক হেতু রয়েছে যা না বলে আজকের ভ্রমণকেই গুরুত্ব দেই। এখানে এসে পরিদর্শন স্থান হিসেবে যে স্থানটির কথা সকলে বলেছে সেটি হলো বলিহার জমিদার/রাজবাড়ি যার অবস্থান শহরের কাছেই।

ভূগোল বিভাগের অফিস সহায়ক অমিতাভের বাড়ি বলিহার জমিদার বাড়ির আশেপাশে। ওকে নিয়েই একদিন সেখানে যাবো বলে ঠিক করে রাখলাম। এরই মাঝে পরিচয় ঘটলো নওগাঁর এসএসসি ১৯৮৪-র বন্ধুদের সাথে যাদের একজন বলিহার ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক জনাব মো. রহিদুল আলম সবুজ।

অতঃপর বন্ধু সবুজকে নিয়ে আষাঢ়ের দ্বিতীয় দিনে সকাল নটার পর শহর থেকে বলিহার জমিদার/রাজবাড়ি রওনা হলাম।

বলিহারের জমিদার বাড়ি রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার অন্যতম বিখ্যাত জমিদার বাড়ি। বলিহার জমিদার পরিবার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নৃসিংহ চক্রবর্তী। বলিহারের জমিদারগণ মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক জায়গির লাভ করে এ এলাকায় নানা স্থাপনা গড়ে তোলেন যার মধ্যে বলিহার রাজবাড়ি অন্যতম। ১৮২৩ সালে জমিদার রাজেন্দ্রনাথ এখানে একটি মন্দির নির্মাণ করে মন্দিরে পিতলের তৈরি রাজেশ্বরী দেবীর একটি মূর্তি স্থাপন করেন। রাজেশ্বরী দেবীর মূর্তটি বলিহারসহ সমগ্র অঞ্চলে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। বলিহার জমিদার বাড়ির অনেক জমিদার উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। তাদের মধ্যে কৃষ্ণেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর ছিলেন বিখ্যাত লেখক। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল-কৃষ্ণেন্দ্র গ্রন্থাবলী প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভাগের সময় বলিহারের রাজা ছিলেন বিমেলেন্দু রায়। এ সময় জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হলে বলিহারের রাজা বিমেলেন্দু রায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা শহরে চলে যান। এরপর বলিহার রাজবাড়ির ভবনটি দেখভাল করেন রাজ পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও কর্মচারীগণ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং পরবর্তীতে রাজবাড়ির বিভিন্ন নিদর্শন, আসবাবপত্র, জানালা-দরজাসহ বিভিন্ন সামগ্রী লুট হয়ে যায়।

নওগাঁ জেলা শহর থেকে নওগাঁ-রাজশাহী সড়কে ১৮ কিলোমিটার পশ্চিমে বলিহার ইউনিয়নের কুড়মইল মৌজায় বলিহার ইউনিয়নে বলিহার রাজবাড়ি অবস্থিত। আমরা দু'বন্ধু অটোরিক্সায় করে বালুডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ডে গেলাম। এখান থেকে রাজশাহীর লোকাল বাসে চড়ে বাবলাতলী নেমে ভ্যানে করে ১ কিলোমিটার ডানে গেলেই বলিহার জমিদার বাড়ি, সাথে রয়েছে একটি বাজার।

আমরা দুইবন্ধু বাসে না গিয়ে একটি অটো নিলাম যেন গল্প করতে করতে এবং রাস্তার দুপাশ দেখতে দেখতে যেতে পারি।

বালুডাঙ্গা রাজশাহী, জয়পুরহাট ও সাপাহার-পোরশাগামী বাসস্ট্যান্ড যা এখন অনেক ব্যস্ত জায়গা। পাশেই নওগাঁ শহর বাইপাস ও একটি বিনোদন পার্ক। শহরের পূর্বপাশে ঢাকা ও বগুড়া যাবার আলাদা বাসটার্মিনাল রয়েছে।

আমরা বলিহার জমিদার বাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার জন্য একটি অটো রিজার্ভ করলাম যেটি এগিয়ে চলল নওহাটা মোড় অভিমুখে।

রাস্তা খুবই চমৎকার। দু'পাশে অনেকগুলো অটোমেটিক রাইস মিল। নওগাঁ জেলা মূলত ধান ও চাউলের জন্য বিখ্যাত। ইদানিং যোগ হয়েছে নানাপ্রকার উচ্চ ফলনশীল জাতের আম। তবে নওগাঁর অন্য একটি পরিচয় আছে-গাঁজার শহর। ব্রিটিশ আমলে

বলিহার জমিদার-রাজবাড়ী যাবার নির্দেশক

এখানে ব্যাপকভাবে গাঁজার চাষ হতো এবং সেগুলো প্রকাশ্যে দোকানে বিক্রির ব্যবস্থা করা হতো যা হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ শাসন আমলে বন্ধ করা হয়। শহরের দয়ালের মোড় ছিল গাঁজা সেবনের প্রধান আখড়া।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা নওহাটা পৌঁছলাম। নওহাটা মোড়টি একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এখান থেকে সোজা পথটি গেছে মান্দা হয়ে রাজশাহী শহরে আর ডান দিকে গেলে মহাদেবপুর হয়ে সাপাহার, পোরশা। রাজশাহীর দিকে ২/৩ কিলোমিটার এগুতে হাতের ডানে পেলাম বাবলাতলী মোড়, এখানে রাস্তায় এ্যারো দিয়ে বলিহার জমিদার বাড়ির পথ নির্দেশ করা হয়েছে যার দুরত্ব ১ কিলোমিটার।

আঁকাবাঁকা সরু পথ দিয়ে বলিহার বাজার সংলগ্ন জমিদার বাড়িতে উপস্থিত হলাম। প্রথমেই চোখে পড়ল রাজ-রাজেশ্বরী দেবীর মন্দির ভবন। মন্দির গেটে আমাদের স্বাগত জানালো সবুজের একজন ছাত্র। মন্দিরের বাহির গেটটি প্রশস্ত ও সুন্দর। তবে গেটের বাম পাশে রয়েছে একটি চায়ের দোকান যা এর সৌন্দর্য ব্যাপকভাবে নষ্ট করেছে। এখানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের একটি নোটিশ টানানো হয়েছে।

ভিতরে প্রবেশ করে দেখি অনেকটা জায়গা জুড়ে হরিনাম কীর্তনের বিস্তৃত অবকাঠামো। বাম দিকের দেয়ালের সাথে একটি ব্যানারে এ বছরে অনুষ্ঠিত '২৪ প্রহর ব্যাপী শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দের লীলা কীর্তন' ও যজ্ঞানুষ্ঠানের সূচি। এই স্থানটির নাম তারা লিখেছে 'বলিহার রাজবাড়ি শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ মন্দির অঙ্গন'। এবার বাম দিক দিয়ে সামনে মূল মন্দিরের গেটে গেলাম। এখানে একটি ছেলে শুয়ে ছিল, দেখে মনে হয়েছিল 'নেশারু'। ও আমাদের দেখেই উঠে এলো, সবুজকে ছালাম দিলো। জানলাম ওর নাম খোকন চন্দ্র প্রামাণিক, কেয়ারটেকারের দায়িত্বে আছে। সেও সবুজের কলেজ পর্যায়ের ছাত্র। শিক্ষকদের নিয়ে ভ্রমণের এই সুবিধা, সর্বত্রই ছাত্র পাওয়া যায়!

খোকন ধর্মের ভক্তি আর কর্মের দায় নিয়ে ওর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। খোকন চমৎকার মানুষ, ও খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের এই বাড়ির সংরক্ষণ, সংস্কার ও ইতিহাস বর্ণনা করে গেল।

জনশ্রুতি আছে, মুঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহ বাংলার বার ভূঁইয়াদের দমন করতে অনেক সৈন্যসামন্ত নিয়ে এই অঞ্চলের বলিহারে পৌঁছেন। সৈন্যবাহিনী দীর্ঘ পথ অতিক্রম করায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের বিশ্রামের জন্য এবং সেনাপতি মানসিংহের পাঠানো গুপ্তচরের মাধ্যমে বার ভূঁইয়াদের খবর জানতে মানসিংহ এই রাজবাড়ী এলাকায় যাত্রাবিরতি করেন। সেই সময়ে বরেন্দ্র অঞ্চলে শুষ্ক মৌসুম চলছিল। সৈন্যরা বেশি দিন কোন কাজ না করে বসে থাকলে অলস হয়ে যেতে পারে-এইরকম ভেবে সেনাপতি মানসিংহ সৈন্যবাহিনী দিয়ে এই এলাকায় ৩৩০টি দীঘি এবং পুকুর খনন করেন। এগুলোর মধ্যে মালাহার, সীতাহার, বলিহার, অন্তাহার দীঘি উল্লেখযোগ্য। একদা রাজপ্রসাদের সামনে একটি ছোট চিড়িয়াখানা ছিল যেখানে বাঘ, ভাল্লুক, বানর, হরিণসহ নানা প্রজাতির পশুপাখি ছিল। বলিহারের নয় চাকার রথ প্রসিদ্ধ ছিল। আজ সবই ইতিহাসের অংশ।

মন্দিরে প্রবেশ পথে সবুজ দূর্বাঘাসের কার্পেট, দু'দিকে দুটি বড় খিলান দণ্ডায়মান যা খুবই কারুকার্যময়। এর নির্মাণ কাঠামো রোমান স্থাপত্য রীতির সাথে তুলনীয়। এরপর একটি ছোট তোরণ যার রয়েছে ৩টি দরজা। মাঝের দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশের সময় দেখা গেল এখানের ছোট ছোট কোটর রয়েছে। ভেতরের

বলিহার রাজবাড়ির গেটে দর্শনার্থীসহ আমরা

রাজবাড়ির মন্দিরের প্রবেশপথ

কম্পাউন্ডে নাটমন্দির, রাজ-রাজেশ্বরী মন্দির, জোড়া শিব মন্দির। যদিও বিভিন্ন মন্দিরের দেয়ালের কারুকাজ, মূল্যবান মুর‍্যালের কাজগুলো এখন অস্পষ্ট ও ভাঙ্গা। এই কারুকাজগুলো ছিল এই মন্দিরগুলোর শোভাবর্ধক। উঁচু বেদির ওপর নির্মিত একতলা মন্দিরের সামনে কয়েকটি জবা ও টগর ফুলের গাছ। কয়েকটিতে ফুল আছে এখনও। মন্দিরের ভিতরে একটি কালি মূর্তি রয়েছে যার সামনে কোন ভক্ত কর্তৃক প্রদত্ত দুটি সাদা ফুল অবহেলায় পড়ে আছে।

খোকন জানালো, বলিহারের জমিদার রাজেন্দ্র ১৮২৩ খিস্টাব্দে লোকান্তরিত হবার পূর্বে এখানকার বিখ্যাত দূর্গামন্দিরে রাজ রাজেশ্বরী দেবীর অপরূপা পিতলের মুর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দির ভবনের ভিতরে অনেকগুলো কক্ষ। এই কক্ষগুলো এক একটি মন্দির ছিল বলে জানা যায়। বলিহার রাজবাড়ির সম্মুখের কারুকার্যময় অলংকরণ বিশিষ্ট মন্দির ও বিশাল দ্বিতল রাজবাড়ির অংশ দর্শনার্থীদের নিকট আজও আকর্ষণীয়।

আমরা একটি ছোট পকেট গেট দিয়ে মন্দির থেকে বের হয়ে রাজবাড়ির মূল ভবনে গেলাম।

রাজবাড়ির মূলভবনটি খুব বড় নয়। লোহার গেটটি খুবই শক্ত যা ২০০ বছরেও অটুট আছে। খোলা গেটের দু'পাশে দু'টি বড় স্তম্ভ, এরপর মুক্ত প্রান্তর, তারপর একটি দ্বিতল ভবন। রাজবাড়ি চত্বরে ঐ সময়ের রোপিত ৩টি প্রাচীন গাছ পাওয়া

গেল- একটি কামিনী, একটি পাম ট্রি এবং একটি ফুলের গাছ যার নাম কেউ বলতে পারেনি।

আমি একটি ছোট ভিডিও ক্লিপ তৈরি করলাম যেখানে খোকন অনেক তথ্য প্রদান করলো। খোকন জানালো বলিহার রাজবাড়ির একজন বংশধর, রাজার নাতি অমৃতেন্দ্রু রায় (Amritendu Roy) এখনও জীবিত আছে যিনি কলকাতায় বাস করেন। ও তার একটি ছবিও দিল।

খোকনকে নিয়ে আমরা রাজবাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলাম। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় এবং পরবর্তী সময়ে রাজবাড়ির বিভিন্ন নিদর্শন, আসবাবপত্র, দরজা-জানালাসহ বিভিন্ন সামগ্রী লুট হয়ে যায়। এরপর থেকে রাজবাড়িটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। শুধু রাজবাড়ি চত্বরে অবস্থিত মন্দিরে স্থানীয় ভাবে পূজাঅর্চনা করা হয়।

রাজবাড়ির আয়তকার ভবনের মাঝে খোলা প্রান্তর। এরপর উচুঁ বেদিতে দোতলা ভবন। রোমান-গোথিক রীতিতে তৈরি ভবনে পুরোটাই সামনে বারান্দা, তারপর কক্ষ। মেঝের টাইলসগুলো ইউরোপের সুইজারল্যান্ড থেকে আনা হয়েছে। নিচতলার কক্ষগুলো খুব সুপরিসর নয়। বর্তমানে রাজবাড়ির স্থাপনা যা এখনো টিকে রয়েছে তার অবস্থা মোটেও ভালো না। ঝুঁকি থাকায় দোতলায় উঠতে পারলাম না।

চারদিক ভালো করে তাকালাম। রাজবাড়ি আছে, তবে রাজা বা রাজ্য নেই। আছে রাজা ও জমিদারের সময়কার রোপণ করা অনেক বৃক্ষ আর তাদের তৈরি করা নানা স্থাপনা। কালের সাক্ষী হয়ে রাজার শাসন আমলের প্রায় ২০০ বছরের স্মৃতি মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঐতিহ্যবাহী নওগাঁর বলিহার রাজবাড়িটি যা এক সময় কত শানশওকত ছিল।

রাজবাড়ি থেকে বের হয়ে আমরা বাড়ির পেছনের দিকে গেলাম একটি ভিন্ন প্রজাতির বাঁশঝাড় দেখতে। বাঁশ সাধারণত সবুজ বা একটু কালসে রঙের হলেও এর রং হলুদ এবং দু'গিরার মাঝে ফাটা বা দাগ কাটা। এ প্রজাতির বাঁশ ইতিপূর্বে দেখিনি। যতদূর জানা যায়, এ প্রজাতির বাঁশের জাত সুদূর ইংল্যান্ড থেকে সংগ্রহ করেন বিমেলেন্দু রায়।

পূর্বে রাজবাড়ির ভবনটি স্থানীয় একটি স্কুলের শ্রেণিকক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল কিন্তু নতুন স্কুল ভবন নির্মিত হওয়ায় রাজবাড়ি ভবনটি এখন পরিত্যক্ত। প্রাসাদ এর ভিতরে অবস্থিত দেবালয় পূজা অর্চনার কাজে ব্যবহৃত হয় এবং প্রাসাদের পেছনে বিশাল আকারের ২টি শিবলিঙ্গ পাশাপাশি রয়েছে। পাশের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বলিহার ডিগ্রি কলেজটি জমিদারদেরই জমি বাবলাতলীতে স্থানান্তর করা হয়েছে। রাজবাড়ির বাহিরে ১৯৬৯ সালে বলিহার দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যার সাথে রয়েছে একটি সুন্দর খেলার মাঠ। একদা রাজবাড়ির স্থাবর সম্পদের

রাজবাড়ির প্রধান ফটক

পরিমাণ প্রায় ১০ একর হলেও বর্তমানে তা ৩.৫০ একর জায়গা বর্তমানে বাংলাদেশ প্রত্মতত্ত্ব অধিদপ্তর অধিগ্রহণ করেছে। অবশিষ্ট জায়গা বলিহার দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় তত্ত্বাবধান করে।

নওগাঁর বলিহার রাজবাড়ি একটি প্রাচীন ও অত্যন্ত মূল্যবান স্থাপনা। বলিহার জমিদার বাড়ির মন্দির, মূলবাড়ি, স্থাবর সম্পদ সবই ঝুঁকির মধ্যে। নওগাঁবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহ্যবাহী বলিহার রাজবাড়ি সংরক্ষণের জন্য প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর অবশেষে এটিকে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসাবে ঘোষণা করে। ২০২২ সালের ২৪ মার্চ সংস্কৃতিকবিষয়ক মন্ত্রণালয় একটি প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করে সেখানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছে। স্থাপনাটির চারপাশ ঘিরে দেওয়া হয়েছে, যাতে এর জায়গা কেই দখল বা কেউ এর ক্ষতি করতে না পারে। প্রতিদিন বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রন্তর এখানে বহু পর্যটক আসছেন। স্থাপনাটি সংরক্ষণ ও সংস্কার করে পূর্বের আদলে ফিরিয়ে আনতে একটি প্রজেক্টের মাধ্যমে এই কাজ করার উদ্যোগ নিয়েছেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। এর মাধ্যমে বলিহার রাজবাড়িটি পর্যটক আকর্ষণীয় করার পরিকল্পনা রয়েছে।

থেমে থেমে আসা গুড়িগুড়ি বৃষ্টি মনে করিয়ে দিল এটা আষাঢ় মাস চলছে। স্থানীয় ছাপড়া হোটেলে গজা আর রং চা খেয়ে ভ্যানে করে বাবলাতলী ফিরে এলাম। সবুজ চলে গেল ওর কলেজে, আমি নওগাঁগামী বাস ধরলাম কলেজে ফিরবো বলে।

জার্মানিঃ রাইনে নৌবিহার

জ্যোতি বিকাশ বড়ুয়া

১২ই অক্টোবর, ২০০০ অপরাহ্নে জেনেভা থেকে ট্রেনে আমরা (আমি ও আমার স্ত্রী) জার্মানির বন্ শহরে পৌঁছি। তারপর তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে পরপর জার্মানির তিনটি বিখ্যাত শহর দেখি- বিঠোফেনের শহর বন্, যা কয়দিন আগেও ছিল বিভক্ত জার্মানির পশ্চিমাংশের রাজধানী; ক্যাথিড্রাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শহর কোলন ও সারা বিশ্বের প্রসাধন প্রেমীদের প্রিয়তম প্রসাধনী ‘অডি কোলন’এর জন্মস্থান এবং জার্মানির সবচেয়ে বর্নাঢ্য ও দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর ফ্রাঙ্কফুর্ট।

এইসব শহরগুলিতে যাবার পথে ট্রেন থেকে এবং শহরগুলিতে ঘোরাঘুরির সময় সড়কের পাশে দূর থেকে সুন্দরী রাইনের সাথে দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে। তখনই মন আকুল হয়েছে তাকে আরো কাছে নিবিড় করে পেতে। খবর নিয়ে জানলাম, বন্ বা কোলন

থেকে রাইন ভ্রমণের জন্য অনেকগুলি সংস্থা 'রাইন রিভার ক্রুইজ' পরিচালনা করে। তারই সুত্র ধরে ১৬ই অক্টোবর সকালে বনে এসে নদীবন্দর এলাকায় রিভার-ক্রুইজ পরিচালনাকারী নামকরা সংস্থা 'কে, ডি, রাইন'এর অফিসে আসি। তাঁদের রয়েছে কয়েক ঘণ্টা থেকে শুরু করে কয়েকদিনের ট্যুরের নানা ধরনের প্যাকেজ। শুধু সময় ও পার্সের সামর্থ্য অনুযায়ী টিকিট কেটে বিলাসবহুল ক্রুইজশিপে উঠে পড়া। আমরা ৬ ঘণ্টা ট্যুরের একটা প্যাকেজ নিলাম- বন্ থেকে 'কোবলেঞ্জ' হয়ে 'রিমাগন' পর্যন্ত। দুপুরের লাঞ্চ ও অপরাহ্নের চা ট্যুর প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত।

রাইন ও দানিয়ুব ইউরোপের দুই বিখ্যাত নদী। এক সময় এই দুই নদী রোমান সাম্রাজ্যের সীমানা নির্ধারন করত। বর্তমানে এটি শুধু রাইন ক্রুইজকারীদের পুরানোদিনের ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখার অবলম্বন নয়, আন্তদেশীয় বাণিজ্য ও মালামাল পরিবহনের প্রধান নৌপথও।

সুইজারল্যান্ডের পার্বত্য অঞ্চলের হিমবাহুর গলিত ধারায় সৃষ্ট কনস্টান্স হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রথমে সুইজারল্যান্ড ও জার্মানির সীমানা এবং পরে জার্মানি ও ফ্রান্সের সীমানা নির্দেশ করে এক সময় জার্মানির ভিতরে প্রবেশ করে। তারপর নেদারল্যান্ডের মধ্য দিয়ে ১৩০০ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা শেষ করে উত্তর সাগরে মিলিত হয়। এই ১৩০০ কিলোমিটারের মধ্যে জার্মানির সীমানা ও ভিতর দিয়ে অতিক্রম করেছে ৮৫০ কিলোমিটার। জার্মানির ঐতিহ্য, সমৃদ্ধি ও শিল্প-

পাহাড়ের ঢালে দৃষ্টিনন্দন আঙ্গুরের ক্ষেত

৮০০ কিলেমিটার দীর্ঘ রাইন নদী

সংস্কৃতিতে এই রাইন নদীর প্রভাব অপরিসীম। জার্মানির অনেক বিখ্যাত শহর রাইন নদীর তীরে অবস্থিত, তারমধ্যে মেইনজ্, বিনগেন, গোটেনবার্গ, কোবলেঞ্জ, বন্ ও কোলন উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এ নদীর তীরে রয়েছে আরো ছোট বড় অনেক শহর।

২

বেলা এগারটায় আমরা আমাদের নির্দিষ্ট ক্রুইজশিপে উঠি। আমরা দোতলার ডেকে উঠে বসি। সাথে আরো বহু বিদেশী ভ্রমণার্থী। তবে আমরা ছাড়া আর সকলই সাদা চামড়ার লোক। পরে দেখেছি, আমরাই একমাত্র তামাটে চামড়ার যাত্রী বলে জাহাজের ক্রু, ক্যাপ্টেন থেকে শুরু করে সকলের বিশেষ খাতির ছিল আমাদের প্রতি। বিশেষ করে শাড়িপরা আমার স্ত্রী ছিল তাঁদের অন্যতম দ্রষ্টব্য। যাত্রা শুরুর আগে গাইড ফ্রান্স ও ইংরেজিতে আমাদের ক্রুইজ সম্পর্কে একটা ধারণা দেয় এবং আমাদের করণীয় ও অকরণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দেয়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই যাত্রা শুরু হয়। শিপ উজানে এগোতে থাকে। দুপাশে ছোট বড় পাহাড়, কোন কোন পাহাড় বেশ উঁচু। নদীর দুই পাড়ের পাহাড়গুলির অবর্ণনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও অনবদ্য ল্যান্ডস্কেপের জন্য রাইন নদীর বিশ্বজোড়া খ্যাতি। তাই এই রাইন ভ্রমণে প্রতি বছর সারা বিশ্ব থেকে আসে অগণিত পর্যটক। ইউরোপের প্রধান ও আকর্ষণীয় ঋতু 'অটাম' বা শরৎ। এই সময়ে নামে পর্যটকদের ঢল।

আমাদের জাহাজ পূর্বতীর ঘেঁষে চলতে থাকে। এই তীরেই বেশি পাহাড় আর অরণ্য। পাহাড়ের বৃক্ষরাজি বা অরণ্যের দিকে তাকিয়ে দেখি নানা রঙে রঞ্জিত বৃক্ষের একটির পর একটি প্রাকৃতিক বাগান। বৃক্ষের রং কোথাও হালকা সবুজ, কোথাও ঘন সবুজ, কোথাও হালকা হলুদ বা ঘন হলুদ, কোথাও পিঙ্ক, কোথাও মেরুন। যেন সব আমাদের কৃষ্ণচূড়া পলাশের মত রঙিন ফুলের গাছ; যেন কোন শিল্পীর তুলিতে আঁকা দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল ক্যানভাস। আসল ঘটনা হচ্ছে অটামের এই সময়ে গাছের পাতা পাকতে শুরু করে এবং একসময় সম্পূর্ণ পেকে ঝরে যায়। যেহেতু সব গাছের পাতা একই সময়ে পাকে না, তাই পাকার তারতম্যে এমন দেখায়। এক একটা অংশে এক এক বর্ণের সমারোহ। প্রকৃতির এমন সৃষ্টি দর্শককে বাক-রহিত করে। মনে হল আজ যে দৃশ্য দেখছি, মনের ক্যানভাস থেকে তা কোনদিন মিলিয়ে যাবে না।

৩

আবার এই বর্ণিল গাছপালা বা অরণ্যের ফাঁকে পাহাড়ের চূড়ায় বা ঢালে মাঝে মাঝে দেখি বড় বড় ক্যাসল্ বা দুর্গ। কোন কোন ক্যাসল্ ৭০০/৮০০ বছরের প্রাচীন। কালের সাক্ষী এই ক্যাসল্গুলি ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে নানা কল্প-কাহিনী ও মিথ্। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখি ইতিহাসের উত্থান-পতনের সাক্ষী এই ক্যাসলগুলি। দূর থেকে দেখেও বিস্মিত হই কোন কোন ক্যাসলের

৭০০-৮০০ বছরের প্রাচীন ক্যাসল

অনুপম গথিক স্থাপত্যকর্ম । এক সময় আমাদের দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হয়। খাবার ছিল খুবই উপভোগ্য।

আমরা রাইনের যে অংশে ভ্রমণ করছি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য সে অংশটিকে বলা হয় 'রোমান্টিক রাইন'। তাছাড়া এই অংশে এবং এর আগে পিছে নদীর দুপাড়ে পাহাড়ের ঢালে রয়েছে বহু দ্রাক্ষাক্ষেত বা আঙ্গুরের বাগান। পাহাড়ের ঢালে ধাপে ধাপে আঙ্গুরের ক্ষেতগুলিও খুব দৃষ্টিনন্দন। এই আঙ্গুর থেকে জার্মানির বিখ্যাত বিয়ার তৈরি হয়।

৪

বন ছেড়ে কিছুদূর আসার পর আমাদের বামে পরে প্রথম বড় শহর পড়ে 'কোনিগ্‌বিন্টার', তারপর একে একে 'বাদ হোনেফ', 'উঙ্কেল' ও 'লিঞ্জ'। লিঞ্জ একটি অতি প্রাচীন শহর, 'লিঞ্জ ক্যাসেল'এর জন্য বিখ্যাত। প্রায় চার ঘণ্টা চলার পর 'বাদ হোন্নিনগেন' শহরকে বামে রেখে আমাদের ক্রুইজশিপ দিক পাল্টায়, আমরা আবার উল্টোদিকে রওনা দিই। এবার জাহাজ বাম তথা পশ্চিম তীর ঘেঁষে চলতে থাকে। এপাশে পাহাড় কম, মাঝে মাঝে উচ্চভূমিতে ছোট ছোট শহর গ্রাম।

আমরা জাহাজের ডেকে বসে দাঁড়িয়ে ক্লান্তিহীনভাবে উপভোগ করছি দুপাশের নদীতীরের দৃশ্য। ভাবি এ দেখা যেন শেষ না হয়। পথে আমরা আরো দুটি বড় শহর অতিক্রম করে বেলা পাঁচটায় রিমাগন শহরে পৌছি। ঘাটে জাহাজ ভিড়ে। এখানে আমাদের অবিস্মরণীয় নৌবিহারের সমাপ্তি। জাহাজ থেকে নেমে রাইনকে বিদায় জানাই। তারপর সহযাত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যে যার গন্তব্যের উদ্দেশে যাত্রা করি।

ভ্রমণে ভোজন

ফরিদুর রহমান

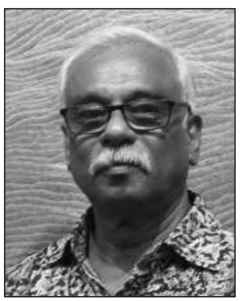

আমরা যারা দেশের বাইরে কোথাও ঘুরতে বা বেড়াতে যাই তখন আমাদের মূল আকাঙ্ক্ষা কী থাকে? ভ্রমণের সাথে সম্পৃক্ত আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই মানুষভেদে ভিন্ন। কেউ ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে জাদুঘর বা প্রাচীন স্থাপনায় ঘুরে বেড়ান, কারো কাছে পাহাড়-সাগর-বনভূমির নৈসর্গিক রূপই ভ্রমণের প্রকৃত আকর্ষণ। কেউ কেউ অবশ্য স্থানীয় মানুষের জীবনযাপন, তাদের হাট-বাজার ও কেনাকাটা, পোশাক পরিচ্ছদ এবং সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে জায়গাটিকে অনুভব করতে চান। মানুষের খাদ্যাভ্যাস তো সংস্কৃতিরই অংশ, তাই ভ্রমণের পূর্ণতা অনেকাংশে নির্ভর করে খাবারের অভিজ্ঞতার ওপর। স্থানীয় খাবারই আমাদের সেই জায়গার প্রকৃত স্বাদ ও আত্মার সঙ্গে যুক্ত করে। একটি নতুন শহরের অজানা অচেনা রেস্টুরেন্টে স্থানীয় মধ্যাহ্নভোজ, রাস্তার ধারে গরম ভাজাপোড়া, কিংবা কোনো প্রাচীন বাজারের টং দোকানে চায়ের পেয়ালায় চুমুকের অভিজ্ঞতা ভ্রমণকে জীবন্ত করে তোলে। তাই ভ্রমণ কেবল চোখে দেখার নয় চেখে দেখার, স্বাদে গন্ধে ভরা একটি বিরামহীন যাত্রা।

বিশ্বের অনেক দেশেই অনেক প্রাচীন এবং ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রেস্তোরাঁর এখনো টিকে আছে, যেখানে সে দেশের খ্যাতিমান লেখক কবি বা রাষ্ট্র প্রধানদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা খাবার খেতেন বা আড্ডা জমাতেন। রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গের লিটারেতুরনয় ক্যাফেতে পুশকিন, দস্তয়েফস্কি এবং লেরমেন্তভের মতো ১৮ ও ১৯ শতাকের বিখ্যাত লেখক ও কবিদের অনেকেই এখানে আসতেন। যুক্তরাজ্যের লন্ডনে রুলস রেস্টুরেন্টে বসতেন চার্লস ডিকেন্স। রেস্তোঁরার ভেতরে ডিকেন্স নামে একটি প্রাইভেট ডাইনিং রুম এখনো চালু আছে। ইতালির রোমে ১৭৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত এ্যান্টিকো ক্যাফে গ্রেকো ধন্য হয়েছে তিন খ্যাতিমান কবি শেলি, কিটস এবং বায়রনের পায়ের ধুলায়। ফ্রান্সে প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত লে প্রোকো প্যারিসের একটি অন্যতম প্রাচীন ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাফে। রুশো ভলতেয়ার বা বালজাকের মতো বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ এবং কবি সাহিত্যিকেরা এখানে বসতেন।

প্রসঙ্গক্রমে বাংলাদেশের ঢাকায় বিউটি বোর্ডিংয়ের নাম উল্লেখ করা যায়। শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, শহীদ কাদরী বা সৈয়দ শামসুল হকের মতো বাংলাদেশের অনেক লেখক, কবি ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এখানে 'আড্ডা' দিয়েছেন। পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী খাবার পরিবেশনের জায়গা হিসেবে ও লেখালিখি-সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবেও এটি উল্লেখযোগ্য। আর কলকাতার কলেজ স্ট্রিট-এর আইকনিক কফি-হাউস শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবীদের দীর্ঘদিনের মিলন কেন্দ্র। সত্যজিৎ রায় এবং মান্নাদের মতো গুণীজনেরাও এক সময় এখানে আসর জামিয়েছেন।

পৃথিবীর পথে পথে ঘোরাঘুরির সময় অনেক দেশেই নানা ধরনের সুস্বাদু এবং মজাদার, তীব্র ঝাল মশলায় পূর্ণ ভয়ঙ্কর এবং স্বাদ-গন্ধহীন পানসে খাবার খেতে হয়েছে। চক্কর দিয়ে এসেছি খ্যাতিমানদের পদচারণায় মুখর কিছু ঐতিহাসিক ভোজনালয়ে। আপাতত স্পেন, উজবেকিস্তান, পোল্যান্ড, মিশর এবং চীনের পাঁচটি রেস্তোঁরার কথা।

মাদ্রিদঃ বোতিন

মাদ্রিদের পুরানো শহরের সরু, আঁকাবাঁকা গলিতে হাঁটতে হাঁটতেই তাতিয়ানা হঠাৎ সকলকে থামিয়ে দিয়ে বললো, আমরা দাঁড়িয়ে আছি বিশ্বের প্রাচীনতম রেস্তোঁরার বোতিনের সামনে। বাইরের দিকে খোদাই করা কাঠের দরজা, জানালায় স্প্যানিশ

বোতিনের বাইরে

নকশার ঝলক, আর উপরে লেখা নামটা যেন আমন্ত্রণ জানায়—"Restaurante Botín, ১৭২৫"। এ বছর বোতিন তিনশ বছরে পা দিয়েছে। গ্রিনিচ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে বিশ্বের প্রাচীনতম রেস্তোরা হিসাবে বোতিনের নাম লেখা হয়ে গেছে।

ভ্যালেনসিয়ায় একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যাবার পথে মাদ্রিদে তিন দিনের যাত্রা বিরতি নিয়েছিলাম। স্পেনের মাটিতে প্রথমবার পা রেখে রাজধানী শহরটা নিজের চোখে দেখে যাবার সুযোগটা ছাড়তে চাইনি। শুক্রবার দুপুরের দিকে মাদ্রিদে পৌঁছে সেদিন বিকেলেই 'মাদ্রিদ ফ্রি ওয়াকিং ট্যুর' বুক করে ফেলেছিলাম।

পরদিন সকাল দশটায় পৌঁছবার কথা থাকলেও মিনিট কুড়ি আগেই পুয়ের্তা দেলসলে পৌঁছে দূরে থেকেই দেখা গেল রাজা তৃতীয় কার্লোসের চরণতলে সবুজ ছাতা ঘিরে বেশ কয়েকজন ভ্রমণবিলাসী মানুষের জটলা। কাছে এসে সবুজ টি-শার্ট পরা দীর্ঘাঙ্গী নারী মূর্তিকে নিজের পরিচয় দিতেই সে তার হাতের তালিকা মিলিয়ে দেখে নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'আই এ্যাম তাতিয়ানা ফ্রম ওগো ট্যুরস।' আমাদের পরিচয়ের পালা শেষ হতেই সে তার 'ওগো' ট্যুরস এবং বিনামূল্যে নগর পরিভ্রমণের কারণ ও তাৎপর্য ব্যাখা করছিল। আমরা অপেক্ষায় ছিলাম কখন সে 'ওগো- হ্যাঁ গো- এসো গো এবার বেড়াতে যাই' বলে যাত্রা করবে তার অপেক্ষায়। তাতিয়ানা বেশ খানিকক্ষণ তাওয়া তাতিয়ে তারপরে পুয়ের্তা দেলসলের পরিচিতি দিয়ে শুরু করলো তার নগর পরিক্রমা।

মাদ্রিদের তো বটেই বিশ্বের সবচয়ে পুরানো রেস্টুরেন্টের ভেতরে ঢোকার মুহূর্তেই নাকে এসে লাগল এক ভিন্ন ধরনের গন্ধ—কাঠের ধোঁয়া, ভাজা মাংস আর শত বছরের পুরানো ইটের আর্দ্রতার মিশ্রণ। সারি সারি কাঠের টেবিল, লণ্ঠনের মতো আলো, আর মোটা দেয়াল যেন তিন শতাব্দীর গল্প বলছে।

তাতিয়ানার ধারাবিবরণী চলছিল। "বোতিনই পৃথিবীর সবচেয়ে পুরানো চালু রেস্তোরাঁ। ১৭২৫ সালে ফরাসি দম্পতি জ্যঁ বোতিন আর তাঁর স্ত্রী বলা যায় মধ্যযুগের সরাইখানা মতো করে এটি শুরু করেছিলেন। তখনকার দিনে ব্যবসায়ী পরিব্রাজকেরা এখানে থাকতেন, খাবার খেতেন আর ঘোড়ার গাড়ির শব্দে জমে উঠত চারপাশ।"

রেস্তোরাঁর সবচেয়ে বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য হলো, এখানকার অগ্নিকুণ্ড, যাকে আমরা তন্দুর বা বড় আকারের চুলাও বলতে পারি। পরিবেশকদের একজন গর্ব করে বললেন—"এই চুলার আগুন কোনোদিন নিভে নি।" দেখলাম, লালচে অঙ্গারে পুড়ছে মাংস। যে চুলায় তিন শত বছর আগে প্রথম আগুন দেয়া হয়েছিল, শুরু হয়েছিল রান্না, আজও সেই আগুনই বোতিনকে জীবন্ত ধরে রেখেছে। এর মধ্যে দুই দুটো বিশ্বযুদ্ধ এবং নানা রাজনৈতিক এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় গেছে, কিন্তু সময়কে যেন বেঁধে রেখেছে বোতিনের আগুন।

আমাদের ওয়াকিং ট্যুরে হাতে সময় কম ছিল বলে ইচ্ছে থাকলেও খাবারের অর্ডার দেয়া সম্ভব হলো না। রেস্তোরাঁয় টেবিলের ভেতর দিয়ে ঘোরাঘুরির ফাঁকে কল্পনা করছিলাম, এখানে বসেই হয়তো আরনেস্ট হেমিংওয়ে লিখেছিলেন তাঁর উপন্যাস দ্য সান অলসো রাইজে-এর কয়েকটি অধ্যায়। হয়তো কোণে বসে তরুণ গয়া ছবি আঁকার স্বপ্ন বুনেছিলেন। হয়তো কোনো স্প্যানিশ সেনানায়ক যুদ্ধের গল্প শুনিয়েছিলেন সহযোদ্ধাদের। হেমিংওয়ে এবং গয়া যে এই রেস্টুরেন্টে নিয়মিত বসতেন সে কথাও তাতিয়ানা আমাদের জানাতে ভোলেনি। বোতিনের প্রতিটি দেয়াল, প্রতিটি সিঁড়ি, প্রতিটি আসন যেন ইতিহাসের স্তর জমিয়ে রেখেছে। মনে হচ্ছিল এখানে কেউই শুধু খেতে আনে না, আসে খাবারের সাথে ইতিহাসকে রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করতে। উল্লেখ করা যেতে পারে বোতিন-এর এক দুশ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত রেস্তোরাঁও কিন্ত বিশ্বের প্রাচীনতম রেস্টুরেন্টের স্থানটি দখল করতে পারেনি। তার কারণ এর ধারাবহিকতা। বোতিনই একমাত্র প্রাচীন রেস্টুরেন্ট, যা প্রতিষ্ঠার পর থেকে একদিনের জন্যেও বন্ধ থাকেনি।

রেস্তোরাঁর বাইরে বেরোতেই শীতল বাতাসের সাথে ভেসে এলো গিটারের সুর। বোতিনের দরজার দিকে শেষবার তাকালাম। মনে হলো, এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে ভোজনবিলাসী মানুষ শুধু উদর পূর্তি করে না, সে প্রবেশ করে অন্য এক সময়ে, যেখানে অতীত এখনো জ্বলছে দীর্ঘ এক পরম্পরার আগুনে।

তাসখন্দের বেশ কোজন

সকাল বেলা আমিরুন তাসখন্দ হোটেলে প্রাতঃরাশের যথাসাধ্য সদ্ব্যবহারের পরে মনে হয়েছিল দুপুরে না খেলেও চলবে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাতৃমূর্তি স্মারক থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্কোয়ার হয়ে প্রিন্স রুমানভের প্রাসাদ পর্যন্ত এসে আড়াইটা বাজলে মনে হলো এবারে খেতে যাওয়া দরকার। কিছুক্ষণের মধ্যে সেন্ট্রাল এশিয়ান পিলাফ সেন্টার 'বেশ কোজনে' পৌঁছে বুঝলাম এতো কিচেন নয়, পোলাও বিরিয়ানির কারখানা।

বিশাল ছাউনির নিচে সারি সারি স্টিলের টেবিলে হাতে গ্লাভস এবং এ্যাপ্রোন পরা সহকারীরা মাংস প্রক্রিয়াজাত করছে, তন্দুরে সেঁকা হচ্ছে রুটি, চুলায় আগুনে সেদ্ধ হচ্ছে সুবাসিত চাল, কষানো হচ্ছে ভেড়া কিংবা গরুর মাংস। আবার তৈরি হয়ে যাওয়া পিলাফ অর্ডার স্লিপ মিলিয়ে চৌকস পরিবেশকের দল পৌঁছে দিচ্ছে নির্ধারিত টেবিলে। প্রবেশ পথের ডান হাতে রুটি কারখানা। চারজন কারিগরের দুজন দ্রুত হাতে তন্দুরের ভেতর থেকে নানা আকার আকৃতির সুদৃশ্য গরম রুটি বের করে আনছেন, অন্যজন বড় বড় ট্রেতে সাজিয়ে রাখছেন। একটু এগিয়ে গেলে সারি সারি চুলা জ্বলছে। এই বিশালাকৃতির অগ্নিকূপকে চুলা বললে তাদের মর্যাদার হানি হবে বলে মনে হয়। আমাদের ছোটবেলায় দেখা ইঁদারা বা বাঁধানো কূপের মাথায় সাবান কারখানায় বিশাল কড়াই কূপের মুখের লেভেলে বসিয়ে দিলে যেমন হয়, রান্না হচ্ছে তেমনি করে বসানো ধাতব কড়াইতে। ইঁদারার মতো সেই চুলার বেস্টনী মোজাইক করা, তার একদিকে খোলা মুখ দিয়ে জ্বালানি হিসাবে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে শুকনো চেলা কাঠ। একজন মহান পাচক বিশাল হাতা দিয়ে মাঝে মধ্যে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে পোলাও চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করছেন।

একটা বড় টেবিলে মাংসের স্তূপ থেকে দক্ষ হাতে কেটে প্রয়োজন অনুসারে সাইজ করা হচ্ছে। কড়াইগুলোতে পোলাও ছাড়াও সেদ্ধ হচ্ছে রঙিন গাজর, বিভিন্ন পর্যায়ের চাল ফুটছে এক একটা কড়াইতে, কোথাও তেল ঢালা হচ্ছে আবার কোথাও ছিটানো হচ্ছে লবণ বা কোনো মশলা। নিচে গনগনে আগুন আর কড়াইগুলোর ওপর উড়ছে সাদা ধোঁয়া। দুই একটি ছোট টেবিলে কোয়েলের ডিমের সারি সাজাচ্ছেন দুজন। কোনো কড়াইয়ের খাবার পরিবেশনের জন্যে তৈরি হয়ে গেলে বড় বড় পাত্রে তুলে নেয়া হচ্ছে। সেখান থেকে পরিবেশনের জন্য রাখা দীর্ঘ টেবিল থেকে প্রতি মুহূর্তে সাজানো প্লেট নিয়ে ছুটছে কালো পোশাক পরা বেশ কোজানের কর্মী বাহিনি।

চারিদিকে টুরিস্ট গিজগিজ করছে। প্রায় সকলের হাতের ক্যামেরা অথবা মোবাইল ফোনে ক্ষণে ক্ষণে ছবি উঠছে, চলছে ভিডিও রেকর্ডিং। পিলাফ নির্মাণ শ্রমিকদের কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আমাদেরও প্রায় সকলেই ছবি এবং

বোতিন মাদ্রিদ স্পেন

ভিডিও নিয়ে এতোটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে গাইড মির্জা বেগ শেষ পর্যন্ত সকলকে ডেকে একত্রিত করে হলঘরে নিয়ে চললো। বিশাল দোতলা হলরুমের দোতলায় পুরানো থিয়েটার হলের মতো তিনদিক ঘিরে ব্যালকনিতে সারিসারি টেবিলে চলছে লাগাতার খানাপিনা। আমাদের জন্যে আগে থেকেই টেবিল বুক করা ছিল। লাঞ্চ শুরু হলো ঝুড়িতে রাখা নানা ধরনের বিভিন্ন আকার আকৃতির রুটি এবং সালাদ সহযোগে, সাথে দইয়ের তৈরি রায়তার মতো কিছু একটা এবং জগ ভর্তি ঘরে তৈরি আনারের রস। উজবেকিস্তানে রুটিকে মনে করা হয় মানুষের জন্যে স্বর্গ থেকে পাঠানো ঈশ্বরের উপহার। অতএব রুটি নিয়ে হেলা ফেলা করার কোনো উপায় নেই। রুটির দুই এক টুকরো ছিঁড়ে মুখে দিতে না দিতেই চলে এলো পিলাফের প্লেট।

দুজন পরিবেশনকারীর ট্রে থেকে হাতে হাতে পৌঁছে গেল টেবিলের শেষ প্রান্তে। অর্ডার কনফার্ম করার সময় মির্জা জানতে চেয়েছিল পিলাফের সাথে কোয়েলের ডিম নাকি ঘোড়ার মাংসের কাবাব? আমি অশ্বারোহী হয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে হাত পা ভাঙতে রাজি থাকলেও অশ্বভোজী হতে মোটেও রাজি নই। আমার পাশে বসা মির্জার প্লেটে দেখলাম অনেকটা শামি কাবাবের মতো বৃত্তাকার তবে ফ্যাকাশে রঙের ঘোড়ার কাবাব। ইচ্ছে করলেই খেয়ে ফেলা যায়, তবে অনভ্যাস বশত সেই ইচ্ছেটাই হয়নি। পোলাওয়ের রাজধানী তাসখন্দের শতাধিক রেসিপির

পোলাওয়ের মধ্যে কিসমিস পেস্তা বাদাম এবং দুম্বার মাংসে সমৃদ্ধ আমাদের পিলাফ অনেকটা কাচ্চি বিরিয়ানির মতো হলেও স্বাদে গন্ধে তুলনাহীন।

সবশেষে এলো চা। টিপটে পরিবেশিত অনেকটা গ্রিনটির মতো দেখতে চা পানের কিছু উপকারিতা এবং কিছু আনুষ্ঠানিকতাও আছে। পেয়ালা নামের হাতল ছাড়া কাপে চা ঢেলে নিতে হয় অল্প অল্প করে। যখন গৃহস্বামী কাউকে পেয়ালা ভরা চা ঢেলে দেন তখন বুঝতে হবে এবার আপনার বিদায় নেবার সময় হয়েছে, আর নিজে থেকেই পেয়ালা পুরো করে চা ঢেলে নেয়ার অর্থ আমি এবারে উঠতে চাই। দিন ফুরাবার আগে আমাদের আরো অনেকগুলো জায়গায় যেতে হবে। অতএব চা ঢেলে নিলাম পেয়ালা পূর্ণ করে।

ক্রাকাওয়া: ওয়ারঝিনেক

ক্রাকাওয়ের মেইন মার্কেট এলাকায় সারা বছরই পর্যটকের ভিড় লেগে থাকে। সেই কারণে শতাব্দী প্রাচীন প্রাসাদ এবং ভবনগুলোর অধিকাংশই রেস্তোরাঁ, পানশালা অথবা থিয়েটারে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রস্তরময় চত্বর জুড়ে ছড়িয়ে আছে নানা ধরনের স্যুভেনিয়ার, ফুল-ফল এবং আইসক্রিমের ভ্রাম্যমাণ দোকান। পর্যটকের পাশাপাশি পুরো এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘুরে ঘুরে এবং উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে অসংখ্য পায়রা। মেইন মার্কেট স্কয়ার ঘিরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যের মধ্যে আছে টাউন হল টাওয়ার, অ্যাডাম মিকিউইকস মনুমেন্ট এবং সেইন্ট মেরিস

বেশ কোজনের ভেতরে

ব্যাসিলিকা। এলাকার সর্বোচ্চ ভবন সেইন্ট মেরির প্রাসাদ থেকে প্রতি ঘণ্টায় বেজে ওঠে বিউগলের সুর। এ ছাড়া প্রতিদিন বেলা বারোটায় চারিদিকের সবগুলো গির্জা এবং প্রাসাদ শীর্ষের ঘড়ি থেকে একসাথে শোনা যায় দ্বিপ্রহরের ঘণ্টাধ্বনি। কাজেই মেইন মার্কেট স্কয়ারে বেলা বারোটায় উপস্থিত থাকতে পারাটাও একটা ভাগ্যের ব্যাপার। আমরা চত্বরে পৌঁছে গেলাম পৌনে বারোটায়। একটু পরেই বেজে উঠলো বিউগল এবং প্রাসাদ ও গির্জাসহ ভবন শীর্ষের নানা আকার আকৃতি ঘড়িগুলোতে একযোগে বাজতে শুরু করলো নানা রকম ঘণ্টা। দেশ বিদেশের নানা প্রান্ত থেকে এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখতে আসা পর্যটকদের করতালিতে মুখরিত হলো মেইন মার্কেট স্কোয়ার।

মেইন মার্কেট স্কয়ারের রেস্টুরেন্টগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম ওয়ারঝিনেক রেস্তোরাঁর জন্ম ক্রাকাও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একই বছর, অর্থাৎ ১৩৬৪ খ্রিস্টাব্দে। বিশাল পাথুরে দেয়ালে ঘেরা এবং মাঝে মাঝে পাথরের পিলার দেয়া হলঘরের মেঝেতেও পাথরের স্ল্যাব বসানো। আধো অন্ধকার হলঘর ভরা নানা দেশের নারী পুরুষের হৈ চৈ এবং বিয়ারের ঝাঁঝালো গন্ধ পেরিয়ে আমরা একটা খোলা চত্বরে এসে উপস্থিত হলাম। সেখানে মাথার উপরে ছাদ নেই, তবে চারিদিক পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দেয়ালে লতাগুল্ম ছাড়াও এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গাছপালার মাঝে ডজনখানেক টেবিল পাতা। প্রায় সব টেবিলই ইতিমধ্যে দখল হয়ে গেছে। মাঝামাঝি একটা খালি টেবিল দেখে বসলাম আমরা। গ্রাজিনার স্বামী জিকো এমনিতে খুব চুপচাপ মানুষ। কিন্তু খেতে বসে দেখা গেল খাদ্য নির্বাচন এবং খাবার দাবার সম্পর্কে কথা বলতে তার উৎসাহের কোনো কমতি নেই। আমাকে বললো, 'সুদূর বাংলাদেশ থেকে এসে এখন তুমি যে রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাবার খেতে বসেছো, কোনো সংশয় না রেখেই বলা যায় এই রেস্তোরাঁয় যাঁরা এক সময় নিয়মিত আসতেন তাঁদের মধ্যে আছেন স্বয়ং নিকোলাস কোপার্নিকাস। সে সময় এবং পরবর্তী অনেক বছর ধরে ওয়ারঝিনেকই ছিল এলাকার একমাত্র রেস্তোরাঁ।'

আমি রসিকতা করেই বললাম, 'কে জানে হয়তো বন্ধু বান্ধবসহ এই টেবিলেই বসতেন কোপার্নিকাস। গ্রাজিনার কন্যা কাশিয়া তাড়াতাড়ি টেবিল ক্লথের প্রান্ত উল্টিয়ে দেখে বললো, 'না— এই টেবিল কখনোই ছ'শ বছরের পুরানো হতে পারে না।'

খাবারের সাথে পানীয় হিসাবে বড়দের জন্যে বিয়ার এবং কোল্ড কফি আর কাশিয়ার জন্যে নির্ভেজাল কোকাকোলার অর্ডার দেয়া হলো। মেয়েটা একটু আপত্তি করে মাকে বললো, 'আজ তোমার বিদেশী বন্ধুর সৌজন্যেও কি এক গ্লাস বিয়ার পেতে পারি না?'

‘এই তো আর মোটে কয়েক মাস—’ এরপরে মা মেয়ের মধ্যে কিছু কথা পোলিশ ভাষায় হবার ফলে আমি বোধহয় একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম। বিষয়টা ব্যাখ্যা করলো জিকো। কাতারজিনার বয়স এখন সতেরো, পোল্যান্ডে আঠারো বছরের কম বয়েসীদের মদ্যপান এমন কি বিয়ার খেতেও মানা।

‘কেউ যদি মা বাবাকে না জানিয়ে অথবা নিজের বয়স গোপন করে পানশালায় ঢুকে সুরাপান করতে শুরু করে তাহলে তাকে ঠেকাবে কে?’ আমার জিজ্ঞাসা।

‘তেমনটা যে হয় না তা নয়— বড় রকমের কোনো সমস্যার কথা সাধারণত শোনা যায় না।’ গ্রাজিনার এই উত্তরের সাথে জিকো মেয়ের পক্ষ নিয়ে বলে, ‘আমাদের কাশিয়াকে নিয়ে অবশ্য আমরা খুবই নিশ্চিত!’

আমি বললাম, ‘তোমরা নিঃসন্দেহে অনেক ভাগ্যবান। আমি যতটুকু বুঝেছি, কাশিয়া খুবই লক্ষ্মীমেয়ে!’

‘এতো বেশি বলো না— কয়েকদিন থাকলেই সব বুঝতে পারবে!’ গ্রাজিনা একটা ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করে। কাশিয়া অবশ্য কোনো প্রতিবাদ না করে একটু হেসে খাবারে মনোযোগ দেয়। দুপুর গড়িয়ে যাবার আগেই কোপার্নিকাসের পায়ের ধুলোয় ধন্য রেস্টুরেন্ট ছেড়ে আমরা চললাম বাবেল প্রসাদ দেখতে ভিস্তুলা নদীর তীরে।

কায়রো: এল ফিসাবি

কায়রোর খান এল খলিলি বাজারের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে আড়াই কিংবা তিন শ বছরের পুরনো রেস্তোরাঁ বা ক্যাফে। আমরা একটা জনবহুল চওড়া রাস্তা থেকে খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ পেরিয়ে এবং কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে ক্রমেই আরো সংকীর্ণ অথচ লোকে লোকারণ্য পথে হাঁটতে থাকি। রেস্তোরাঁগুলোর বাইরে চেয়ার টেবিল সাজিয়ে চলছে জমজমাট আড্ডা এবং ডোমিনো খেলা। কোথাও কোথাও গিটার বা দলসিমার বাজিয়ে চলছে একক বা মিলিত কণ্ঠে গান এবং তার সঙ্গে মহা হৈ চৈ! আপাদমস্তক বোরকায় ঢাকা, কিংবা হিজাব পরা নারীরা আড্ডায় পিছিয়ে আছে বলে মনে হয় না। তারা চার পাঁচজন এক সঙ্গে বসে দিব্যি ‘শিশা’ নামে পরিচিত নলওয়ালা হুঁকা টানছে। এতে মসজিদ ভারাক্রান্ত খান এল খলিলি কিংবা ঈজিপশিয়ান ইসলামের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে বলেও মনে হয় না। সরু গলি পথে হাঁটতে হাঁটতে যেখানে এক জায়গায় টেবিল ঘিরে পাঁচ সাতজনের একটা দল বেহালা বাজিয়ে গান গাইছেন সেটিই বিখ্যাত এল ফিসাবি। নাগিব মাহফুজের ক্যাফে!

বোতিনের শেফ

এল ফিসাবি যাত্রা শুরু করেছিল এখন থেকে সোয়া দুই শ বছর আগে ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে। আসবাবপত্র বা পরিবেশন রীতি কিছুটা বদলে গেলেও পুরানো হলদে রঙের দেয়াল, ছোট ছোট টেবিল এবং উঁচু সিলিং থেকে ঝোলানো বাতি দেখে মনে হয় প্রাচীন এই রেস্তোরাঁর আসলে তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। দুই শতাব্দীর বেশি সময় ধরে মিসরের কবি সাহিত্যিক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ এবং বুদ্ধিজীবীদের নিয়মিত সমাবেশের এই জায়গাটি সাধারণ মানুষের কাছে কেবলই একটি চা কফির দোকান হলেও প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এই অপরিসর রেস্তোরাঁ একটি অন্তরঙ্গ মিলনক্ষেত্র। সন্ধ্যার এ সময়টা বাইরে ভেতরে প্রায় পুরো ক্যাফেতেই কোনো আসন খালি নেই। তারপরেও আমরা কেমন করে যেনো কাছাকাছি দুটো টেবিলে পাঁচজনই বসার জায়গা পেয়ে গেলাম। ইংরেজিতে কিছু আরবি মিশিয়ে এখানকার বিখ্যাত চায়ের অর্ডার দেবার পরে আমি প্রথমেই নোবেল বিজয়ী মিসরীয় লেখক নাগিব মাহফুজের স্মৃতি জড়িত সংরক্ষিত কক্ষটি দেখতে যাই।

শুনেছি নাগিব তাঁর কায়রো ট্রিলজির অনেকটাই এল ফিসাবির এই কক্ষে বসেই লিখেছিলেন। অপরিসর ঘরটির একদিকে দেয়ালে বিশাল ফ্রেমে বাঁধানো আয়না, বিপরীত দিকে কাঠের কারুকাজ করা দেয়াল এবং তাকে সাদা কালো বা রঙিন ছবি। এসব ছবিতে নাগিব মাহফুজের সঙ্গে বিভিন্ন জনের যুগল বা দলগত উপস্থিতি। মাথার উপরে ঝুলছে পুরনো আমলের নকশা কাটা কাচের মাঝারি ধরনের ঝাড় বাতি। প্রবেশ পথের বিপরীত দিকের দেয়ালের দুদিকে দুটি ছোট

আলমারি ছাড়াও কতগুলো বাধানো ছবির নিচে ঝুলছে আরবি ও ইংরেজিতে লেখা 'এল ফিসাবি'। এখানেও নাগিব মাহফুজের একক কোনো আলোকচিত্র নেই। একটা তাকের উপরে কতগুলো জায়নামাজ স্তূপ করে রাখা। বিশ্বখ্যাত নোবেল বিজয়ী লেখকের স্মৃতিধন্য পুরো ঘরটা অগোছালো এবং খুব একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও বলা যাবে না। 'এল ফিসাবি'র প্রতিষ্ঠাতার সপ্তম প্রজন্ম আকরাম আল ফিসাবি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমরা নতুন করে সাজাতে চাই না, কারণ আমরা রেস্তোরাঁ না, একটা ঐতিহ্য সংরক্ষণ করছি।'

বাইরের আড্ডা থেকে বেহালার সঙ্গে জোরালো কণ্ঠ সঙ্গীতের আওয়াজ ভেসে আসে। আড্ডাটা ঘিরে রয়েছে নকশা কাটা কাঠের বেষ্টনী। ছবি তোলার ব্যাপারে আমার একটু দ্বিধা ছিল, কেউ যদি আপত্তি করে! কিন্তু ইশারায় ক্যামেরা দেখাবার পরে দুজন উঠে দাঁড়িয়ে মাথার উপরে দুই হাত তুলে গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন শুরু করলেন। ছবি তুলে ফিরে এসে দেখলাম গাঢ় নীল টি-শার্ট পরা বয়সী পরিবেশক ইতিমধ্যেই টেবিলে চা নামিয়ে দিয়ে গেছে। পুদিনা পাতা দেওয়া মিন্ট-টি এবং চায়ের মধ্যে সেদ্ধ ছোলা দেয়া বিশেষ ধরনের ভেষজ চা। ছোট ছোট স্বচ্ছ কাপে পরিবেশিত চা থেকে চামচ দিয়ে ছোলা তুলে খাবার ব্যবস্থা আছে।

ছোলা-চা খেতে খেতেই একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম–এখানে রেস্তোরাঁ বা কফিশপের ভেতরে ফেরিওয়ালা অথবা কোনো সাহায্য প্রার্থী অবাধে ঢুকে পড়তে পারে। চা শেষ করে আরও কিছুক্ষণ বসে আমরা যখন বেরোতে যাব, সেই সময় আমাদের জানালার বাইরে গিটার হাতে কয়েকজন জন তরুণ শুরু করলেন সমবেত কণ্ঠে জমাট আরবি গান। গানের শেষটা না শুনে শতবর্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা, রাজনৈতিক বিতর্ক ও লেখক কবিদের অন্তরঙ্গ কথপোকথনের কেন্দ্র এবং নিঃসঙ্গ লেখকের চেয়ার টেবিল পেছনে ফেলে আমরা সরু গলিপথ ধরে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

বেইজিং: কুয়ান জুদে

বিখ্যাত পিকিং ডাকের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ এলো আমাদের চীন সফরের অষ্টম দিনে । বেইজিং-এর "কুয়ান জুদে" নামটি আসলে পিকিং ডাকের সঙ্গে প্রায় সমার্থক হয়ে গেছে। রেস্টুরেন্টটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৬৪ সালে অর্থাৎ ১৬০ বছরেরও বেশি পুরনো ইতিহাস নিয়ে এখনো সমান দক্ষতায়, স্বাদে-গন্ধে এবং শৈল্পিক কুশলতায় এরা পিকিং-এর হাঁস পরিবেশন করে চলেছে। প্রতিদিন এখানে হাজার হাজার পর্যটক ও স্থানীয় মানুষের উদরে চালান হয়ে যাচ্ছে শত শত হাঁস, রোস্টেড ডাক! বিদেশি অতিথিদের মধ্যে যাঁরা বেইজিং-এ আসেন তাঁদের অন্তত একদিনের নৈশ্যভোজ "কুয়ান জুদে"তে নির্ধারিত থাকে।

পিকিংডাক কুয়ানজুদে

শুধু সাধারণ পর্যটক নন, গত দেড়শ বছরে যারা পিকিং-এর হাঁস চেখে দেখেছেন, সেই অসংখ্য বিশিষ্টজনের মধ্যে অল্প কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেই এই রেস্তোরাঁর খ্যাতি, গুরুত্ব ও আভিজাত্য বুঝতে অসুবিধা হবে না। কিউবার ফিদেল কাস্ত্রো, যুক্তরাজ্যের প্রিন্সেস এলিজাবেথ এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন, হেনরি কিসিঞ্জারসহ আরও বহু রাষ্ট্রনায়ক ও বিখ্যাত ব্যক্তির ছবি ঝুলছে কুয়ান জুদের দেয়ালে। এর ফলে যখন বলা হয়, "কুয়ান জুদের পিকিং ডাক আন্তর্জাতিক কূটনীতিরও একটি অংশ হয়ে উঠেছে।" তখন মনে হয় কথাটি অতিরঞ্জিত হলেও একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো নয়।

আমরা একটা বড়সড় বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে পড়লাম। আমাদের গাইড কাম ইন্টারপ্রেটার লিলি কেতাদুরস্ত পোশাক পরা শেফকে হাত ঘুরিয়ে চোখ মুখের বিশেষ অভিব্যাক্তিসহ তাদের বোধগম্য ভাষায় কী নির্দেশনা দিয়ে এলো আল্লা মালুম। সে নিজে এসে টেবিলে বসে পড়লে শেফ মহোদয় বিপুল উৎসাহে তাঁর শিল্পকর্ম সৃজন শুরু করলেন। আমাদের অভিজ্ঞতার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল দক্ষ শেফের হাতে আমাদের সামনেই পুরো হাঁস কেটে পরিবেশন করা। তার হাতের ছুরি কাঁচি চামচ কাঁটা সবকিছুই যেনো একটি বাদ্যযন্ত্রে সুর তোলার মতো ছন্দে নেচে যাচ্ছিল। আমাদের সহযাত্রীদের অনেকেই পরিবেশনের এই শৈল্পিক দৃশ্য ধারণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আস্ত একাধিক হাঁস ফুলের মতো নিখুঁত করে সাজানো হলে এক তরুণী ওয়েট্রেসের হাতে সুদৃশ্য প্লেটে

চলে এলো টেবিলে। আমাদের মধ্যে দু তিনজনের অবশ্য হাঁসের মাংসে এলার্জি কিংবা অরুচির ব্যাপার ছিল। তাদের জন্যে বিকল্প খাবার এবং কঠিন কোমল সব ধরনের পানীয় মিলিয়ে কুয়ান জুদে চীনা খাদ্যসংস্কৃতির সন্ধ্যাটি শুধু উপভোগ্য নয়, স্মরণীয় সন্ধ্যা বললে ভুল হবে না।

পিকিং ডাক-এর রোস্টিং পদ্ধতিটি গোপন হলেও এখন অনেকেই জানেন, খোলা কাঠের চুল্লিতে ফলগাছের কাঠ ব্যবহার করে হাঁস রোস্ট করা হয়। তবে রেসিপি জানা থাকলেও পাতলা ও কুড়মুড়ে খোসা, রসালো মাংস আর বিশেষ সসে ডুবিয়ে পেঁয়াজ কুচি ও পাতলা প্যানকেকের সঙ্গে পরিবেশিত কুয়ান জুদের পিকিং ডাককে এখন পর্যন্ত কেউই ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। বেইজিং ভ্রমণকারীদের মধ্যে যারা আসল পিকিং ডাকের স্বাদ পেতে চান তাদের জন্য কুয়ান জুদের নাম রয়েছে মাস্ট ভিজিট তালিকায়।

বাংলাদেশের ভোজনবিলাসী মানুষের মধ্যে যারা শীতের দিনে তিনশ ফিটের রেস্টুরেন্টগুলোতে গরম ঝাল ঝাল হাঁসের মাংস খেতে পছন্দ করেন, তাঁদের কাছে এই বিখ্যাত পিকিং ডাক অনেকটাই স্বাদহীন মনে হতে পারে। হোটেলে ফেরার পথে আমাদের দলের কেউ কেউ বলেই ফেলেছেন, "এরচেয়ে আমার খালার কিংবা মামীর হাতের কষানো হাঁসের মাংস অনেক মজার।" আমার মন্তব্য ছিল: আমরা তো আসলে হাঁস খেতে যাইনি, দেখতে গেছি একটি খাবারের ঐতিহ্য আর খেতে গেছি বিশ্বজুড়ে পরিচিত একটি নাম: পিকিং ডাক!

আঙ্কেল হো'র দেশে

বিশ্বজিৎ বড়ুয়া

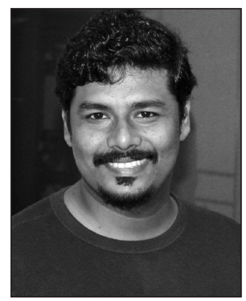

২০২৩ এর নভেম্বরে 'দু চোখ যেদিকে যায়, চলে যাব' এই পণ করে কোন রকম পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই চলে গিয়েছিলাম ভিয়েতনামে ঘুরতে। সেই গল্পের শুরুটা বলেছিলাম ভ্রমণগদ্যের মে-২০২৪ সংখ্যায়। দ্বিতীয় কিস্তিও চলে এলো, তৃতীয় কিস্তিও আসবে হয়তো পরবর্তী কোন এক সংখ্যায়।

সবুজ দেশটির লাল ইতিহাস

ঘন সবুজ পাহাড়ের সাথে গাঢ় নীল সমুদ্র আর বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির মেলবন্ধনের এক আশ্চর্য দেশ ভিয়েতনাম। কিন্তু এই দেশটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পেছনে লুকিয়ে আছে অনেক ক্ষত। যার একটি হলো ফরাসিদের উপনিবেশবাদী শাসনকাল। এখনকার ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া ও চীনের কুওয়াং-চৌ প্রদেশের বেশ খানিকটা নিয়ে ছিল ফরাসিদের

উপনিবেশ যার নাম ফরাসিরা দিয়েছিল 'ইন্দোচিন', যেটা টিকে ছিল ১৮৮৭ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত। ১৮৫৮ সালে ফরাসি নৌবাহিনী ভিয়েতনামের দানাং বন্দরে প্রথমবারের মতো নোঙর ফেলে। চা, কফি, এবং রাবার চাষের জন্য এই অঞ্চলের উর্বর ভূমিতে তাদের নজর পড়ে। তাই, ১৮৬২ সালে ফরাসিরা দক্ষিণ ভিয়েতনামের কিছু অংশ দখল করে শুরু করে তাদের উপনিবেশ শাসন।

১৯২০/৩০ এর দশকে ভিয়েতনাম এবং আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। হো চি মিনের মতো নেতারা তাদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান এই এলাকা ফরাসিদের কাছ থেকে দখল করে নেয়। ১৯৪৫ সালে জাপান যুদ্ধে হেরে আত্মসমর্পণ করার পর 'হো চি মিন' ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তবে, ফরাসিরা আবার ফিরে এসে তাদের পুরানো কতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়। যার কারণে ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত চলে 'ফরাসি ইন্দোচিন' যুদ্ধ। ১৯৫৪ সালে ফরাসিরা এই যুদ্ধে হেরে যায় এবং স্বাধীনতা অর্জন করে ভিয়েতনাম।

ফরাসি শাসন শেষ হয়ে গেলেও এর ছাপ ভিয়েতনামের আনাচে কানাচে রয়ে গেছে। ভিয়েতনামে ঘোরার সময় চোখে পড়েছে ঔপনিবেশিক আমলের অনেক পুরানো দালান আর অবকাঠামো, যা এখনও সময়ের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে পড়েছে অনেক দোকান, হোটেলের আর রেস্টুরেন্ট এর ফরাসি নাম। সাইগনে আমরা যে হোটেলে উঠেছি তার নামই তো 'হোটেল ইন্দোচিন বেনথাইন'।

ফরাসি শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার পরপরই নতুন সংকটের সূচনা হয় ভিয়েতনামে। দেশটি মূলত উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। উত্তর ভিয়েতনামের রাজধানী ছিল 'হ্যানয়' যেখানে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থিত কমিউনিস্ট সরকারের নেতৃত্বে ছিলেন 'হো চি মিন'। আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী ছিল 'সাইগন' যেখানে ছিল আমেরিকা সমর্থিত কমিউনিস্ট-বিরোধী সরকার যার নেতৃত্বে ছিলেন 'নাগো দিনাজ দিম'। কমিউনিজম এবং গণতন্ত্রের সংঘাতের ফলে উত্তেজনা বাড়তে থাকে এবং সেই উত্তেজনা ১৯৫৫ সালে পরিণত হয় পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে। পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম দীর্ঘ এবং বিভীষিকাময় এই যুদ্ধ 'ভিয়েতনাম যুদ্ধ' যা 'দ্বিতীয় ইন্দোচিন যুদ্ধ' নামেও পরিচিত। ১৯৬৫ সালে মার্কিন বাহিনী সরাসরি এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, এবং দেশটির ইতিহাসের দীর্ঘতম ও বিতর্কিত যুদ্ধটি শুরু হয়। যুদ্ধ মূলত চলে আমেরিকান প্রযুক্তি, আধুনিক সমরশক্তির সাথে উত্তর ভিয়েতনামের গেরিলা যোদ্ধাদের। হো চি মিনের নেতৃত্বে 'ভিয়েত কং' গেরিলারা দক্ষিণে একের পর এক দুধর্ষ আক্রমণ চালাতে থাকে। গহীন জঙ্গল, অসংখ্য সুরঙ্গপথ, এবং পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় আমেরিকানদের জন্য এই যুদ্ধ চালানো ছিল খুব কঠিন। যুদ্ধের নৈতিকতা ও যুক্তিসঙ্গতা নিয়ে একসময় খোদ মার্কিন জনগণের মধ্যে প্রশ্ন উঠতে থাকে এবং পৃথিবীজুড়ে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন তীব্রতর হয়। ১৯৭৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ায় এবং 'প্যারিস শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অবশ্য ক্ষণস্থায়ী ছিল। ১৯৭৫ সালে উত্তর ভিয়েতনামিজরা সাইগনের পতন ঘটায় এবং দেশটি আবার একীভূত হয়। সাইগনের নাম পাল্টে 'হো চি মিন সিটি' রাখা হয়। প্রায় দুই দশকের যুদ্ধ শেষে ভিয়েতনাম আবার স্বাধীনতা ও ঐক্য অর্জন করে।

লক্ষ লক্ষ ভিয়েতনামি ও আমেরিকান যোদ্ধা এবং সাধারণ মানুষ এই যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন, এবং কয়েক প্রজন্ম এখনো যুদ্ধের মানসিক ও শারীরিক ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার ব্যবহার করা 'অ্যাজেন্ট অরেঞ্জ' নামক রাসায়নিক অস্ত্রের কারণে বহু ভিয়েতনামিজ আজও শারীরিক বিকলাঙ্গতা ও নানা রোগে আক্রান্ত। ভিয়েতনামের নদী, বনভূমি, এবং কৃষিজমি বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল, যার প্রভাব এখনো রয়ে গেছে। কুও চি আসার পথে প্রথম যাত্রাবিরতিতে আমরা যেই প্রতিবন্ধী শিল্পীদের হস্তশিল্পের দোকানে গিয়েছিলাম তাদের সবার বিকলাঙ্গতার কারণ কিন্তু এই 'অ্যাজেন্ট অরেঞ্জ'।

কুও চি, মাটির নিচে এক অদ্ভুত এক জগৎ

'কুও চি টানেল' হলো ভিয়েতনামের গেরিলা যুদ্ধের প্রতীক ও ভিয়েতনামের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র। হো চি মিন সিটির কিছুটা উত্তরে এই কুও চি টানেলে প্রতিদিন হাজার হাজার টুরিস্ট আসেন ভিয়েতনাম যুদ্ধের এই যুদ্ধক্ষেত্রটি দেখতে। এখনো এখানে অনেক কিছুই যুদ্ধের সময়ের মত করে রাখা আছে। যুদ্ধের সময় এখানে মাটির নিচে তৈরি করা হয়েছিল অনেক বড় একটা টানেল বা সুড়ঙ্গ নেটওয়ার্ক, যা প্রায় ২৫০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। 'ভিয়েত কং' গেরিলারা যোদ্ধারা এগুলো ব্যবহার করে মাটির নিচে গোপন ঘাঁটি তৈরি করতো, খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র মজুদ করতো এবং আমেরিকান সৈন্যদের উপর অতর্কিতে গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে আবার টানেলে লুকিয়ে পড়তো। এই টানেলগুলোর ভেতরে ছিল অস্ত্রাগার, চিকিৎসাকেন্দ্র, রান্নাঘর, এমনকি স্কুলও! বলা যায়, মাটির নিচেই ছিল পুরো একটি শহর। এই টানেলের নেটওয়ার্ক এর কিছু টানেল গিয়ে মিশেছিল সাইগং নদীতে, যেখান দিয়ে টানেলে ঢোকা বা বের হওয়া যেত। টানেলের ঢোকার পথগুলো এতটাই সরু ছিল যে সেগুলো মার্কিন বাহিনীর পক্ষে খুঁজে পাওয়া ছিল খুব কঠিন। চোরা দরজা, পায়ের আওয়াজ

হোয়েআন শহরের লণ্ঠনের দোকানে...

পাওয়া যায় না এমন মাটি দিয়ে তৈরি ছিল এই টানেলগুলো। এই টানেলগুলোতে শুধু গেরিলা যোদ্ধারাই খুব সহজেই যাতায়াত করতে পারতো হামাগুড়ি দিয়ে।

আপনি একটু কল্পনা করুনতো, শুধু হামাগুড়ি দেয়া যায় এমন একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যাচ্ছেন, অথবা যাওয়ার সময় সুড়ঙ্গের গোলকধাঁদায় হারিয়ে গেছেন।

যুদ্ধের সময় তৌরি করা অনেকগুলো টানেল এখনো টুরিস্টদের জন্য চালু আছে এখানে, এবং সেগুলো সংস্কার করে ভেতরে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যাবস্থা করা হয়েছে এবং সুড়ঙ্গগুলো কিছুটা বড় করা হয়েছে যাতে মাথা নিচু করে কুঁজো হয়ে অন্তত হাঁটা যায়। আমি এবং তন্ময়দা দুটো সুড়ঙ্গে ঢুকেছিলাম ব্যাপারটা ফিল করার জন্য। প্রথম সুড়ঙ্গের এন্ট্রি পয়েন্ট দিয়ে ঢুকে মিনিট দশেক পর আরেক পয়েন্ট দিয়ে বের হয়েছি। সাথে আমাদের গাইড মাইলো ছিল। মাইলোর কড়া ইন্সট্রাকশান ছিল গাইড ছাড়া এখানে না ঢুকতে তাহলে ভেতরে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গাইড ছাড়া সুড়ঙ্গে ঢুকে হারিয়ে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনাও নাকি আছে বেশ কয়েকটা। প্রথম সুড়ঙ্গ থেকে আমরা নির্বিঘ্নে বের হয়ে এলেও দ্বিতীয়টাতে একটা বিপত্তি ঘটে। কুও চি'র একজন গাইডের পেছন পেছন আমরা দশজন টুরিস্ট এক সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়লাম। গাইড শুরুতেই সতর্ক করলেন এই সুড়ঙ্গটা অনেক লম্বা, সবাই যেন একসাথেই থাকি। আমি আর তন্ময়দা ছিলাম সবার পেছনে, আমাদের সামনে পড়েছে

অন্য একটা টুরিস্ট গ্রুপ থেকে আসা এক ভারতীয় সেলফি যুগল। এই অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যেও ক্রমাগত সেলফি তুলে চলছেই। আমাদের গাইড অন্যদের নিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। আমি তাড়া দিলাম যুগলকে যে সামনের ওদেরকে হারিয়ে ফেললে বিপদে পড়বো। যুগল তেমন পাত্তা দিল না আমার কথা। সেলফি চলতেই থাকলো। পাশ কাটিয়ে যে যাব সেই স্পেস ও নেই। তারপর যা হওয়ার তাই হলো। বেশ খানিকটা এগিয়ে দেখি সামনে ক্রস রোড। সুড়ঙ্গ এখানে ভাগ হয়ে তিনটা তিন দিকে চলে গেছে, সামনের গাইড বা অন্য টুরিস্ট দের কোন সাড়াসব্দ নেই। ডানে যাব? নাকি বামে যাব? নাকি সোজা যাব? সামনের যুগল একটু প্যানিকড হয়ে গেল। আমি আর তন্ময় দা তাদের আশ্বস্ত করলাম প্যানিকড হওয়ার কিছুই নেই। আমরা এখান থেকে বের হওয়ার পথ না পেলে যেদিক দিয়ে এসেছি সেইদিকেই ব্যাক করবো। আমার স্পষ্ট মনে আছে টানেলে ঢোকার সময় খেয়াল করেছিলাম ডান পাশটা খাদের মত অনেক নিচু ছিল, তার মানে ডানের সুড়ঙ্গ বেশিদুর যাবেনা। আমি আর তন্ময়দা ঠিক করলাম ডানে যাব এবং দশ মিনিটের মত গিয়েও যদি কোন কূল কিনারা না পাই তাহলে ফেরত আসবো। যুগল আমাদের কথায় ভরসা পেলনা, তারা ঠিক করলো যেদিক দিয়ে এসেছে সেদিক দিয়েই ফিরে যাবে। আমি আর তন্ময়দা ডানের সুড়ঙ্গ ধরে কিছুদূর এগিয়ে দেখি এখানেও সুড়ঙ্গ ভাগ হয়ে দুই দিকে চলে গেছে। একটা বাম পাশে আর আরেকটা অল্প ডান দিকে। ডান দিকেরটাতে মনে হচ্ছে কম অন্ধকার, যতই আগাচ্ছি অন্ধকার কমে আসছে। একটু পরেই সূর্যের আলোর দেখা পেলাম। বেরিয়ে দেখি কেউ নেই এখানে এবং পাহাড়ের ঢাল ধরে উপরে উঠার একটা সিঁড়ি। উপরে লোকজনের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর মাইলো আর আমাদের কুও চি'র গাইডের দেখা পেলাম। ওরা সুড়ঙ্গের অন্য আরএকটা প্রান্ত দিকে বের হয়েছিল। আমাদেরকে পেছনে না পেয়ে গাইড আবার সুড়ঙ্গে ঢুকেছিল। ভেতরে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি/ডাকাডাকি করেও না পেয়ে মাইলো কে জানাতে এসেছে যে আমরা মিসিং।

এর পর মাইলো আমাদেরকে নিয়ে গেল ফায়ারিং স্কোয়াডে। এখানে ২৫ ডলার গচ্চা দিয়ে টুরিস্টরা সত্যিকারের রাইফেল দিয়ে ফায়ারিং এর অভিজ্ঞতা নিতে পারবেন। আমাদের গ্রুপে কেউ আগ্রহ দেখালো না এই ব্যাপারে। চারপাশটা খুব সুন্দর। অনেক উঁচু বড় বড় গাছ, জঙ্গল। আপনি ভাবতেই পারবেন না যে এই মনকাড়া সবুজ ল্যান্ডস্কেপের নিচে লুকিয়ে আছে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ইতিহাস।

একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলাম ভয়ংকর ফাঁদ গুলো এবং সেগুলো কিভাবে কাজ করতো সেই ডেমো। এইরকম হাজার হাজার ফাঁদ গেরিলারা পুরো এলাকা জুড়ে পেতে রাখতো মার্কিন সৈন্যদের জন্য। বন্য পশুদের জন্য শিকারিরা যেমন ফাঁদ

পেতে রাখতো, অনেকটা সেরকম। মার্কিন সেনারা এই পাতা ফাঁদগুলোতে পড়ে মারাত্মক ভাবে আহত বা নিহত হতো। ভিয়েতনামিজ গেরিলাদের আসলে লক্ষ্য ছিল মার্কিন সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়া। দীর্ঘ সময় ধরে এই অসম লড়াইয়ে মার্কিন বাহিনী হতাশ হয়ে পড়ে, এবং শেষ পর্যন্ত তারা বুঝতে পারে যে এই যুদ্ধে তাদের বিজয় অসম্ভব।

একপাশে কয়েকজন গেরিলা যোদ্ধার মূর্তি এমন ভাবে সেট করা দূর থেকে মনে হচ্ছিল একদম জীবন্ত, যেন সত্যিকারের ক্লান্ত গেরিলা যোদ্ধারা বিশ্রাম নিচ্ছেন। ঘুরতে ঘুরতে আমরা চলে গেলাম একটা কিচেনে, এখানে গেরিলা যোদ্ধাদের জন্য রান্নাবান্না হতো। মাইলো এখানে আমাদেরকে টি ব্রেক দিল। ভিয়েতনামিজ টি আর সাথে 'কাসাভা' সেদ্ধ (এক ধরনের আলু) আর বিট লবণ, মরিচ, বাদামের টুকরা আর বিভিন্ন হার্ব মেশানো একটা মিক্সার কাসাভার সাথে খাওয়ার জন্য। যুদ্ধের সময় ভিয়েতনামি গেরিলারা নাকি এসবই খেত। চা বিরতি শেষে আমরা গেলাম একটা প্রেজেন্টেশান হলে। যেখানে ভিয়েতনাম যুদ্ধের আদ্যোপান্ত, রণ কৌশলের উপর ২০ মিনিটের একটা প্রেজেন্টেশান দেয়া হয়। বের হওয়ার গেটে আছে এই যুদ্ধের একটা মিউজিয়াম ও সুভেনিয়র শপ। সেটা ঘুরে আমরা রওনা হলাম মেকং ডেল্টার উদ্দেশে।

বাগান-বাড়িতে লাঞ্চ ও ভিয়েতনামি হুক্কা

কুও চি থেকে মেকং ডেলটা যাওয়ার পথে এক বাগান-বাড়িতে আমরা বিরতি নিলাম। মাইলো আমাদের সবার দুপুরের খাওয়ার আয়োজন করেছে এখানে। এই বাগানবাড়িটি তাদের একজন ডিরেক্টরের। সুন্দর গোছানো বাগান। বিভিন্ন ফলের গাছ ভর্তি ফল, সবজি বাগান, ফুল গাছে ভরপুর চারিদিক। মাঝখানে একটা বড় পুকুর ভর্তি মাছ। সেই পুকুরের উপরেই মাচাং এর মত একটা ডাইনিং স্পেস। সবাই ফ্রেশ হয়ে সেখানে জড় হয়েছে লাঞ্চ টেবিলে। সব ট্রেডিশানাল ভিয়েতনামিজ খাবার সাথে সবার জন্য বিশাল সাইজের এক একটা ডাব। সকাল বেলা গাড়িতে উঠেই মাইলো জিজ্ঞেস করেছিল সবাইকে ভেজ/ননভেজ, কে কোনটা। ব্রিটিশ কাপল জানালেন তারা 'ভেগান' আর ইন্ডিয়ান কাপল বলেছিলেন তারা 'ভেজ'। তাদের জন্য আলাদা ডিশ এসেছে।

লাঞ্চ সেরে মাইলো আমাকে আর তন্ময়দাকে জিজ্ঞেস করলো আমরা স্মোক করি কিনা? তন্ময়দা রিটায়ার্ড স্মোকার, আর আমি সোশাল স্মোকার, সোশাল কারণে কখনো কখনো খাই না খেলেও কিছু যায় আসে না। সে আমাদের দুজনকে আরেকপাশে একটা বসার জায়গায় নিয়ে গেল ট্রেডিশানাল ভিয়েতনামের হুক্কা ট্রাই করার জন্য। স্থানীয় ভাষায় এর নাম 'দিয়েউ কাই'। 'দিয়েউ' শব্দটির মানে

ধূমপানের যন্ত্র, আর 'কাই' অর্থ কৃষি কাজ। জনপ্রিয় এই হুক্কাটি মূলত কৃষকরা চাষাবাদের সময় জিরিয়ে নেয়ার সময়টায় উপভোগ করতেন। বাঁশ দিয়ে তৈরি এই হুক্কাটির সাথে আমাদের দেশের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের পাহাড়ি হুক্কার সাথে অনেক মিল। 'থুক লাউ' নামের একটা তামাক এই হুক্কায় ব্যবহার করা হয়। আমি তো একজন সর্বভুক প্রজাতির প্রাণী। তার উপর নতুন কিছুর অভিজ্ঞতা নেয়ার সুযোগ আমি সহজে হাতছাড়া করি না। মাইলো সাবধান করলো এই হুক্কা টানলে আমার মাথা ঘোরাবে বেশ কিছুক্ষণ। চার পাফ নিলাম অনেক কষ্টে। বেশ জমাট ধোঁয়া আর অসম্ভব কড়া তামাকের গন্ধ। মাইলোর কথাই ঠিক, মিনিট দুই পর আমার মাথা ঘোরা শুরু হল। আমি একটা সোফায় বসলাম আরাম করে। মাইলো বলল সর্বোচ্চ ১০ মিনিট এই মাথা ঘোরা টা থাকবে, তার পর সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আমরা এর পর রওনা দিলাম মেকং ডেলটার দিকে।

মেকং ডেলটা

মেকং নদী এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ নদী, যা তিব্বতের মালভূমি থেকে চীন, মায়ানমার, লাওস, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, এবং ভিয়েতনাম হয়ে দক্ষিণ চীন সাগরে এসে মিশেছে। এই নদীর কারণে যে বিশাল ব-দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে, তাই মেকং ডেলটা নামে পরিচিত। এর পশ্চিমে কম্বোডিয়ার সীমান্ত এবং পূর্বে দক্ষিণ

ভিয়েতনামের স্ট্রিট ফুডের দোকান...

চীন সাগর। এখানকার জমি অত্যন্ত উর্বর। মেকং ডেলটা ভিয়েতনামের 'রাইস বোল' নামে পরিচিত, কারণ এটাই ভিয়েতনামের প্রধান ধান উৎপাদনকারী এলাকা। মেকং নদীর পারে আমাদের জন্য বেশ বড় একটা ইঞ্জিন বোট অপেক্ষা করছে। এটায় করে আমরা মেকং নদীতে কিছুক্ষণ ঘুরবো, তারপর নদীর ওপারে 'মাই-থো'র একটা গ্রামে যাব। মাই-থোকে বলা হয় মেকং ডেলটার প্রবেশদ্বার। এখানে গ্রামের লোকজন মৌমাছির চাষ করে, তাদের নারকেল বাগানও আছে, আর আছে কোকোনাট ক্যান্ডি আর ওয়াইন ফ্যাক্টরি।

মাইলো বলল, এখানে নদীর পারে অনেক বড় একটা ফ্লোটিং মার্কেট বসে প্রতিদিন সকালে। ভোরের আলো ফুটতেই নদীর বুকে ভেসে উঠে শত শত ছোট নৌকা, যেখানে বিক্রি হয় তাজা ফল, শাকসবজি, মাছ, এবং স্থানীয় খাবার। নৌকাগুলোতে বিক্রেতারা তাদের পণ্য সাজিয়ে নেয়, আর ক্রেতারাও ছোট ছোট নৌকা নিয়ে এই বাজারে আসে। নৌকাগুলোর মাঝে কোলাহল, দরদাম, এবং হাসি-ঠাট্টায় ভরপুর এক বর্ণিল পরিবেশ তৈরি হয়।

আমরা বোট থেকে নেমে প্রথমে গেলাম মৌমাছিদের কাছে। এখানকার 'হানি লেমন টি' খুব বিখ্যাত। লেমনের সাইজ দেখলাম বড় আমলকির মত, পাতলা চামড়া আর ভেতরটায় কমলার মত ছোট ছোট কোয়া। ঘ্রাণটা অসাধারণ। মৌমাছির চাক থেকে মধু নিয়ে গাছ থেকে লেবু পেড়ে আমাদেরকে 'হানি লেমন টি' পরিবেশন করা হলো। অসাধারণ টেস্ট। এরা এখানে মধুর তৈরি অরগানিক অনেক প্রডাক্ট বিক্রি করছে। অনেকেই কেনাকাটা করলেন। সেখান থেকে গ্রামের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা পৌঁছে গেলাম নারকেলের রাজ্যে।

একটা ফ্যাক্টরিতে ঢুকলাম। নারকেল নিয়েই বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে চারিদিকে। নারকেল থেকে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অরগানিক চকলেট। রাইস পেপারে মুড়িয়ে আরেক পাশে সেগুলো প্যাকিং এর জন্য রেডি করা হচ্ছে। বিক্রি করার জন্য ডিসপ্লে করা আছে আর তার নিচে একটা বোলে সব রকমের চকলেট রাখা আছে। খেয়ে টেস্ট করে পছন্দ মত নিতে পারবেন। পাশেই কোকোনাট ওয়াইনের বোতল রাখা সারি করে। এই ওয়াইনও বিনামূল্যে টেস্ট করা যায়। আপনি চাইলেই বিক্রেতা এক পেয়ালা ওয়াইন এগিয়ে দেবে চেখে দেখার জন্য। স্থানীয় ভাষায় "রউরচ নামে পরিচিত এই ওয়াইন এখানে খুব জনপ্রিয়। আমি দুই টাইপের দুইটা বোতল থেকে টেস্ট করলাম। হ্যাঁ, দুইটাইতেই কোকোনাট ফ্লেভার, মজার, কিন্তু দুই বোতলের মাঝে স্বাদের কোন পার্থক্য বুঝতে পারলাম না। একটা টিপস বক্স দেখলাম মাঝখানে রেখেছে, আপনি বিনামূল্যে সব কিছু টেস্ট করলেও কিছু ডং টিপস দিলে এরা খুশি হয়।

তার আরেক পাশেই বিক্রি হচ্ছে ভিয়েতনামের বিখ্যাত স্নেক ওয়াইন। এটাও টেস্ট করা যাবে কিন্তু একটা কঠিন শর্ত আছে। গলায় বিশাল একটা অজগর সাপ ঝোলাতে হবে আগে। এই ওয়াইন নাকি বীরত্ব ও সাহসের প্রতীক। আপনাকে প্রমাণ করতে হবে আপনি সাহসী। তারপর ওয়াইন টেস্টিং। মাইলো বলল যারা যারা স্নেক ওয়াইন টেস্ট করতে চায় সামনে এগিয়ে আসতে। এই সুযোগ ছাড়ার কোন মানে হয় না। দুঃসাহসে ভর করে এগিয়ে গেলাম আর তন্ময় দা পিছিয়ে গেল। সাহসের অভাবে না, অনেকের মত উনারও সাপ নিয়ে ফোবিয়া/এলার্জি আছে। পাইথন বাবাজিকে ঘাড়ে তুলে নিলাম। অনেক ভারী, ওজন কমপক্ষে ৩০/৩৫ কেজি হবে। এক হাতে পাইথনটাকে ধরে আছি, আমার আরেক হাতে তুলে দেয়া হল স্নেক ওয়াইন। এক শটে খেতে হবে। খুবই স্ট্রং, হালকা মিষ্টি আর বিভিন্ন মসলার একটা ফ্লেভার আছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে কড়া কোন কবিরাজি ঔষধ খেলাম।

নারকেল ও পাইথনের সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে মাইলো আমাদেরকে একটা বাড়ির উঠোনে নিয়ে এল। এখানে আমাদেরকে স্থানীয় শিল্পীরা গান-বাজনা শোনাবেন। অনেকক্ষণ হেঁটে খুব টায়ার্ড লাগছে। চেয়ারে আরাম করে বসলাম। শিল্পীরা প্রস্তুতি নিচ্ছেন আর আমাদের সামনে পরিবেশন করা হলো নানা রকম ফল। যার মধ্যে আমি চিনতে পারলাম শুধু পেয়ারা, আনারস, ড্রাগন আর পেঁপে। সাথে দিয়েছে সেই বাদাম, মরিচ, বিট লবণ আর মসলার মিক্সার। গান বাজনা ভালই লাগলো, কথা কিছু না বুঝলেও গানের সুরটা কানে বেজেছিল অনেকক্ষণ।

এবার মাইলোকে ফলো করে গ্রামের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে এসেছি একটা ক্যানেল/খালের পাড়ে। এখানে অনেকগুলো ছোট ছোট নৌকা। প্রতিটাতে তিনজন করে বসে পড়লাম। মাইলো আমাদের নৌকায় উঠেছে। তার অবশ্য একটা উদ্দেশ্য আছে, সে আবার হুক্কা টানবে। হুক্কায় দু টান দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি মাফও চাইলাম দোয়াও চাইলাম। একটু আগে দুই শট কোকোনাট ওয়াইন আর এক শটস্নেক ওয়াইন খেয়ে এসেছি। এখন এই মাঝ নদীতে এই দুষ্ট হুক্কায় টান দেয়াটা বেশি রিস্কি হয়ে যাবে আমার জন্য। ভাই, তোমার হুক্কা তুমিই খাও। ওমা, সে দেখি নৌকার মাঝিকে দিয়ে দিল। মাঝি তো মহা খুশি। নৌকা চালানো বাদ দিয়ে হুক্কায় মশগুল হয়ে গেল। অবশ্য তাতে কোন অসুবিধা নেই, বৈঠা এখন মাইলোর হাতে। খালের দুই পাশে অনেক বড় বড় গোল পাতার গাছ। তার ভেতর দিয়েই আমাদের নৌকা এগিয়ে যাচ্ছে মেকং নদীর দিকে। সূর্যের তেজ কমে এসেছে, জানান দিচ্ছে আজকের দিন শেষ হয়ে এলো বলে। নদীর পারে এসে আবার আমাদের অপেক্ষায় থাকা সেই ইঞ্জিন বোটে উঠলাম। এবার ফেরার পালা। মেকং নদীতে সূর্যাস্ত। ঘটনাবহুল একটা

দিনের সমাপ্তি। হোটেলে ফিরে একটু ফ্রেশ হয়ে ঠিক করলাম আজকেও যাব বেন নে স্ট্রিট ফুড কোর্টে ডিনার করতে। যদিও তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হবে হোটেলে। কারণ, হো চি মিন থেকে আমাদের দানাং এর ফ্লাইট ভোর ৬ টায়।

ফ্লাইট টু দানাং

হো চি মিন সিটি থেকে আমরা দানাং যাওয়ার জন্য বেছে নিয়েছি ভিয়েতনাম এয়ার'কে। সড়ক পথে দূরত্ব প্রায় এক হাজার কিলোমিটার, যেতে লাগবে পুরো একটা দিন। তার চাইতে দেড় ঘণ্টায় পৌঁছাতে পারলে আমরা সারাদিন হোয়েআন শহরে ঘুরার সময় পাব। তাই ১৬০ ডলার দিয়ে দুজনের প্লেনের টিকিট কেটেছি। রাত সাড়ে ৩টার দিকে বের হয়ে গেলাম হোটেল থেকে। একটা গ্রাব নিয়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছাতে সময় লাগলো ৩০ মিনিট আর চেক-ইন করতে ১০ মিনিট। সিকিউরিটি চেক শেষ করে ডমিস্টিক টার্মিনালের একমাত্র লাউঞ্জ 'লো সাইগনিজ'এ ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম।

ব্রেকফাস্ট এর এলাহি আয়োজন। দুজন পেট ভরে খেয়ে অপেক্ষা করছি বোর্ডিং এনাউন্সমেন্ট এর। তন্ময়দার সাথে এর আগেও একবার ব্যাংককে গিয়েছিলাম। ট্রিপমেট হিসেবে উনি অসাধারণ। বিশেষ করে থাকা খাওয়া নিয়ে আমার মত উনারো যেকোন জায়গায় মানিয়ে নিতে কোন অসুবিধা হয়না।

ভিয়েতনাম এয়ারের এই এয়ারক্রাফটও এয়ারবাস এ৩২০। ফ্লাইট এর রিভিউ যদি দিতে হয় আমি ১০ এ ৯ দিতে পারি। ১ বাদ দিলাম কারণ আমাদেরকে ফ্লাইটে খাওয়ার জন্য কিছু দেয়নি। যদিও পেটে খিদে না থাকায় এটা কোন প্রভাব ফেলেনি এই যাত্রায়। এই ফ্লাইটে সবচাইতে মজা পেয়েছি এদের সেফটি এনাউন্সমেন্ট এ। সিট বেল্ট কিভাবে বাঁধবেন, কেন বাঁধবেন, ইমারজেন্সি সিচুয়েশানে কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে সেটা অসম্ভব শৈল্পিক ভাবে একটা ভিডিওর মাধ্যমে দেখিয়েছিল। প্লেনের জানালা দিয়ে আরেকটা এয়ারক্রাফট দেখা যাচ্ছে ওটাও এয়ারবাস এ৩২০। নাম 'ব্যাম্বু এয়ারলাইন্স'। এত নাম থাকতে এয়ারলাইন্সের নাম 'বাঁশ' দিল কেন ঠিক বুঝলাম না।

হোয়েআন

সকাল পৌনে ৮টার দিকে আমরা ল্যান্ড করলাম দানাং ইন্টারন্যাশানাল এয়ারপোর্টে। আমাদের গন্তব্য হোয়েআন (Ho i An)। দানাং থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত এই ঐতিহাসিক শহরটি। ১৫শ থেকে ১৯শ শতাব্দীর মধ্যে হোয়েআন ভিয়তনামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল, যেখানে প্রচুর চিনা, জাপানি, ভারতীয় এবং ইউরোপীয় বণিকরা বাণিজ্য করতে আসতেন নিয়মিত। শহরটির প্রাচীন কাঠামোগুলো এখনো সেই সময়ের

ট্রাং-আনের কেভ ভ্রমণে আমরা...

সাক্ষী হয়ে আছে। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো হোয়েআন শহরকে বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান হিসেবে ঘোষণা করে। হোয়েআন শহরে রয়েছে চীনা মন্দির, পুরানো ফরাসি ঔপনিবেশিক স্থাপনা, এবং জাপানি স্থাপনা। এই শহরের নাইট মার্কেট খুব বিখ্যাত। প্রতি সন্ধ্যায় শহরের রাস্তাগুলো আলোকিত হয়ে ওঠে বর্ণিল লণ্ঠনের আলোতে। নাইট মার্কেটটি স্থানীয় খাবার, স্যুভেনির এবং হস্তশিল্পের পণ্যের জন্য জনপ্রিয়।

হোয়েআন'এর বুক চিরে চলে গেছে 'থু বন' নদী। এই নদীকে ঘিরেই প্রতি পূর্ণিমার রাতে আয়োজন করা হয় 'হোয়েআন ল্যান্টার্ন ফেস্টিভ্যাল' যা এই শহরের অন্যতম আকর্ষণ। উৎসবের দিন সন্ধ্যার পর-পরই পুরো শহরের সব রাস্তাঘাট, দোকানপাটের বৈদ্যুতিক বাতি নিভিয়ে দিয়ে শুধুমাত্র রঙিন কাগজের ও কাপড়ের লণ্ঠন জ্বালানো হয়। বিভিন্ন রং ও শেপের লণ্ঠন, যেমন ড্রাগন, ফুল, প্রজাপতি বা অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী ভিয়েতনামি নকশার লণ্ঠনে ঢেকে যায় পুরো শহর। পূর্ণিমার আলোর সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করে এক জাদুকরী পরিবেশ। প্রিয়জনদের মঙ্গল কামনা ও সবার শান্তি কামনা করে থু বন নদীতে শত শত ছোট কাগজের লণ্ঠন ভাসিয়ে দেয়া হয়।

আগেই বলেছি, আমাদের ভিয়েতনাম ট্যুর টা একদমই আনপ্ল্যান্ড ছিল। আগে থেকে প্ল্যান করলে আমরা হোয়েআন'এ পূর্নিমার রাত মিস করতাম না কিছুতেই। হোয়েআন'এ আমরা উঠেছি 'ব্লু রিভার হোম স্টে ভিলা' তে। এই ভিলার হর্তা-কর্তা 'লিন' আমাদেরকে রিসিভ করার জন্য এয়ারপোর্টে গাড়ি পাঠিয়েছে।

এয়ারপোর্ট থেকে এখানে আসতে সময় লেগেছে ৪০ মিনিটের মত। এই শহরে এসে দেখলাম এখানে বেশিরভাগ লোকই মোটামুটি ইংরেজি বলে। হো চি মিন শহরে যেটা খুবই রেয়ার ছিল। লিনের সাথে আমাদের আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল। আমাদের দুই ছোটবোন সেতু ও সানন্দা কিছুদিন আগেই ভিয়েতনাম ঘুরে গিয়েছে। তাদের সুত্রেই লিনের সাথে পরিচয়। চেক ইন করে আমাদের রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিচে নামলাম।

আর্থ গড'এর পূজা

থু বন নদীর কোল ঘেঁষা সুন্দর ছিমছাম আমাদের এই ভিলা। সামনে একটা সুইমিং পুল ও এক পাশে বসার জায়গা। নিচ তলায় রিসেপশান ও ডাইনিং প্লাস কিচেন। লিন নিজেই আমাদের জন্য এখন স্যান্ডউইচ আর কফি বানাচ্ছে। তার এক পাশে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে একটা বড় কাঠের বেদিতে বসানো আছে দুটো স্ট্যাচু/মূর্তি। এই দুটো স্ট্যাচু/মূর্তি আমার চোখে পড়েছে এখানকার অনেক বাসা ও দোকানের সামনে পূজার উপকরণ সহ সাজানো অবস্থায়। এখানেও সামনে ধূপ কাঠি আর মোম বাতি জ্বালানো। তার সাথে অনেক ফুল, ফল দিয়ে পূজা দেয়া হয়েছে, একটা কোক এর ক্যান আর পানির বোতলও দেখতে পাচ্ছি। এ কি?! কোকের পাশের ক্যান টা তো বিয়ারের! আরে, ধূপকাঠির সাথে দুটো সিগারেটের নিভে যাওয়া বাট না?!

লিন আমাদের তিনজনের জন্যই ব্রেকফাস্ট নিয়ে এলো। কফি খেতে খেতে আড্ডার এক ফাঁকে ওকে জিজ্ঞেস করলাম এই দুটো কার স্ট্যাচু/মূর্তি? তোমরা কি সিগারেট আর বিয়ার দিয়ে তোমাদের গড এর পূজা কর?

উত্তরে লিন ছোটখাট একটা লেকচার ঝেড়ে দিল। যার সারমর্ম হচ্ছে...

বৌদ্ধধর্ম, কনফুসিয়াজম, এবং তাওবাদের মিলিত প্রভাবের কারণে ভিয়েতনামের ধর্মীয় চর্চাগুলি খুবই বৈচিত্র্যময় এবং ভিন্ন ধাঁচের।

মূলত তাওবাদী বিশ্বাস থেকে আসা এই দুজন আসলে কোন ধর্মীয় দেবতা নন। বাম পাশের জন হলেন 'থো থি কং' (আর্থ গড) তিনি মাটির দেবতা, যিনি ঘরবাড়ি এবং ভূমির সুরক্ষা করেন। তাঁর আশীর্বাদে ফসল ভালো হয় এবং পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। তাই তাঁর মূর্তি সাধারণত বাড়ির প্রবেশদ্বারে বা জমির সীমান্তে রাখা হয়। আর, ডান পাশের 'থান তাই' (গড অব ওয়েলথ) অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দেবতা। ভিয়েতনামিজরা বিশ্বাস করে যে, থান তাই-এর আশীর্বাদে ব্যবসা ভালো হয় এবং আর্থিক উন্নতি ঘটে। তাই বেশিরভাগ ঘর বা ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের সামনের দিকে এই মূর্তি দুটো রাখা হয়। ভিয়েতনামিজদের বিশ্বাস এই দুজনের মধ্যে 'আর্থ গড' সিগারেট ও মদ খুব পছন্দ করেন। তাই

তারা সবসময় অন্যান্য পূজার সামগ্রীর সাথে আর্থ গডের উদ্দেশ্যে সিগারেট, মদ, বিয়ার এইসবও পূজা দেয়।

লিনের লেকচার শেষ হতেই আমি লিন আর তন্ময়দা'কে বললাম আমাকে ১০ মিনিট সময় দাও, তোমরা দুজন গল্প কর, আমি একটু বাইরে যাব আর আসবো। বের হওয়ার সময় শুনলাম তন্ময়দা লিনকে বলছে 'আমি জানি ও কোথায় যাচ্ছে'। এই নাহলে 'বোতল ভাই'? দোকান থেকে সিগারেট, একটা বিয়ার আর একটা অরেঞ্জ জুসের ক্যান নিয়ে ফিরলাম। অরেঞ্জ জুস হচ্ছে গড অব ওয়েলথের জন্য যেহেতু বিয়ার আর সিগারেট উনার পছন্দ না। এই পূজা দিতে না পারলে এই ট্যুরের অপূর্ণতা থেকে যাবে। আজ থেকে 'আর্থ গড' আমারো প্রিয় দেবতা।

বাস্কেট বোট বা কোকোনাট বোট

পূজা পার্বন শেষ করে আমি আর তন্ময়দা বের হলাম হোয়েআন ঘুরে দেখতে। লিন সব ঠিক করে দিয়েছে। প্রথমে যাচ্ছি কোকোনাট বোটে করে ঘুরতে। ভিয়েতনামের একটি বিশেষ ধরনের নৌকা এ্ই বাস্কেট বোট বা কোকোনাট বোট স্থানীয়ভাবে 'থুঙ চাই' নামে পরিচিত। দেখতে গোলাকার এবং ঝুড়ির মতো। এই নৌকাগুলো বাঁশ দিয়ে তৈরি হয় এবং পানিতে ভেসে থাকার জন্য ভেতর ও বাইরের দিকে আলকাতরা দিয়ে বাঁশের ফাঁকফোকর সিল করে দেওয়া হয়। এই নৌকাগুলোর নামকরণ "কোকোনাট বোট" ও বলে কারণ এগুলো দেখতে অনেকটা নারকেলের খোলের মতো। ছোট নদী, শাখা নদীতে এইগুলো ব্যবহার করা হয়, যেখানে বড় নৌকাগুলো ঢুকতে পারে না। বাস্কেট বোটে করে স্থানীয়রা মাছ ধরে। ইদানিং এই বোটগুলো পর্যটকদের কাছে খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

নৌকার ঘাটে আমাদেরকে মাঝি রিসিভ করলো। আরো অনেক গুলো কোকোনাট বোট ঘাটে ভেড়ানো। খুব কালারফুল। মাঝিসহ আমরা তিনজন। আর লোক আঁটবে না এই বোটে। অনেক রোদ, আমাদের দুজনকে মাঝি দুটো ভিয়েতনামিজ হ্যাট দিল রোদ থেকে বাঁচার জন্য। অনেক বড় জলাধার। একে আসলে বলা যায় জলের মধ্যে জঙ্গল। গোল পাতার জঙ্গল। এর মাঝ দিয়েই সরু সরু রাস্তা। আমাদের মতো আরো অনেক টুরিস্ট বোট ঢুকে পড়েছে এই জলের জঙ্গলে। কিছু কিছু যায়গায় অনেক গুলো বোটে জটলা পাকিয়ে গান বাজনা হচ্ছে। বেশ খানিকটা সামনে এগিয়ে দেখলাম একটা খোলা জায়গায় তিনটা বোটকে ঘিরে অনেক গুলো টুরিস্ট বোট গোল হয়ে জটলা পাকাচ্ছে। আমাদের মাঝি ভালই ইংরেজি বলে। সে বলল আমরা পারফেক্ট টাইমে এসেছি। এখন এখানে বোট শো শুরু হবে। একটু পড়ে এই গোল গোল ছোট তিনটা বোট নিয়ে তিন মাঝি যা যা করে দেখালো তা অবিশ্বাস্য। ২০ মিনিটেরর মত এই শো শেষ করে আমরা

হ্যানয়ের রাস্তায় চোখে পড়ে সাইকেলে ভ্রাম্যমান ফুলের পসরা...

গেলাম কাঁকড়া ধরতে। আমাদের মাঝি আমাদের দুজনকে দুটো ছিপ ধরিয়ে দিয়ে বলল ট্রাই কর কাঁকড়া ধরার। সে ও আরেকটা ছিপ নিয়ে বসে গেল। গোলপাতার গোড়ায় স্বচ্ছ পানিতে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি বড় বড় কাঁকড়া আসা যাওয়া করছে কিন্তু টোপ কেউ গিলছে না। আমার তো এখন মনে হচ্ছে এই কাঁকড়া গুলো ট্রেনিং প্রাপ্ত, টুরিস্টদের ফাঁদে পা দেবে না। বেশ খানিক্ষন অপেক্ষা করে রণে ভঙ্গ দিলাম আমরা। ঘাটে ফিরে দেখি আমাদের জন্য লিনের পাঠানো গাড়ি অপেক্ষা করছে কুকিং ক্লাসে নিয়ে যেতে।

কুকিং ক্লাস

হোয়েআন শহরটা অনেক বৈচিত্র্যময়। আমরা এখন এসেছি একটা ভিয়েতনামিজ রেস্টুরেন্ট প্লাস রান্নার স্কুলে। এখানে টুরিস্টরা চাইলে কিছু ভিয়েতনামি খাবার তৈরির ক্লাস করতে পারবেন। চাকালাভা, মাই কুয়াং, এবং বানহ-সে-ও এখানকার বিখ্যাত খাওয়ার। রান্নাবান্নায় আমার আর তন্ময়দার অনেক আগ্রহ। তন্ময়দা খুব ভাল রান্না করে। হাই প্রোফাইলের ক্লাসিক শেফ। আমরা সুযোগ পেলেই বিভিন্ন অজুহাতে তার বাসায় হামলা করি শুধু তার রান্না খাওয়ার জন্য। আমারো অবশ্য রাঁধুনি হিসেবে বেশ খানিকটা দুর্নাম আছে পরিচিত মহলে। আমার রান্নার সবচাইতে বড় ভক্ত অবশ্য আমার মেয়ে। পাহাড়ে বড় হয়েছি, শিখেছিও সব উল্টাপাল্টা রান্না!। শামুকের ভুনা, শুঁটকি দিয়ে কচি বাঁশ, আদার ফুলের ভর্তা, লং বীফ ভুনা এইসব। তবে আমার সিগনেচার ডিশ হচ্ছে প্রেশার কুকারে কোন ধরনের মসলা ছাড়াই রান্না করা ইলিশ।

এখানে আশেপাশে অনেকগুলো টেবিলে ক্লাস হচ্ছে। অনেক দেশের পর্যটকরা খুব আগ্রহ নিয়ে রান্না শিখছে। এক এক টেবিলে এক এক আইটেমের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। ঘুরে ঘুরে দেখলাম, কিন্তু আজকে এই রান্নাবান্নার দিকে যেতে ইচ্ছে হচ্ছেনা। আমাদের ভাগে খাওাদাওয়া যা ছিল খেয়ে বের হয়ে গেলাম।

হোয়েআন শহরের পথে পথে

ওল্ড টাউনের থু বন নদীর ব্রিজের কাছে এসে আমরা গাড়ি ছেড়ে দিলাম। এখান থেকে আশপাশটা হেঁটে দেখবো। ব্রিজ পার হয়ে একটু এগিয়েই পেলাম একটা বাজার। এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের কাঁচা-বাজার। তার পর থেকেই শুরু রেস্টুরেন্ট আর বিভিন্ন ধরনের সুভেনিয়রের দোকান। অনেক গুলো লণ্ঠনের দোকান দেখলাম। ব্রিক্রি হচ্ছে আবার আপনি চাইলে ভেতরে বসে লণ্ঠন বানানো ও শিখতে পারবেন। মোটামুটি সব দোকানেই ক্রেতার চাইতে দর্শনার্থী আর শিক্ষার্থীদের ভীড় বেশি। আর দেখলাম অনেক ফুট মাসাজের পার্লার। হেঁটে হেঁটে অনেক দূর গিয়ে তারপর নদীর পাড়ে এসে দাঁড়ালাম। নদীর পাড় ধরে হাঁটার রাস্তা করা। সেই রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে আবার ব্রিজের দিকে ফিরলাম। ব্রিজের উপর থেকে অসাধারণ ভিউ পাচ্ছি দুই দিকেই। একটা মার্কেটের সামনে এসে বসার জায়গা পেলাম। আস্ত একটা কাঠের গুড়ি কেটে বানানো সোফা টাইপের চেয়ার। এখানে বসে একটু জিরিয়ে নিলাম। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এখানকার সব রাস্তাঘাটই ছেয়ে আছে বিভিন্ন রকমের লণ্ঠনে। সন্ধ্যার পরপরই সব আস্তে আস্তে জ্বলে উঠল। পুরো শহরটার চেহারা বদলে গেল মুহূর্তেই। চারপাশে যাই দেখছি অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। রাস্তার ধারে আবার হাঁটা শুরু করলাম। কোথায় ডিনার করবো সেই রেস্টুরেন্ট খুঁজে বেড়াচ্ছি। কোন রেস্টুরেন্ট পছন্দ হলেই গুগলে সেই রেস্টুরেন্ট এর রিভিউ দেখে বোঝার চেষ্টা করছি ভাল না খারাপ। কম-লিন (Com Linh) নামের একটা ভিয়েতনামিজ রেস্টুরেন্ট এ চোখ আটকে গেল। গুগলে দেখি রেটিং ৫ এ ৫। তাও দুই হাজারের উপর রিভিউ। বারান্দা ও ভেতরে বসার জায়গা আছে। আর চিন্তা ভাবনা না করে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। জানালার পাশে একটা টেবিলে গিয়ে বসলাম। ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস আর মেনু দিয়ে

গেল। আমাদের টেবিল থেকেই কিচেন দেখা যাচ্ছে, কিচেনের সামনেই বেশ কয়েকটা মেরিনেড করা আস্ত হাঁস, অনেক ধরনের কাবাবের শিক আর বড় বড় লবস্টার ঝুলছে। অনেক যাচাই বাছাই করে চারটা আইটেম অর্ডার করলাম হাঁস ও পর্কের। খাওয়া শেষে আমরা দুজনেই একমত এই রেস্টুরেন্টই হচ্ছে ভিয়েতনামে আমাদের ট্রাই করা বেস্ট রেস্টুরেন্ট। হ্যানয়ে যদি এর চাইতেও ভাল কিছু না পাই, তাহলে আজকের ডিনারই আমাদের বেস্ট ডিনার হয়ে থাকবে। ডিনার শেষে হেঁটে হেঁটে আমাদের ভিলায় ফিরলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল সারা রাত হাঁটি, এমন রাস্তা কি আর পাব?

তাড়াতাড়ি ঘুমাতে গেলাম। সকালে ব্রেকফাস্ট সেরেই আমাদেরকে বের হতে হবে দানাং এর বানা হিলসের উদ্দেশে। সারাদিন বানা হিলসে ঘুরে আমাদের সন্ধ্যা ৭ টার ফ্লাইট ধরতে হবে হ্যানয়ে যাওয়ার জন্য। লিন কালকের জন্য আমাদের বানা হিলসের টিকিট সহ সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আমাদেরকে একটা গাড়ি এখান থেকে বানা হিলসে নিয়ে যাবে তারপর ওখান থেকে দানাং এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে।

মেঘের আড়ালে ফরাসি ঔপনিবেশিকতার রূপকথার

বানা হিলস (Bà Nà Hills) ভিয়েতনামের বিখ্যাত একটি পর্যটন কেন্দ্র হলেও এর শিকড় রয়েছে ফরাসি ঔপনিবেশিক যুগের ইতিহাসে। দানাং শহরের ২৫ কিলোমিটার পশ্চিমের এই পাহাড়ি অঞ্চল একসময়ে ফরাসিদের অবকাশযাপন এবং হাওয়া বদলের অন্যতম জায়গা ছিল। হোয়েআন শহর থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে বানা হিলস, আমাদের পৌঁছাতে লাগবে প্রায় দেড় ঘণ্টা। সকাল ৭ টার দিকে ব্রেকফাস্ট সেরে লিনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা রওনা দিলাম। দানাং পার হওয়ার পর থেকে শুরু হলো পাহাড় পর্বত।

১৯১৯ সালে ফরাসিরা প্রথমবারের মতো বানা হিলসের সৌন্দর্য আবিষ্কার করে এবং বুঝতে পারে যে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় দেড় হাজার মিটার উঁচু এই পাহাড়ি এলাকার হিম-শীতল আবহাওয়া, মনোরম পরিবেশ তাদের জন্য অসাধারণ একটা অবকাশ কেন্দ্র হতে পারে। বিশেষ করে ফরাসি অফিসাররাই দানাংয়ের গরম থেকে বাঁচার জন্য বানা হিলসকে হিল স্টেশন হিসেবে গড়ে তোলে। তারা সেই সময় তাদের জন্য এখানে বিভিন্ন বিশ্রামাগার, হোটেল এবং বিনোদনমূলক অবকাঠামো তৈরি করে। একসময় শুধু ফরাসি অভিজাতরা এখানে এসে অবকাশযাপন করতে পারতো এবং এটি হয়ে ওঠে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম বিলাসবহুল হিল স্টেশন। ১৯৩০-এর দশকের মধ্যে ফরাসিরা এখানে প্রায় ২০০টিরও বেশি ভিলা, হোটেল এবং রিসোর্ট গড়ে তুলেছিল। বানা হিলস

কচ্ছপের পিঠে সারস... সাহিত্য মন্দিরে... লোকজন এসে সারসের বুকে মাথা ঘঁষে সৌভাগ্যের আশায়...

পরিণত হয় ভিয়েতনামের বুকে ইউরোপীয় আভিজাত্যের ছোঁয়া পাওয়া এক ছোট্ট এক শহরে।

ফরাসি ঔপনিবেশিকতার পতনের পর বানা হিলসের ফরাসি প্রভাব ও গুরুত্ব পুরোপুরি হারিয়ে যায়। এখানকার অনেক ভবন যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞে ভেঙে পড়ে এবং বহু বছর ধরে বানা হিলস পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। ২১ শতকের শুরুর দিকে ভিয়েতনামের সরকার এবং বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা বানা হিলসকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে পুনরায় গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। ফরাসি ঔপনিবেশিক ধাঁচের স্থাপত্যের সঙ্গে আধুনিক রিসোর্ট ও বিনোদনমূলক সুবিধার সমন্বয় ঘটিয়ে নতুন ভাবে বানা হিলস গড়ে তোলা হয়। ২০০৯ সালে নির্মাণ করা হয় বিশ্বের দীর্ঘতম এবং উচ্চতম কেবল কার লাইন, যা বানা হিলসের আধুনিক পর্যটনের ভিত্তি রচনা করে। ফরাসি স্থাপত্য গুলোর পুনর্নির্মাণ এবং আরো নতুন নতুন আকর্ষণ যেমন গোল্ডেন ব্রিজ, ভিনপার্ল ফ্যান্টাসি পার্ক এইসব যোগ করার ফলে বানা হিলসের পুনর্জন্ম হয় এক রূপকথার রাজ্য হিসেবে।

সকাল সাড়ে ৮টায় পৌছালাম বানা হিলসের গেটে। এন্ট্রি গেটে টিকিট চেক করে ঢুকে গেলাম কেবল কারের লাইনে। এই কেবল কার প্রায় ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ, উপরে পৌঁছাতে লাগবে ২০ মিনিট। এটাই পৃথিবীর সবচাইতে দীর্ঘ কেবল

কার। এখানে এই সকাল বেলায় ও অনেক লম্বা লাইন। কেবল কারের এক কেবিনে সর্বোচ্চ ১০ জন বসা যায়। তবে সবাই নিজেদের গ্রুপ করে উঠে বলে এটা কম ও হয়, যেমন আমাদের কেবিনে আমাদের সাথে ৫ জনের একটা গ্রুপ উঠেছে, আমরা সহ মোট ৭ জন। কেবল কার চলতে শুরু করলো। উপরে উঠতে শুরু করলাম। একটা জলধারার কল-কল আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। নিচে তাকিয়ে দেখি বড় একটা পাহাড়ি পাথুরে ঝিরি বয়ে চলছে প্রচণ্ড গতিতে আর পানির আওয়াজ ক্রমশ জোড়ালো হচ্ছে। একটু পরেই দেখলাম অপূর্ব সেই দৃশ্য, উঁচু পাহাড় থেকে অনেক বড় একটা ঝরনা বেয়ে পড়ছে নিচের পাথরে। যতই উপরে উঠছি তাপমাত্রা কমছে। নিচে বেশ গরম ছিল, ৩১ ডিগ্রী, আমি গরমের হাত থেকে বাঁচতে একটা নি-জিপার ট্রাউজার হাফ করে পরেছি সাথে একদম পাতলা একটা স্পোর্টস টি-শার্ট। হাতের স্মার্ট ওয়াচে হাইট মাপছিলাম কটুকু উপরে উঠছি। ১১০০ মিটার পার হওয়ার পর আস্তে আস্তে চারপাশের আলো কমে এলো সূর্য মিলিয়ে গেছে, আমরা ঢুকে গেছি পাহাড়ে আটকে থাকা ঘন মেঘের ভেতর। মেঘের ঘনত্ব এত বেশি যে কেবল কারে আমাদের সামনের কেবিনটাকে আর দেখা যাচ্ছেনা, এমনকি পেছনের টাও না। শুধু দেখছি কেবল কারের কেবল টা মিলিয়ে গেছে মেঘের মাঝে। উপরের দিকে উঠছি তো উঠছিই। অদ্ভুত এক অনুভূতি, কোথায় যাচ্ছি দেখা যাচ্ছেনা এমনকি আশেপাশের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছে না তো আবার!? প্রায় ৫ মিনিট পর সামনের কেবিন টাকে আবছা দেখা শুরু করলাম মেঘ একটু পাতলা হয়ে এলো। পৌঁছে গেলাম বানা হিলসের চূড়ায়। কেবল কারের কেবিন থেকে বের হয়েই মন হলো আমাকে কেউ ডিপ ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাপমাত্রা এখানে এখন ৬ ডিগ্রি আর আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১,৪৮৭ মিটার উঁচুতে। ঠান্ডায় হাত পা জমে আসছে। আমার ব্যাকপ্যাকে আমি সবসময় একটা উইন্ড ব্রেকার কাম রেইন কোট রাখি, সেটা বের করতে গিয়ে দেখি একটা টিশার্ট ও আছে সাথে। হাফ ট্রাউজারে বাকি টুকু জিপ করে ফুল ট্রাউজার করে নিলাম। সেই সাথে ডাবল টিশার্টের উপর উইন্ড ব্রেকার পড়েও ঠান্ডা ফিল করছি। মেঘে ঢাকা চার পাশ।

বানা হিলসের মূল আকর্ষণ হলো ফরাসি উপনিবেশিক আমলের স্থাপত্যকলার ফ্রেঞ্চ ভিলেজ। ফ্রান্সের মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত এই গ্রামটিতে পুরনো দালানকোঠা, গির্জা, রেস্তোরাঁ, এবং বেশ কয়েকটা ফুল বাগান আছে যেটা ইউরোপের আবহ এনে দেয়। এখানে ঘুরতে ঘুরতে মনে হচ্ছে আমরা ফ্রান্সের কোনো প্রাচীন শহরে এসে পৌঁছেছি। ছোটবেলায় রূপকথার গল্প শুনে যেমনটা কল্পনা করতাম অনেকটা সেরকম। আশেপাশে অনেক বাগান আর একটু পর পর স্ট্যাচু আছে যেগুলো আমরা রূপকথার গল্পেই শুধু দেখতে পাই বা কল্পনা করি।

অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে আমাদের প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। রূপকথার এই রাজ্যের ভেতরই চোখে পড়লো স্টারবাকস এর একটা আউটলেট। একটু উষ্ণতার আশায় দুজনে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। প্রচন্ড ভীড়, বসার তো দূরের কথা দাঁড়ানোরই যায়গা নেই ভেতরে। অগত্যা, দুজন কফি আর স্যান্ডউইচ নিয়ে বাইরে এসে একটা টেবিলে বসেই খেলাম। বেলা বাড়ার সাথে সাথে সূর্য্যের তেজ বেড়েছে অনেক, সেই সাথে কুয়াশাও কেটে গেছে। যদিও মেঘের আনাগোনা আছে আশেপাশে, কিন্তু আকাশ একদম পরিষ্কার। অনেক দূর থেকে বিশাল সাদা রঙের একটা বুদ্ধ মূর্তি ও দেখা যাচ্ছে। এখানে আছে 'ভিনপার্ল ফ্যান্টাসি পার্ক'। বাচ্চাদের জন্য নানা ধরনের মজার রাইড, গেমস, থ্রিলিং অ্যাডভেঞ্চার, এবং আধুনিক প্রযুক্তির ইন্টারেক্টিভ শো আছে এই পার্কে।

শুধু বানা হিলসের না, ভিয়েতনামের বর্তমান ট্যুরিজমের প্রতীক বলা হয় এখানকার গোল্ডেন ব্রিজকে। বিশালাকার দুটি পাথরের হাতের মুঠোয় ঝুলন্ত এই সোনালি সেতুটি পর্যটকদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। প্রায় দেড় হাজার মিটার উঁচু এই ব্রিজ থেকে দানাং শহর ও এর আশপাশের বিস্তৃত এলাকা দেখা যাচ্ছে। অপূর্ব সেই দৃশ্য। গোল্ডেন ব্রিজ থেকে ঘুরে ফেরার কেবল কারে ফিরতে ফিরতে দুপুর তিনটা বেজে গেল। আকাশ পরিষ্কার থাকায় ফেরার সময় কেবল কার থেকে দেখলাম অন্য এক রূপ। চারিদিকে গহীন জঙ্গল অনেক উঁচু উঁচু গাছ আর তার মাঝে অপূর্ব সেই পাহাড়ি ঝর্না। কেবল কার থেকে বেরিয়েই মনে হলো এবার আমাকে কেউ ফ্রিজ থেকে ওভেনে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি চেঞ্জ করে হাফ ট্রাউজার আর পাতলা টিশার্টে ফেরৎ আসলাম। বানা হিলস থেকে আমাদের গন্তব্য দানাং এয়ারপোর্ট।

ফ্লাইট টু হ্যানয়

৪৫ মিনিটেই পৌঁছে গেলাম এয়ারপোর্টে। দানাং এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের হ্যানয় যাওয়ার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার ফ্লাইট ও ভিয়েতনাম এয়ার এর। দানাং এয়ারপোর্টের ডমিস্টিক টার্মিলালে কোন লাউঞ্জ খুঁজে পেলাম না। প্রচণ্ড খিদে নিয়ে এয়ারপোর্টের এক রেস্টুরেন্টে হামলা করলাম দুজনে। সব এয়ারপোর্টের মত এখানেও খাওয়ারের গলাকাটা দাম। দুজনে দুটো ভিয়েতনামিজ বীফ আর পর্ক নুডলস সুপ অর্ডার করলাম আর সাথে দুটো লার্জ বিয়ার। তাতেই খরচ হয়ে গেল ২৫ ডলার।

রাত ৮ টায় আমরা ল্যান্ড করলাম হ্যানয়ের নৈ-বাই আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে। হ্যানয়ে আমরা হোটেল নিয়েছি বিখ্যাত ওয়েস্ট লেক এর সাথে লাগোয়া '22Housing Moon Westlake Residence' হোটেলে। এয়ারপোর্ট থেকে

একটা গ্র্যাব নিয়ে বিখ্যাত 'রেড রিভার' পার হয়ে আমাদের হোটেলে পৌঁছাতে সময় লাগলো ৪০ মিনিট।

লাল নদীর শহর হ্যানয়

হ্যানয়, ভিয়েতনামের প্রাণকেন্দ্র এবং রাজধানী। ১০১০ সালে যখন লি থাই তো রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট লি কং উয়ান এই শহরকে তার রাজধানী হিসেবে প্রথম ঘোষণা করেন, তখন এর নাম ছিল 'থাং লং' নামে, যার অর্থ "উড্ডীয়মান ড্রাগনচ। ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসনের সময় তারা হ্যানয়কে তাদের প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং এখানে ইউরোপীয় স্থাপত্য এবং ফরাসি নির্মাণ শৈলীর অনেক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, যা আজও টিকে আছে। পৃথিবীর অন্য সব বড় সভ্যতা বা পুরনো শহরের মত হ্যানয় শহরটিও একটি নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল। 'রেড রিভার' (Hồng Hà) নামের এই নদীর পানি অগভীর মাটির জন্য লালচে রং এর।

টুরিস্টদের জন্য হ্যানয়ে থাকার সবচাইতে জনপ্রিয় তিনটি এরিয়া হচ্ছে ওল্ড কোয়ার্টার, ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টার আর ওয়েস্ট লেকের পাড়। আমরা তিন নাম্বার স্পট টা বেছে নিয়েছি একটু নিরিবিলিতে থাকবো, ভোর সকালে আর রাতের বেলায় লেকের পাড়ে হাঁটবো এই চিন্তা করে। এই তিনটা এলাকার কথা যদি বলতে হয়, তাহলে প্রথমেই আসবে হ্যানয়ের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ওল্ড কোয়ার্টার। হাজার বছরের পুরনো এই এলাকায় সরু সরু গলির মধ্যে পুরাতন দোকানপাট এবং ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা দেখা যায়। ওল্ড কোয়ার্টার শপিংয়ের জন্য ও ভিয়েতনামি স্ট্রিট ফুডের জন্য বিখ্যাত।

হ্যানয়ের ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টার ফরাসি শাসনামলের অনেক স্মৃতি বহন করে চলেছে, যার মধ্যে রয়েছে ফরাসি ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন হ্যানয় অপেরা হাউস এবং হোটেল মেট্রোপোল হ্যানয়। এই এলাকাটিও শপিং এবং খাওয়ারদাওয়ারের জন্য বিখ্যাত।

হ্যানয়ের ওয়েস্ট লেক "হো তাই", হ্যানয়ের বিখ্যাত ও সবচাইতে বড় লেক। প্রায় ১৭ কিলোমিটার পরিধির এই বিশাল জলাশয়টির উৎপত্তি নিয়ে ভিয়েতনামে বেশ কয়েকটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। সবচেয়ে জনপ্রিয় কিংবদন্তি অনুসারে, এক বিশাল ড্রাগন এই লেকের স্থানটিতে নেমে এসেছিল, যা পরবর্তীতে লেকের রূপ নেয়। আরেকটি কাহিনি বলে, একবার একটি বিশাল দৈত্যকচ্ছপ হ্যানয়ের মাটিতে বিরাট গর্ত তৈরি করে, এবং সেই গর্তের ভেতর থেকেই ওয়েস্ট লেকের জন্ম হয়।

ওয়েস্ট লেকের চারপাশ ঘিরে অনেক প্রাচীন ও বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির ছাড়াও রয়েছে বিলাসবহুল হোটেল ও অসংখ্য রেস্টুরেন্ট। এই এলাকাটি হ্যানয়ের অন্যতম অভিজাত আবাসিক এলাকা হিসেবে পরিচিত।

এই তিনটা এলাকায় ঘুরতে ঘুরতে আপনি পথেই পেয়ে যাবেন বাই ডিন স্কয়ার, টাই টো স্ট্রিট এবং ডিপ্লোম্যাটিক এলাকা, থাং লং সাম্রাজ্যের প্রাসাদ, ট্রান কুক প্যাগোডা ও টেম্পল অব লিটারেচার সহ আরো অনেক দর্শনীয় স্থান।

নামের গল্প

হ্যানয়ের ওয়েস্ট লেকের পাড়ে আমাদের হোটেলে চেক ইন করে ফ্রেশ হয়ে নিচে নামতে নামতে রাত ১০টা বেজে গেল। রিসেপশানে বসে আছে জেসন, সে বলল এই এরিয়াতে অনেক রেস্টুরেন্ট আছে, কিন্তু রাত ১০ টা থেকে সব বন্ধ হওয়া শুরু হয়, ডিনার করতে হলে এখনি বের হয়ে ডিনার করে আসতে।

চেক ইন করার সময় জেসনের সাথে গল্প করে খুব ভাল লেগেছে। 'জেসন' নামটা কিন্তু ওর আসল নাম না। এটা ওর নিজের দেয়া ছদ্মনাম। ওর আসল নাম Đức Quang যেটা উচ্চারণ বা মেমোরাইজ করা টা টুরিস্টদের জন্য বেশ কঠিন, তাই আমাদের মত ক্ষণিকের অতিথিদের কথা চিন্তা করে ও নিজের জন্য জেসন নামটা ঠিক করেছে। ভিয়েতনামে এই ব্যাপারটা আগেও খেয়াল করেছি, এখানে ট্যুরিজম নিয়ে যারা কাজ করে, সবারই নিজেদের দেয়া একটা করে ইংরেজি ছদ্ম নামও আছে তাদের আসল ভিয়েতনামিজ নামের পাশাপাশি। আমাদের সাইগন এর গাইড 'মাইলো', হোয়ে আনের 'লিন', হ্যানয়ের 'ডে', সবার নামই তাদের নিজেরজের দেয়া ছদ্মনাম ছিল।

নাম নিয়ে অবশ্য আমারো একটা মজার ঘটনা আছে।

বিশ্বজিৎ নামটা আমার অফিসের বিদেশী কলিগদের জন্য সঠিক ভাবে উচ্চারন করাটা একটু কষ্টকর ছিল। কমনলি আমাকে তারা 'বি-সুয়া-জিট' নামেই ডাকতো। অফিসে নতুন জয়েন করা আমাদের অস্ট্রেলিয়ান সুপারভাইজার (জশ) একদিন এসে আমাকে বললঃ

- Do you have a nickname that would be easier for me to pronounce correctly?
- Yes, my friends call me 'Bishw'(wek¦).
- Would you mind if I shorten your name a bit?
- Not at all! What do you have in mind?
- Would it be okay if I call you "Bish"? (বিষ/বিশ)?

আমি মুচকি হেসে সায় দিলাম, আমাকে বিষ/বিশ যাই ডাকো আমার কোন আপত্তি নেই... ।

কিন্তু, আমার পাশের ডেস্কে বসা সিনিয়র এক বাংলাদেশী কলিগ হায় হায় করে উঠলেন। তিনি জশকে বললেন, তুমি কি জান, বাংলায় 'বিষ' এর মানে 'পয়জন'?

- Oh my God! I had no idea. I'm really sorry. I'm withdrawing my proposal and will practice pronouncing 'Bishwajit' correctly for you.

ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে। দুষ্ট কলিগদের কল্যাণে অফিসে ছড়িয়ে গেল যে নতুন বস এসে আমার নাম দিয়েছে 'বিষ'। আমাকে একটু পর পর সবাই এসে কারণে অকারনে ও 'বিষ', 'বিষদা' আর 'বিষভাই' বলে ডেকে মজা নিচ্ছে।

আর্থ-গডকে পূজা

আমি জশকে তখন বললাম, আমার কোন আপত্তি নেই আমাকে বিষ/বিশ ডাকলে। কিন্তু, আমাদের দেশে রীতি অনুযায়ী কারো নতুন নামকরন করা হলে 'আকিকা' নামের পার্টি দিতে হয়। তোমাকে পার্টি দিতে হবে যেহেতু নামটা তুমি দিয়েছ। জশ সেই উইকএন্ডেই তার বাসার ছাদে আমার আকিকা উপলক্ষ করে ডিনারের দাওয়াত দিয়েছিল ইউনিটের সবাইকে।

হ্যানয় শহরে প্রথম ডিনার

খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে, তার উপর রাত ১০ টা থেকে আশেপাশের সব রেস্টুরেন্ট বন্ধ হওয়া শুরু হয় শুনে মাথাও ভোঁ ভোঁ করতে লাগলো। সেই দানাং এয়ারপোর্টে খেয়েছিলাম। জেসনের পরামর্শে হোটেল থেকে বেরিয়ে লেকের পাড় ধরে ডান দিকে হাঁটা শুরু করলাম রেস্টুরেন্ট এর খোঁজে। হাঁটতে গিয়ে বাম পাশে দেখছি লেকের রাতের সৌন্দর্য আর ডান পাশে দেখছি একে একে বন্ধ হয়ে যাওয়া রেস্টুরেন্ট।

প্রায় ২০ মিনিট হাঁটার পর 'Ngã tư Văn Cao' নামের একটা অনেক বড় রাস্তার মোড়ে এসে পৌছালাম। সব বড় বড় রেস্টুরেন্ট গুলো বন্ধ হয়ে গেছে। 'Tây Quán' নামের একটা ছোট রেস্টুরেন্ট বন্ধ হব হব করছে। তার সামনে বসে কুকিং এপ্রন পরা দুজন আন্টি গল্প করছেন। বড় আন্টিকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলাম ডিনারের জন্য কিছু আছে কিনা? বুঝলাম উনি ইংরেজি জানেন না, কিন্তু ইশারায় বললেন রেস্টুরেন্টের সামনে ফুটপাতে পাতা নিচু চেয়ার টেবিলে বসতে। এর পর উনি মেনু নিয়ে আসলেন।

মেনু পুরোটাই ভিয়েতনামিজ ল্যাংগুয়েজে, কোন ইংরেজি নেই। খাওয়ারের কোন ছবি ও নেই যে দেখে অর্ডার দিব। গুগল ট্রান্সলেটরের হেল্প নিয়েও কোন কাজ হলোনা, উনাকে কিছু বোঝাতে পারলাম না, উনি কি বলছেন তাও বুঝতে পারলাম না। এরপর আন্টি হাসতে হাসতে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন উনার দোকানের ভেতরে ফ্রিজের সামনে, যেখানে প্রি কুকড অবস্থায় মাশরুম, স্কুইড, চিংড়ি, কয়েক রকমের মাছ, পর্ক, ঝিনুকের মাংস, অক্টোপাস এইসব সাজানো আছে, এখান থেকে আমাদের যা যা পছন্দ হয়, অর্ডার করতে পারবো।

আমরা দুজন মাশরুম, পর্ক, চিংড়ি, স্কুইড আর দুটো সামুদ্রিক মাছ সিলেক্ট করে উনাকে বললাম 'বিয়া' আর হাত দিয়ে ভি সাইনের মত করে দুটো আঙুল দেখালাম। উনি আমাদের দুজনের হাতে দুইটা বিয়ারের ক্যান ধরিয়ে দিলেন। বিয়ার খেতে খেতে দুজন গল্প করছি আর অপক্ষা করছি খাওয়ারের জন্য। একটু পর উনি আমরা যা যা অর্ডার করেছিলাম সেই সব আর সাথে কিছু স্লাইস করা

বেগুন, ক্যাপসিকাম, লেটুস পাতা, পেঁয়াজ, টমেটো দুই ট্রে তে করে দিয়ে চলে গেলেন। সবই কাঁচা কাঁচা।

কি বিপদ! এইসব খাবার কাঁচা কাঁচা খেতে হবে নাকি? এর পর আমাদের টেবিলে দেয়া হলো একটা ছোট চুলা। অর্থাৎ, আমাদেরকে সব নিজে নিজে রান্না করে খেতে হবে। এটাই এখানকার নিয়ম। কিভাবে কি শুরু করবো বুঝতে পারছি না, এই চুলা জ্বালাবো কিভাবে?

আমাদের এই অবস্থা দেখে এবার এগিয়ে এলেন ছোট আন্টি। আমাদেরকে চুলা জ্বালিয়ে তার ওপর প্যান বসিয়ে সেখানে বাটার ছেড়ে দিলেন। বাটার গলে এলে সেখানে একটা একটা করে খাবার দিতে থাকলেন। আমরাও হাত লাগালাম, একটা রান্না শেষ হয়, ওটা খেতে খেতে আরেকটা রান্না করি... নতুন অভিজ্ঞতা...

ডিনার শেষ করে হোটেলের দিকে হাঁটা দিলাম। ঘড়িতে বাজে রাত সোয়া ১২টা। পরের দিনের প্ল্যান হচ্ছে সকালে লেক পাড়ে হাঁটবো, এর পর ওল্ড কোয়ার্টার আর ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টার ঘুরে আসবো।

সকালের ওয়েস্ট লেক ও ট্রান কুক প্যাগোডা

হ্যানয়ের ওয়েস্ট লেক সকালে অন্যরকম এক রূপে ধরা দিল। শহরের ব্যস্ততা তখনো শুরু হয়নি, লেকের ওপর ধূসর ঘন কুয়াশা ছড়িয়ে আছে, ঐপাড়ের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। স্বর্গীয় দৃশ্য মনে হয় একেই বলে। আমি লেকের পার ধরে হেঁটে হেঁটে ট্রান কুক প্যাগোডার দিকে আগাচ্ছি। অনেকেই বেরিয়েছেন জগিং আর মর্নিং ওয়াকে। কয়েকটা গ্রুপ দেখলাম দল বেঁধে তায়-চি করছে।

হ্যানয়ের ঐতিহ্যবাহী এবং প্রাচীন স্থাপত্যশৈলীর অন্যতম নিদর্শন হলো ট্রান কুক প্যাগোডা। প্রায় ১,৪০০ বছরের পুরানো এই বৌদ্ধ মন্দিরটির অবস্থান হ্যানয়ের ওয়েস্ট লেকের তীরে ছোট একটা দ্বীপের মধ্যে। ভিয়েতনামের সবচেয়ে পুরনো প্যাগোডাগুলোর মধ্যে এটি একটি।

লি সাম্রাজ্যের শাসনামলে, সম্রাট লি নাম দে (Ly Nam De) রেড রিভারের তীরে এই প্যাগোডাটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে নদীভাঙ্গনের ফলে ১৭শ শতকে এটি স্থানান্তরিত করে ওয়েস্ট লেকের তীরে নিয়ে আসা হয়। এই সকালের কুয়াশা ঘেরা আবহে প্যাগোডার ভেতরটা ঘুরে কেমন একটা শান্তি শান্তি লাগছে। ভেতরে দেখলাম পূজা দেয়ার জন্য ফুল ফলের পাশাপাশি দুই পাশে বড় টবের মধ্যে দুটো কমলা গাছ, যেটা ভরে আছে পাকা কমলায়। ইনোভেটিভ এই আইডিয়াটা পছন্দ হয়েছে।

হোটেলে ফিরে তন্ময়দা কে ঘুম থেকে তুলে ক্রসন্ত আর ভিয়েতনামিজ কফি দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে নিলাম হোটেলে। তার পর একটা গ্র্যাব ডেকে সোজা চলে গেলাম টেম্পল অফ লিটারেচারে।

ভিয়েতনামের ‘Temple of Literature’ সাহিত্য মন্দির

১০৭০ খ্রিস্টাব্দে লি সাম্রাজ্যের সম্রাট লি থান তং এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। শুরুতে এটি ছিল কনফুসিয়াসকে উৎসর্গ করা একটা ধর্মীয় মন্দির। পরে, ১০৭৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট লি ন্যাং তং এই মন্দিরটিকে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন, যা কোয়ক তু জিয়াম (Quoc Tu Giam) নামে পরিচিত ছিল। এটিই ছিল ভিয়েতনামের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে রাজপরিবারের সদস্যদের নৈতিক শিক্ষা, সাহিত্য, এবং প্রশাসনিক দক্ষতা শেখানো হত। শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাইয়ের জন্য নিয়মিত পরীক্ষা নেয়া হত, এবং সফল ছাত্রদের জন্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ সরকারি পদে কাজ করার সুযোগ দেয়া হত।

বর্তমানে এই সাহিত্য মন্দির ভিয়েতনামের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র। প্রতিদিন হাজারো পর্যটকের পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষার্থীরাও আসেন তাদের পরীক্ষার আগে এই মন্দিরে প্রার্থনা করতে এবং কনফুসিয়াসের কাছ থেকে আশীর্বাদ নিতে যাতে তারা পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে পারে।

কচ্ছপের পিঠে সারস

ভিয়েতনামের লোককথায় দুটি উল্লেখযোগ্য প্রাণী হল কচ্ছপ এবং সারস। তাও মতবাদে কচ্ছপকে দীর্ঘায়ু, প্রজ্ঞা এবং ধৈর্যের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। এছাড়াও সমুদ্রের তলদেশ থেকে আসা এক পবিত্র কচ্ছপের জাদুর সাহায্যে চিনা শাসকদের পরাজিত করেছিলেন এখানকার সম্রাট। আর, সারসকে দেখা হয় সুখ, শান্তি এবং দীর্ঘায়ুর প্রতীক হিসেবে। এছাড়াও, রাজপরিবারে সারসকে শক্তি, সম্মান এবং স্বর্গীয় রক্ষাকর্তা হিসেবেও বিবেচনা করা হতো।

তাই, বিভিন্ন ভাস্কর্য এবং শিল্পকর্মে, বিশেষ করে মন্দির ও প্যাগোডার চিত্রকলায়, সারসকে কচ্ছপের পিঠে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এটি দীর্ঘায়ু এবং প্রজ্ঞার প্রতীক। এই টেম্পল অব লিটারেচারের চারপাশ ভর্তি বিভিন্ন আকারের কচ্ছপের পিঠে দাঁড়ানো সারসের মূর্তি। এবং, সবচাইতে বড় দুইটা ব্রোঞ্জের মূর্তিতে সারসের বুক এবং কচ্ছপের মাথার অংশ টুকু চকচক করছে। একটু পরেই বুঝলাম এর কারন। এখানে আসা ভিয়েতনামিজরা সবাই মূর্তিতে এসে কপাল ঘসে ঘসে আশীর্বাদ নিচ্ছে।

ঘণ্টা দেড়েক এখানে ঘুরে বের হওয়ার গেটে পেলাম এই টেম্পল অব লিটারেচারের সুভেনিয়র শপ। সবচাইতে বেশি পছন্দ হলো স্টিল ফ্রেমে বাঁশ দিয়ে তৈরি থার্মাল

কফি ফ্লাস্ক। বাঁশের উপরিভাগে কচ্ছপের পিঠে সারস খোদাই করা। কেনাকাটা সেড়ে বের হয়ে ঠিক করলাম একটু হাঁটাহাঁটি করে চারপাশটা দেখব আর 'বারাক ওবামা!' কে খুঁজে বের করবো।

বারাক ওবামা'র বুন চা

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ২০১৬ সালের মে মাসে ভিয়েতনাম সফর করেছিলেন। এই সফরের সময় তিনি হ্যানয়ের খুব সাধারণ একটা রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়েছিলেন, যার নাম 'Bún chả Hương LiÐn'। সেখানে তিনি ভিয়েতনামের জনপ্রিয় খাবার "বুন চা" (Bún chả) খেয়েছিলেন। বুন চা হলো গ্রিল করা পর্ক এবং রাইস নুডলস দিয়ে তৈরি একটি খাবার। ওবামা এই রেস্টুরেন্টে খেয়ে যাওয়ার পর এটা খুবই বিখ্যাত হয়ে ওঠে এবং রেস্টুরেন্টটি স্মৃতি হিসেবে ওবামার ব্যাবহার করা টেবিলটি "ওবামা টেবিল" হিসেবে আলাদা করে রেখে দিয়েছে এরা।

ক্ষুধার্ত আমরা দুজন ভেতরে ঢুকে দেখি অনেক ভীড়, কোন টেবিল ফাঁকা নেই। একজন এসে বলল একটু অপেক্ষা করতে একটা টেবিল খালি হবে একটু পরেই, ওটা সে আমাদের জন্য রাখবে। টেবিল খালি হলে বসে পড়লাম। ওয়েটার এসে মেনু দিয়ে গেল। এই প্রথম একটা মেনু দেখলাম যেখানে ভিয়েতনামিজ এর পাশাপাশি ইংরেজিতেও খাবারের নাম লেখা আছে, এবং সেটা কিসের খাবার সেটাও লেখা আছে। প্রথম আইটেমের নামই হচ্ছে 'কম্বো ওবামা' ওবামা এসে যা যা খেয়েছিল সব মিলিয়ে একটা কম্বো। সেটাই অর্ডার করলাম দুইটা, সাথে আরো কিছু মুখরোচক আইটেম। আমরা খাওয়ারের জন্য অপেক্ষা করছি, কোন টেবিলই খালি নেই, তিন জাপানি মেয়ে রেস্টুরেন্ট এ বসার জায়গা খুঁজে না পেয়ে এদিক ওদিক ঘুরছে। আমি তাদের বললাম 'সুমিমাসেন, তোমাদের কোন আপত্তি না থাকলে আমাদের সাথে টেবিল শেয়ার করতে পার'। আমার মুখে জাপানিজ শুনে, নাকি বসার আমন্ত্রণ পেয়ে জানিনা, তিনজনেই খুশি হয়ে গেল। অনেক গল্প গুজব হলো খেতে খেতে। আমি বললাম আগামী বছর মার্চ এপ্রিলে তোমাদের দেশে যাব সাকুরা দেখতে। শুনে কিছু টিপস দিল জাপান ট্যুর নিয়ে। খেয়েদেয়ে বের হয়ে হাঁটা দিলাম 'হোয়ান কিয়েম লেক' এর দিকে।

ওল্ড কোয়ার্টার ও ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টার

হাঁটতে হাঁটতে পথে অনেক কিছুই দেখলাম। হোয়ান কিয়েম লেকের পাশেই অবস্থিত ট্রাং টিয়েন প্লাজা। ১৯০১ সালে ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসনামলে তৈরি এই শপিং মল হ্যানয়ের সবচেয়ে পুরনো এবং বিলাসবহুল শপিং মলগুলোর

বারাক ওবামার জন্য বিখ্যাত বুন-চা এর সামনে জাপানি বান্ধবীদের সাথে...

একটি। তার সামনেই দেখলাম ভিয়েতনামিজ রিক্সা। এদের রিক্সা ঠিক আমাদের উল্টো। যাত্রী সামনে বসে আর চালক বসে পেছনে।

রাস্তা পার হয়েই পৌঁছে গেলাম হ্যানয় শহরের অন্যতম প্রাকৃতিক এবং ঐতিহাসিক স্থান 'হোয়ান কিয়েম লেক'এ। কথিত আছে যে সমুদ্রের তলদেশ থেকে আসা এক পবিত্র কচ্ছপের কাছ থেকে পাওয়া একটি জাদুকরী তলোয়ারের সাহায্যে এখানকার সম্রাট 'লে লোই' চীনা শাসকদের পরাজিত করেন এবং যুদ্ধের পরে সেই তলোয়ারটি এই লেকের মধ্যে ফেলে দেন। তাই এই লেককে "রিটার্নড সোর্ড লেক" বলা হয়। লেকের ঠিক মাঝখানে "জেড মন্দির"। একটা সুন্দর লাল রঙের ব্রিজ দিয়ে সবাই জেড মন্দিরে যাচ্ছে।

হোয়ান কিয়েম লেকের চারপাশে পার্ক ও হাঁটার রাস্তা আছে। সেই পার্কে কয়েকটা রেস্টুরেন্ট ও দেখলাম। লেকের পার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম শপিং স্ট্রিটে। এখানেও অনেক কিছু পাওয়া যাচ্ছে, ভিয়েতনাম জুতার জন্য খুব বিখ্যাত। জুতার দোকানই বেশি দেখলাম অন্যান্য জিনিষপত্রের পাশাপাশি। দরদাম করা যাচ্ছে, দোকানিরা ইংরেজিতে কথা বলে, আর দাম ও অনেক কম। ঘণ্টাখানেক ঘুরে চলে গেলাম 'সেন্ট জোসেফ'স ক্যাথেড্রাল'এ। এই ক্যাথেড্রালটি ফরাসি

ঔপনিবেশিক শাসনামলে নির্মিত হয়েছিল। এটা দেখতে অনেকটা প্যারিসের বিখ্যাত নটর ডেম ক্যাথেড্রালের মত। রাতের লাইটিং এর জন্য দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। সেখান থেকে হেঁটে চলে গেলাম হ্যানয় রেল স্টেশনের পাশের রেল লাইনে। যেখানে রেললাইনের দু'পাশে অনেক ছোট ছোট রেস্টুরেন্ট আছে। এই এলাকাটা হ্যানয়ের বিখ্যাত 'ট্রেন স্ট্রিট ফুড এক্সপেরিন্স' এর জন্য খুব বিখ্যাত। রেল লাইনের পাশে বসে আপনি নুডলস স্যুপ খাচ্ছেন, আর একটু পর পর আপনার গা ঘেঁষে চলে যাবে একটা ট্রেন। খুবই রোমাঞ্চকর। আমরা এখান থেকে হ্যানয়ের বসুন্ধরা সিটি(!) লোটে সেন্টারে যাব। জেসন বলেছিল সেখানে ব্ল্যাক ফ্রাইডে সেল চলছে। ৭০-৮০% ডিসকাউন্টে অনেক ভাল ভাল জিনিসপত্র পাওয়া যাবে।

ট্যাক্সি স্ক্যামের শিকার

লোটে সেন্টার পর্যন্ত আর হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। গ্র্যাবে অনেক সার্চ করেও কোন গাড়ি পাচ্ছিনা, এমন সময় এক ট্যাক্সি এসে পাসে দাঁড়াল, ইংরেজিতেই জিজ্ঞেস করলো কই যাব। লোটে সেন্টারে যাব, কত টাকা নেবে জিজ্ঞেস করায় বলল সে মিটারে যাবে। গ্র্যাবে ভাড়া দেখাচ্ছিল ৫৮ হাজার ডং, মানে ২৮০ টাকার মত। আমি আর তন্ময় দা ভাবলাম মিটারেই যেহেতু যাবে সমস্যা নাই। উঠে পড়লাম। আমরা ম্যাপে খেয়াল রাখছিলাম সে ঠিক রাস্তাতেই যাচ্ছে, নাকি উল্টাপাল্টা রাস্তায় যাচ্ছে মিটারে বেশি টাকা তোলার জন্য। না ঠিক রাস্তাতেই আছে।

কিছুদূর গিয়েই বুঝলাম তার মিটার টেম্পারিং করা। আমরা অর্ধেক রাস্তাও যাইনি মিটারে অলরেডি ১ লাখ ৩০ হাজার ডং উঠে গেছে। তাকে বললাম তোমার মিটারে সমস্যা, ভুল রিডিং দিচ্ছে, এখন সে আর ইংরেজি বলে না, ভিয়েতনামিজ ভাষায় হরবর করে কি যেন বল্ল। আমি আর তন্ময় দা ঠিক করলাম আমাদের ডেস্টিনেশানের কাছাকাছি গিয়ে ওকে নিয়ে ট্রাফিক পুলিশের কাছে কমপ্লেইন করবো। রাস্তায় কোথাও কোন ট্রাফিক পুলিশ দেখলাম না। এমনকি ট্রাফিক সিগন্যালেও না। লোটে সেন্টারে পৌঁছে দেখি মিটারে দেখাচ্ছে ২ লাখ ১৫ হাজার ডং। গ্রাবের চাইতে প্রায় চার গুণ বেশি। ড্রাইভার কে বললাম তোমার মিটারে এত টাকা এলো কিভাবে? গ্রাবের ভাড়া তো ৫৮,০০০ ডং। তোমার বেশি হলে ৭০/৮০ হাজার ডং হতে পারে। এখন ব্যাটা আর ইংরেজি বলে না, বোঝেও না। আমরা দুজন হাল ছেড়ে দিলাম। রাম-ধরা খেয়ে আমাদের দুজনেরই মন মেজাজ খারাপ। আর কখনো মিটারে ট্যাক্সিতে উঠবো না।

আমাদের ভারাক্রান্ত মন মুহূর্তেই ভাল হয়ে গেল লোটে সেন্টারে ঢুকে। নামীদামী সব ব্র্যান্ডের জিনিসপত্র পানির দামে বিক্রি হচ্ছে। লোটে সেন্টারের বেসমেন্টে আছে সুপারশপ 'লোটে মার্ট' সেখানেও অনেক ডিসকাউন্ট। কেনাকাটা সেরে লোটে মার্টের ফুড কোর্টে ডিনার করে শপিং ব্যাগ ভর্তি জিনিসপত্র নিয়ে হোটেলে ফিরলাম। পরদিন সকালে আমরা যাব নিন বিং-এ। জেসন সব ব্যাবস্থা করে রেখেছে।

ভিয়েতনামের শেষ দিন

সকাল ৭টায় একটা টুরিস্ট ভ্যানে করে হোটেলের সামনে থেকে আমাদেরকে পিক করলো আমাদের আজকের গাইড 'ডে'। এই 'ডে' নামটাও কিন্তু ওর নিজের দেয়া। তার আসল ভিয়েতনামিজ নামও খুব খটমটে ছিল, ভুলেই গেছি। আরো কয়েকটা হোটেলের সামনে থেকে সে একে একে পিক করলো আরো ১০ জন টুরিস্ট কে। এখানেও একটা ইয়াং ইন্ডিয়ান কাপল ছিল, ৫ জন ফিলিপিনো আমেরিকান, একজন আসল আমেরিকান ভদ্রমহিলা আর এক মাঝ বয়েসি অস্ট্রেলিয়ান কাপল।

সবাইকে পিক করে আমরা রওনা দিলাম নিমবিনের বাইডিন প্যাগোডার উদ্দেশে। পরিচয় পর্ব শেষ করে ডে শুরুতেই আজকের আমাদের টোটাল ট্যুর প্ল্যানের একটা সামারি দিল। বাইডিন প্যাগোডা থেকে আমরা যাব রওনা দিব ট্রাং আনের দিকে। পথে লাঞ্চ ব্রেক। ট্রাং আনে ট্রেডিশানাল বাঁশের নৌকায় করে লেক ও কয়েকটা কেভ দেখবো। সেখান থেকে যাব মুয়া কেভের ড্রাগনের পাহাড়ের চূড়ায়।

হ্যানয়ের মত এবার আর ভুল করিনি। ডে যখন আমাদেরকে রিসিভ করতে এসেছিল, গাড়িতে উঠার আগেই তাকে আমরা বলে দিলাম যে "ভাই, আমরা কিন্তু পার্টনার (এলজিবিটি কাপল) না। কলিগ, একসাথে ঘুরতে এসেছি। এইটা মাথায় রাইখ"।

এই গ্রুপের কেউ তেমন মিশুক ছিলনা কেমন যেন ছাড়া ছাড়া ভাব। শুধু আমেরিকান ভদ্রমহিলা অনেক গল্প করলেন আমাদের সাথে। আমাদের মত তাঁর ভিয়েতনাম ট্যুরটাও আনপ্ল্যান্ড, হটাৎ করেই চলে এসেছেন। উনার হাজবেন্ডের হ্যানয়ে একটা বিজনেস কনফারেন্স আছে ২ দিনের। বন্ধুদের সাথে প্ল্যান করা একটা ট্যুর ক্যান্সেল হওয়ায় গোছানো ব্যাগটা নিয়ে এখানে চলে এসেছেন। অনেকটা আমাদের মতোই কেস।

বাইডিন প্যাগোডা

সকাল ১০ টার দিকে আমরা পৌছালাম বাই ডিন প্যাগোডার গেটে। ডে সবাইকে একটা ছোট ব্রিফ দিল এই প্যাগোডা নিয়ে।

অষ্টম শতকের এই প্যাগোডা ভিয়েতনামের সবচেয়ে বড় বৌদ্ধ মন্দির ও অনেক জনপ্রিয় একটা পর্যটন স্পট। ২০০৩ সালে এটা পুনঃনির্মাণ করা হয়। এখানে রয়েছে ৭০০টি বিশাল বিশাল পাথরের বুদ্ধের মূর্তি যার প্রতিটি একটার চাইতে আরেকটা আলদা।

গেট থেকে ইলেক্ট্রিক কারে করে অনেকটা গিয়ে মূল প্যাগোডার সামনে এসে গেলাম। ভেতরে একটার পর একটা সুবিশাল বুদ্ধ মূর্তি। প্যাগোডার প্রতিটি স্থাপত্যকর্মে, ভেতরকার ভাস্কর্য, কাঠের নকশা, ও পাথরের কাজগুলোতে ভিয়েতনামের ঐতিহ্য ও শৈল্পিক দক্ষতার ছাপ স্পষ্ট। একদম মাঝখানের সবচাইতে বড় বুদ্ধ মূর্তিটির সামনে এসে ডে বলল। ১০০ টন ওজনের ব্রোঞ্জের তৈরি এই গৌতম বুদ্ধের মূর্তিটি ১০০ কেজি খাঁটি সোনা দিয়ে প্রলেপ দেয়া।

এই প্যাগোডার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে ১৩ তলা একটা টাওয়ার। প্রতিটি তলায় রয়েছে খোদাই করা বিভিন্ন বুদ্ধমূর্তি এবং শিল্পকর্ম। মেরামতের জন্য বন্ধ থাকায় এর চূড়ায় আমরা যেতে পারিনি। ডে বলল এর চুড়া থেকে আশেপাশের সবুজ ধানক্ষেত, পাহাড়, এবং নদীর অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়।

প্যাগোডা থেকে বেড়িয়ে আমরা রওনা দিলাম ট্রাং আনের দিকে। পথে একটা রেস্টুরেন্টে এখনাকার বিখ্যাত গোট মিট ও অন্যান্য ট্রেডিশানাল খাওয়ার দিয়ে লাঞ্চ সেরে নিলাম। দুপুর দেড়টার দিকে আমরা গিয়ে পৌছালাম ট্রাং আনের নৌকার ঘাটে।

ট্রাং আনের গুহা ও নৌভ্রমণ

নৌকার ঘাটে এসে ডে সবাইকে নৌকায় ভাগ করে দিচ্ছে, মাঝারি সাইজের প্রতিটি নৌকায় একজন মাঝি আর সর্বোচ্চ ৪ জন টুরিস্ট উঠতে পারবে। আমাদের সাথে উঠলো মুম্বাই থেকে আসা স্বপ্নিল ও তাঁর ওয়াইফ। আমাদের মাঝি ভদ্রমহিলার বয়স ৬০ এর মত হবে। নৌকায় সবার জন্যই লাইফ জ্যাকেট বাধ্যতামূলক, সাঁতার জানলেও। আশেপাশের নৌকাগুলোতে দেখলাম মাঝি বেশিরভাগই বিভিন্ন বয়েসি নারী, যাদের মুখে সারাক্ষণ হাসির লেগেই আছে।

ভিয়েতনামের নিন বিং-এর ট্রাং আন শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্যের জন্যই নয়, বরং এর ঐতিহাসিক তাৎপর্যের জন্যও বিখ্যাত। ট্রাং আন মূলত ২৫০ মিলিয়ন বছর পুরনো কর্স্ট পর্বত শ্রেণির চুনা পাথরের পর্বতমালার একটি অংশ। সময়ের সাথে

সাথে প্রাকৃতিক কারণে এই এলাকা এক সময় পানির নিচে ডুবে যায় এবং পাহাড়ের ভিতর দিয়ে গুহা আর জলাধারের সৃষ্টি হয়।

প্রাকৃতিক ভাবে সুরক্ষিত এই এলাকাটি প্রাচীনকালে বিভিন্ন রাজবংশের শাসকদের রাজধানী ছিল। এই এলাকা পাথুরে পাহাড়ের মধ্যে বলে এটি খুব দুর্গম ছিল ও শত্রুরা এখানে আক্রমণ করত না। ২০১৪ সালে ট্রাং আন টঘঊঝঈঙ বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

আমাদের নৌকা চলা শুরু করলো, পানিতে বৈঠার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। চারপাশে বিশাল সবুজ পাহাড়ের সারি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। নৌকায় আমদের জন্যও চারটা বৈঠা রাখা আছে। আমি বৈঠা হাতে নিয়ে নৌকা বাইতে শুরু করলাম। পেছনে তাকিয়ে দেখি, আমাদের মাঝি আন্টির মুখের হাসি আরো চওড়া হয়ে গেছে আমার হাতে বৈঠা দেখে। বাকিরাও দেখি বৈঠা হাতে নিয়ে নিল।

কিছুদূর যাওয়ার পর আমাদের সামনে একের পর এক গুহা আসতে থাকলো। গুহার ভেতরে ঢুকতেই গায়ে একটা ঠান্ডা বাতাসের স্পর্শ পেলাম, আর সেই সাথে অন্ধকারে ঢেকে যাওয়া সরু জলপথের সাথে ভেতরের অদ্ভুত নীরবতা আমাদের যেন এক রহস্যময় জগতে নিয়ে গেল। কয়েকটা বড় গুহার মাঝখানে ইলেক্ট্রিক লাইটের ব্যাবস্থা করা হয়েছে যাতে অন্ধকার একটু কমে আর কয়েকটাতে কোন লাইটিং এর ব্যাবস্থাই ছিলনা। ভেতরটা খাঁজ কাঁটা ধারালো বড় বড় পাথরে ভর্তি। কিছু কিছু পাথর এতটাই নিচু যে প্রায় নৌকার উপর শুয়ে যেতে হলো, মাথায় ঠেকে গেলে সর্বনাশ হবে।

চারপাশের প্রকৃতি অনেক বেশি প্রাণবন্ত। পাহাড়ের ফাটলে জন্ম নেওয়া গাছপালা, পানির ধারার পাশে খেলা করা পাখিরা, আর কখনও কখনও দূরে দেখা যাচ্ছে বুনো ছাগলের, সব মিলিয়ে এক অসম্ভব সৌন্দর্যঘেরা পরিবেশ।

মুয়া কেভ ও ড্রাগনের পাহাড়ের চূড়ায়

সারাদিনের ধকল শেষে সবাই মোটামুটি ক্লান্ত অবস্থায় গিয়ে পৌঁছালাম নোগা লং পর্বতের (ড্রাগনের পাহাড়ের) নিচে মুয়া কেভের কাছে। ডে'র প্ররোচনায় ড্রাগনের পাহাড় থেকে পুরো 'তাম কোক' উপত্যকার সৌন্দর্য দেখার লোভে আমরা সবাই ঠিক করেছি এই পাহাড়ের চূড়ায় উঠার। ডে সবাইকে আবার সাবধানও করে দিল, প্রায় ৪৮৪ মিটার (১,৫৮৭ ফুট) উঁচু এই পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার জন্য ৫০০ সিঁড়ি বাইতে হবে। সাপের মত প্যাঁচানো পাথুরে সিঁড়িটি খুবই বিপদ্দজনক। কেউ যদি উঠতে না চায় নিচে বিশ্রামের ব্যাবস্থা আছে।

এই পাহাড়ের দুটি চূড়া। সিঁড়ি মাঝখানে দুভাগ হয়ে দুটি চূড়ায় উঠে গেছে। একটা চলে গেছে মন্দিরের দিকে আরেকটা ড্রাগনের দিকে। এত উঁচু সিঁড়ি যে উঠতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। তারপরেও হাঁপাতে হাঁপাতে ৩০ মিনিটে পৌঁছে গেলাম চূড়ায়। চূড়ায় একটা বিশাল ড্রাগনের ভাস্কর্য, যা পুরো চূড়া জুড়ে উপর শুয়ে আছে। এখান থেকে নিচে আরেক পাহাড়ের চূড়ায় দেখা যাচ্ছে ছোট মন্দিরটি।

"মুয়া" শব্দটি ভিয়েতনামী ভাষায় "নাচ" অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিংবদন্তি আছে যে, ট্রান রাজবংশের এক সম্রাট এখানে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে তার প্রিয়তমাকে নাচতে দেখেছিলেন, এবং সেই থেকেই গুহার নাম "মুয়া" হয়। স্থানীয়রা বিশ্বাস করে যে নোগা লং পর্বতের ড্রাগন মূর্তি তাদের দেশকে রক্ষা করে, এবং এই অঞ্চলের ওপর প্রকৃতির আশীর্বাদ নিয়ে আসে।

আমরা চূড়ায় উঠেছি একদম পারফেক্ট টাইমে। সুর্য অস্ত যাবে একটু পর। ড্রাগনের পাহাড়ের চূড়া থেকে দেখা সূর্যাস্তটি ছিল সারাজীবন মনে রাখার মতো একটা দৃশ্য। ডুবন্ত সূর্যের আলো পুরো উপত্যকায় ছড়িয়ে আশেপাশের পাহাড়গুলোর চেহারাই পাল্টে দিয়েছিল সেদিন। মনে হচ্ছিল আমরা কি স্বর্গের কাছাকাছি কোথাও এসে পৌঁছেছি?

হ্যানয়ে লাস্ট সাপার

সারা দিনে নৌকা চালিয়ে আর পাহাড়ে উঠে শরীরে আর এক ফোঁটাও শক্তি নেই, কিন্তু মনের জোর আছে এখনো। তাই, নিন বিং থেকে ফেরার পথে ঠিক করলাম ওল্ড কোয়ার্টারে আরেকটু ঘুরে সেখানেই ডিনার শেষে হোটেলে ফিরব।

রাত ৮টার দিকে আমরা পৌঁছালাম ওল্ড কোয়ার্টারে। প্রচণ্ড খিদে নিয়ে ঢুকলাম এখানকার জনপ্রিয় ভিয়েতনামিজ রেস্টুরেন্ট 'hàng quà' তে। এখানেই আমরা পেয়েছি ভিয়েতনামে আমাদের খাওয়া সেরা বিয়ার। ব্ল্যাক নামের এই লোকাল ক্রাফট বিয়ার আমাদের অসম্ভব ভাল লেগেছে। সাথে খাওয়ার টাও ছিল খুব ভাল। ডিনার শেষে গ্র্যাব ডেকে হোটেলে চলে এলাম। পরদিন সকাল সাড়ে ১০টায় আমাদের ঢাকায় ফেরার ফ্লাইট। মাঝে ব্যাংককে ট্রাঞ্জিট ৫ ঘণ্টার।

উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম

হ্যানয়ের নৈ বাই এয়ারপোর্টে বোর্ডিং শেষ করে সং হং লাউঞ্জে বসে ব্রেকফাস্ট শেষ করে আমি আর তন্ময় দা আমাদের দেখা ভিয়েতনাম নিয়ে গল্প করছিলাম, কোনটা কেমন লাগলো।

উত্তর ভিয়েতনামে দেখলাম এখানকার লোকজন প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান এবং পরিবারকেন্দ্রিক জীবনধারায় বিশ্বাসী এবং কিছুটা রক্ষণশীল। এখানে ভিয়েতনামের লোকজন তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক বেশি ব্যাবহার করে। আর, দক্ষিণ ভিয়েতনামের মানুষ কিছুটা বহির্মুখী। ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব এবং পরবর্তী সময়ে আমেরিকান সংস্কৃতির ছোঁয়া দক্ষিণ ভিয়েতনামের মানুষের জীবনযাত্রায় এক ধরনের প্রভাব রয়েছে।

উত্তর ভিয়েতনামের খাবারে পেয়েছি হালকা স্বাদ, এরা মশলা কম ব্যবহার করে। এখানে স্যুপ, ভাত, এবং কাঁচা বা আধাসেদ্ধ সবজির তৈরি খাবার জনপ্রিয়। দক্ষিণ ভিয়েতনামের খাবারে মিষ্টি এবং মশলার ব্যবহার একটু বেশি পেয়েছি। এখানকার খাবারে নারকেলের, বিভিন্ন ধরনের ফলমূল, এবং সামুদ্রিক খাবারের আধিক্য দেখেছি।

অর্থনৈতিক দিক থেকেও উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে কিছুটা বৈষম্য চোখে পড়েছে। উত্তর ভিয়েতনাম একটু বেশিই কৃষিনির্ভর এবং এখানে শিল্পকারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তুলনামূলক কম। অন্যদিকে, দক্ষিণ ভিয়েতনামে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিদেশি বিনিয়োগ অনেক বেশি। হো চি মিন সিটি ভিয়েতনামের বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।

এই আট দিন ভিয়েতনামে ঘুরে যা বুঝলাম, ভিয়েতনামের কিছুই আসলে দেখা হয়নি।

এখানে আবার না এসে উপায় নেই!

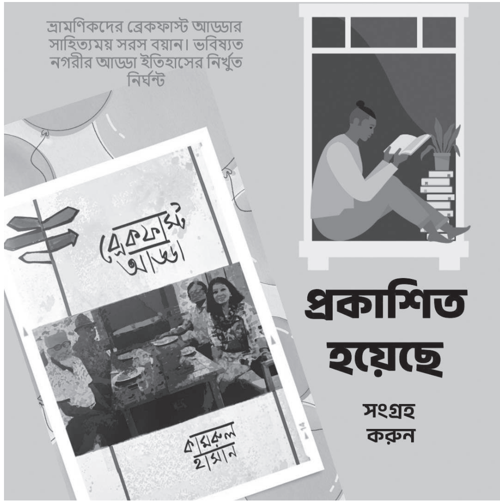

অদ্ভুত ড্রাগন আর আজব কফি

মাসরুর-উর-রহমান আবীর

সকালে ঘুম থেকে উঠে রেডি হচ্ছি।

নতুন দেশে বেড়াতে এসে আমরা খুশি তো বটেই, তবে ছেলের খুশির একেবারে বাধ মানছে না। সে রীতিমতো টগবগ করে ফুটছে। আজ তার অনেকদিনের একটা ইচ্ছাপূরণ হবে।

সে মাত্র স্কুলে ভর্তি হয়েছে। প্লে-গ্রুপে। তার মানে স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া না করে মূলত খেলাধুলা করে। অথচ ওইটুকুন বয়সেই পরিচিত তাবৎ দেশের জাতীয় প্রাণী আর পাখির নাম তার মুখস্থ। তাই আমাদের ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণ নিয়ে আলোচনা শুরু হতে না হতেই সে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় প্রাণী কোমোডো ড্রাগনের নাম জপ করা শুরু করেছে।

ড্রাগন? হ্যাঁ, নামখানা শুনে অবাক হতে হয় বইকি! ড্রাগন শব্দটা শুনলেই আমাদের মনে এমন এক ভয়ংকর প্রাণীর অবয়ব ভেসে ওঠে যে মুখ থেকে আগুন ছুঁড়তে ছুঁড়তে তীক্ষ্ণ নখর সামনে বাড়িয়ে এঁকেবেঁকে উড়ে বেড়াচ্ছে। হয়তো আকাশে শোনা যাচ্ছে প্রকম্পিত বজ্রনির্ঘোষ আর মাঝে মাঝেই মাটিতে নেমে আসছে বজ্রপাত। তার মাঝেই রাগান্বিত ড্রাগনের গর্জন শোনা যাচ্ছে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে আর তার মুখ থেকে নির্গত আগুনের তির দেখা যাচ্ছে বজ্র-বিদ্যুৎ হয়ে।

কল্পনার সেই ড্রাগনের সাথে অবশ্য ইন্দোনেশিয়ার এই ড্রাগনের পার্থক্য আছে। এটা আদতে এক সরীসৃপ। তবে বিশাল বড়ো এক জাতের সরীসৃপ।

কোমোডো ড্রাগন সম্পর্কে আমার আগ্রহও বেশ পুরানো। ইন্টারনেটবিহীন ঝলমলে শৈশবে যখন ছাপানো বইয়ের রঙিন পাতার ফাঁক গলে বিপুল বিস্ময় নিয়ে হারিয়ে যেতাম বিচিত্র সব জগতে, তখন পরিচয় হয়েছিল ময়ূখ চৌধুরী নামের এক অদ্ভুত আঁকিয়ের সাথে। সেই অল্প বয়সেই মুগ্ধ হয়েছিলাম দারুণ গতিময়, টানটান উত্তেজনায় ভরপুর, হিংস্র প্রাণীদের নিখুঁত সব ছবিতে ভরা, অসাধারণ কয়েকটা কমিকস পড়ে। বইয়ে আঁকা ছবি মনে হতো না; মনে হতো যেন সিনেমার ফ্রেম। অ্যাকশন দৃশ্যগুলো কী নিখুঁত! প্রতিটা ফ্রেমে গতির মাদকতা। তলোয়ার যুদ্ধ, লাঠি খেলা, কিংবা হাতাহাতি লড়াই, সবই একেবারে জীবন্ত। তবে তার চেয়েও বেশি জীবন্ত আর বাঙময় বন্য প্রাণীদের রেখাচিত্র। প্রতিটা নড়াচড়া, শৌর্য আর গাম্ভীর্য ফটোগ্রাফের চেয়েও খুঁতহীন। সেই তখন ময়ূখ চৌধুরীর এক কমিকস কাহিনিতে পেয়েছিলাম কোমোডো ড্রাগন নামের এক প্রাণীর কথা। আর বিস্মিত হয়ে টানটান গতিময় ছবিগুলোয় দেখেছিলাম সেই ড্রাগনের হিংস্রতার নজির।

একটু বড়ো হয়ে অবশ্য জেনেছিলাম যে কোমোডো ড্রাগন হিংস্র প্রাণী হলেও কল্পকাহিনির মতো ঠিক ততখানি হিংস্র না। তবে এটা বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো লিজার্ড; প্রায় ১০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। আর সারা পৃথিবীর মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশে একে পাওয়া যায় শুধুমাত্র ইন্দোনেশিয়ার কোমোডো, রিংকা আর পাদার নামের কয়েকটা দ্বীপে। এই কয়েকটা দ্বীপ বাইরের জগৎ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন থাকায় এরা গত ৪০ লক্ষ বছর ধরে অদ্ভুতভাবে জিনগত বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে।

কিন্তু এদের নাম ড্রাগন কেন? সুমাত্রা, জাভা, বালি, এসব দ্বীপে সে সময়ে ওলন্দাজদের রাজত্ব। স্থানীয় জেলেদের কাছে তারা জানতে পারে যে দুর্গম কয়েকটা দ্বীপে বিশাল আকারের হিংস্র এক প্রাণী ঘুরে বেড়ায়। সেটা কিছুটা কুমিরের মতো দেখতে, আবার কিছুটা ড্রাগনের মতো। চকিত বের করা তার উজ্জ্বল হলুদ রঙের জিভ দেখে মনে হয় যেন মুখ থেকে আগুন ছুঁড়ে মারছে। এরপরে তারা যখন ১৯১২ সালে কোমোডো দ্বীপে প্রথমবারের মতো দেখতে পায় বিশাল সে প্রাণীকে, তখন কোমোডো ড্রাগনের নাম ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগে না।

নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ানো পেলিক্যানের ভয়ে আমরাই তখন তটস্থ

প্রাকৃতিক পরিবেশে এই ড্রাগনকে দেখতে হলে আকাশযানে চেপে ফ্লোরেস দ্বীপে নেমে বোট নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় কোমোডো ন্যাশনাল পার্কের অন্দরমহলে। আমাদের অবশ্য সেটা করার সুযোগ হয়নি।

২

আমরা বেড়াতে এসেছি ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে। এই ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো দ্বীপরাষ্ট্র। ১৭৫০৪টা দ্বীপ নিয়ে একটামাত্র দেশ।

রেডি হয়ে সকাল সকাল সদলবলে বেরিয়ে পড়ি হোটেল থেকে। প্রথমে চলে যাই বালি বার্ড পার্কে। সেখানে বিভিন্ন জায়গায় হরেক বর্ণিল রঙের পসরা নিয়ে বড়োসড়ো ম্যাকাও পাখিরা ছবি তোলার জন্য রেডি হয়ে বসে আছে। একটু পরে দেখি, রঙিন ময়ূর, সাদা ময়ূর, মাথায় মুকুট পরা কবুতর, সবাই আমাদের আশেপাশেই গম্ভীরভাবে হেঁটেচলে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে। আমি হাতের তালুতে কিছু শস্যদানা আর কেঁচো নিয়ে দাঁড়াতেই আমার দুই হাত, ঘাড়, গলা, মাথা ভরে গেল ঝাঁকে ঝাঁকে রঙিন বহুবর্ণ লোরি পাখির ভিড়ে। আমার অসমসাহসী স্ত্রী-সন্তান অবশ্য দূর থেকে উৎসাহ দেওয়া আর নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ছবি তোলাতেই ব্যাপৃত ছিলেন। পথের পাশেই গলার নিচে বিশাল থলি নিয়ে পেলিক্যান, মুখের সামনে বিশাল ঠোঁট নিয়ে হর্নবিল, আর মাথার উপরে বিশাল ঝুঁটি নিয়ে কাকাতুয়া ঘুরছে। তাদের নির্ভয় পদচারণার মাঝে আমরাই রীতিমতো সন্ত্রস্ত।

এরপর ছেলেকে নিয়ে বের হয়ে চলে যাই পাশের রিম্বা রেপটাইল পার্কে। ঢোকার সময়ই শুনলাম যে, পার্কের মূল অংশে সংস্কারকাজের জন্য এখানকার অনেক প্রাণীকে অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বিরাটাকার কোমোডো ড্রাগনরা এখন এখানে নেই। জেনে আমরা প্রচণ্ড মর্মাহত। হেঁটে হেঁটে নানান আকার-প্রকারের সরীসৃপ দেখলাম। কিং কোবরা শো-তে লম্বা এক রাজগোখরাকে নিজ হাতে ছুঁয়ে দেখে আমার একচিলতে ছেলে হতাশ হয়ে জানাল, সাপটার বিষদাঁত নাকি খুবই ছোট্ট ছিল!

তবে দর্শনার্থীদের আগ্রহের কথা বিবেচনা করে ওখানে একটু ছোটো আকারের কিছু কোমোডো ড্রাগন রাখা ছিল। তাদের দেখেই আপাতত শখ মিটিয়েছি।

তাদের চলাফেরার মধ্যে একটা সতর্ক আর ক্ষিপ্র ভাব আছে। বয়সে আর আকারে আরো বড়ো হলে হয়তো রাজকীয় ভাবও চলে আসে। যেহেতু লিজার্ড, তাই আমাদের ঘরের দেওয়াল বেয়ে টিক টিক করে চলে বেড়ানো টিকটিকির সাথে মিল তো আছেই। তবে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ করে মাথা উঁচু করে আমাদের দিকে তাকানোর পরেই মনে হলো, সরীসৃপের শীতল দৃষ্টি হয়তো একেই বলে।

এই ড্রাগনের মূল খাবার রুসা নামের এক রকমের হরিণ। এছাড়াও অন্যান্য পশু, পাখি, অনেক কিছুই খায়। কোমোডো আর আশেপাশের দ্বীপে এই হরিণ ঘুরে

কোমোডো ড্রাগনের শীতল দৃষ্টি

বেড়ায়, আর কোমোডো ড্রাগন তাড়া করে ধরে তাদের খেয়ে ফেলে। আমাদের দেওয়ালে ঘাপটি মেরে বসে ছোটো ছোটো পোকামাকড় শিকার করে খাওয়া টিকটিকির জাতভাই আস্ত হরিণ শিকার করে খাচ্ছে, ভাবতেই আজব লাগে।

৩

পথে খানিক কেনাকাটা করে গাড়ি নিয়ে সোজা চলে গেলাম বালি দ্বীপের প্রায় উত্তরপ্রান্তে। সেখানে মাউন্ট বাতুর নামের পর্বতের পাশেই আছে কিন্তামানি ভলক্যানো আর বিশাল লেক বাতুর। এই কিন্তামানি নামের জীবন্ত আগ্নেয়গিরি ১৯৯৪ আর সর্বশেষ ২০০০ সালে অগ্নি-উদগীরণ করেছিল। তখনকার অগ্ন্যুৎপাতের লাভা পড়ে এর গায়ের অনেকখানি জায়গা এখনো কালো হয়ে আছে। ছেলে বারবার জানতে চাইছিল, আবার কখন লাভা বের হবে!! জীবন্ত আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সে কথা শুনেই তো বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। বারবার একই প্রশ্ন শুনে বিরক্ত হয়ে বলেছি, আল্লাহ আল্লাহ কর ব্যাটা!!

ঠিক কিন্তামানি আর লেক বাতুরের পাশেই পাহাড়চূড়ার এক রেস্তোরাঁয় সবাই মিলে লাঞ্চ করতে বসলাম। উচ্চতার প্রভাবেই হয়তো ঠান্ডা বাতাসের ধাক্কায় রীতিমতো শীত করছিল। তবে বালি দ্বীপে বসে বালিনিজ ফ্রাইড রাইস, গ্রিলড চিকেন ইত্যাদি খেয়ে শরীরটা গরম হয়েছে, আর বালিনিজ স্পেশাল সস দেওয়া গ্রিলড ফিশ খেয়ে বেশ একটা ভাবও এসেছে। মনোলোভা দৃশ্যাবলি সাথে নিয়ে শোঁ শোঁ ঠান্ডা বাতাসের মাঝে রয়ে-সয়ে-জিরিয়ে-ঝিমিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সেরে গেলাম ফলফলাদি খেতে।

আমাদের পেছনে কিন্তামানি ভলক্যানো আর লেক বাতুর

পাহাড়ের প্রান্তে কফি পানের চমৎকার জায়গা

সেখানে দেখি আজব এক ফল। স্তূপ করে রাখা খয়েরি রঙের সাপের চামড়ার ডিজাইনের মাঝারি আকারের ফল। দোকানের উপর থেকে থোকা থোকা কয়েকটা ঝুলেও আছে। ধরলে মনে হয় সাপের চামড়ার মতো আঁশও আছে। নামটাও সেরকম। স্কিন ফ্রুট। মানে সাপের চামড়ার ফল! স্থানীয় নাম অবশ্য সালাক। পাওয়া যায় শুধুমাত্র জাভা আর সুমাত্রা দ্বীপে। জীবনে প্রথমবারের মতো চোখে দেখলাম আর চেখেও দেখলাম। খোসা ছাড়িয়ে হলুদাভ-সাদা তিনটা কোয়াতে কামড় দিতেই অবশ্য বেশ রসালো আর খাসা স্বাদ পাওয়া গেল।

৪

এরপরে গেলাম স্থানীয় কফি প্ল্যান্টেশন দেখতে।

কফি গাছের উদ্ভব প্রাচীন আবিসিনিয়ায়, বা এখনকার ইথিওপিয়ায়। তবে কফির সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে আরব উপদ্বীপের দক্ষিণের দেশ ইয়েমেনের নাম। কারণ সেই পঞ্চদশ শতকে ইয়েমেনের লোকজন যেভাবে কফি গাছের ফলের বীজকে পুড়িয়ে গুঁড়ো করে উষ্ণ স্বাদু পানীয়তে পরিণত করত, এখনো প্রায় হুবহু একইভাবে কাজটা করা হয়। পরে এই গাছ ইউরোপে যায়। আর ঔপনিবেশিক শাসকদের মাধ্যমে পৌঁছে যায় ব্রাজিল, কলম্বিয়া আর মধ্য আমেরিকার বিভিন্ন দেশে। ঠিক সেভাবেই ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে পৌঁছে যায় ইন্দোনেশিয়া আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে।

আমরা ঝোপ আকারের কফি গাছের জঙ্গলের মাঝ বরাবর হাঁটতে থাকি। গাছে ঝুলতে দেখি কালচে লাল রঙের কফি চেরি নামের ফল। কফি প্ল্যান্টেশনে চক্কর

দেওয়া শেষ করে সেই বাগানের এক প্রান্তে চমৎকার একটা জায়গায় বসি। পাহাড়ের প্রান্তে সাজানো আসনে বসে চলে পানীয় চাখার পালা। পনেরো রকমের ভেষজ চা-কফি সাজিয়ে দেওয়া হয় সামনে। লালচে, কালচে, খয়েরি, বাদামি, স্বর্ণাভ, সবজেটে, নানান রঙের আর ঢঙের সব পানীয়। একে একে প্রায় সবগুলো চেখে দেখি। সবশেষে আলাদা রকম কাপে চেপে হাজির হয় বিশেষ এক কফি। মহার্ঘ এই কফির নাম কোপি লুয়াক বা লুয়াক কফি। লুয়াক একটা প্রাণীর নাম, যার ইংরেজি নাম এশিয়ান পাম সিভেট।

এশিয়ান পাম সিভেট নামের বিড়ালজাতীয় স্তন্যপায়ী প্রাণী কফি গাছের জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। এরা আমাদের গন্ধগোকুল বা খাটাশের জাতভাই। সারারাত সজাগ থেকে গাছে গাছে ঘুরে ঘুরে বেছে বেছে সবচেয়ে পাকা টসটসে লাল রঙের কফি চেরি বা কফি গাছের ফল খায়, আর সারাদিন ধরে ঘুমায় আর মলত্যাগ করে। সেই মলের মধ্যে পড়ে থাকে আংশিক হজম হওয়া বীজ বা কফি বিন। গাছের নিচ থেকে সেই মল সংগ্রহ করে কফি বিন খুঁজে বের করে তাকে প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি হয় বিশ্বের সবচেয়ে দামি এই কোপি লুয়াক। এই প্রাণীর পাকস্থলীর পাচক রসেই নাকি সব স্বাদ-রহস্যের গোপন কারুকাজ।

এই কফি অনেক দামি হলেও পুরো জঙ্গল ঘুরে গাছের নিচে অনেক বেশি মল খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই শুরু হলো সেই সিভেটকে বন্দি করে জোর করে বারবার কফি চেরি খাওয়ানো। বেশি বেশি খাইয়ে নিশ্চিত করা হয় বেশি বেশি মলত্যাগ, আর দামি কফির সরবরাহ।

আমি কোনো অর্থেই কফিপ্রেমিক নই, তবে দুনিয়ার অদ্ভুতুড়ে সকল খাবারদাবারের প্রতি আমার আকর্ষণ দুর্নিবার। আবার শুনলাম যে এই কফি বিন এক কেজির দাম দুইশ ডলার, আর বন্য সিভেটের মাধ্যমে পুরোপুরি প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া লুয়াক কফির বিনের কেজি পাঁচশ থেকে এক হাজার ডলার। তাই প্রস্তুতপ্রণালী শুনতে যতোই বিবমিষা জাগুক, উদগ্র আগ্রহ নিয়ে মহামূল্যবান কফিতে চুমুক দিলাম। তবে কফি পানে অভ্যস্ত নই বলেই হয়তো তিতকুটে স্বাদ তেমন সুবিধার লাগেনি।

বের হওয়ার পথে বাগানের অন্য দিকে গিয়ে দেখলাম গাছের একটু উঁচুতে বাঁধা একটা খাঁচা। সেটার ভেতরে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে কালচে বাদামি এক প্রাণী। সিভেটটাকে দেখে ভাবলাম, এর কাজই হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে খাওয়া আর বেশি বেশি মলত্যাগ করা। আর কোনো কাজ নেই তার। মনে হলো, কত অদ্ভুত রকমের চাকরিই যে আছে এই দুনিয়ায়!

আমরা ধীরে ধীরে কফি প্ল্যান্টেশন থেকে বের হয়ে আসি।

লিওপোল্ড ক্যাফে

মামুন রশিদ

সাকিনাকা জংশনে অবস্থিত হোটেল পেনিনসুলা থেকে দুপুরের খাবার সেরে বের হলাম গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার উদ্দেশে। ট্যাক্সি করে সমুদ্রের ধারে মেরিন ড্রাইভ হয়ে মূল গন্তব্য কোলাবার দিকে যেতে থাকলাম। রাস্তার দুপাশে ছিল সারি সারি দৃষ্টিনন্দন ফ্ল্যাটবাড়ি এবং আধুনিক বাণিজ্যিক ভবন। যদিও আমার ট্যাক্সি চালক বলেছিলেন ৫০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে, কিন্তু মুম্বাইয়ের ট্রাফিককে উপেক্ষা করে অবাক করার মতোভাবে আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম।

চোখের সামনে উদ্ভাসিত হলো বিশাল আকৃতির স্থাপনা — গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া। এটি নির্মিত হয়েছিল রাজা পঞ্চম জর্জ ও রানি মেরির আগমনের স্মরণে। এই স্থাপত্য উপমহাদেশীয়, মুসলিম এবং ইউরোপীয় স্থাপত্যশৈলীর এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। এর

সামনে-প্রান্তে এবং পেছনে ছিল হাজার হাজার দর্শনার্থী। প্রায় ১০০ ফুট উচ্চতার এই কাঠামোয় আছে চারটি মিনার এবং একটি মাঝখানে বিশাল গম্বুজ, যা আমার ধারণায় প্রায় ৫০ ফুট উঁচু। চারিদিকে হাজারো মানুষ, আর তার থেকেও বেশি কবুতর! শুনেছি প্রতিদিন প্রায় ২০-৩০ হাজার মানুষ এখানে ঘুরতে আসে।

গেটওয়ের এক পাশে আরব সাগর, আর অন্য পাশে বিখ্যাত তাজ হোটেল এবং তার সঙ্গে সুউচ্চ টাওয়ার বিল্ডিং। আরেক পাশে রয়েছে জেটি বা জাহাজঘাট, যেখান থেকে ফেরি বা নানানধরনের নৌযানে সহজেই এলিফ্যান্টা কেভ যাওয়া যায়।

বিকালের প্রচণ্ড গরমে আশেপাশে কিছুটা ঘুরলাম। তাজ হোটেল ও তার টাওয়ার বিল্ডিংয়ের পাশে গেটওয়ের কাছেই অনেক ধরনের নৌযান, ডাবল ডেকার ফেরি এবং যান্ত্রিক বাহন পর্যটকদের নিয়ে যাতায়াত করছে। আশেপাশে প্রচুর দর্শনার্থী—কেউ কেউ রেলিংয়ে বসে দৃষ্টিনন্দন পরিবেশ উপভোগ করছে, কেউ আবার অলস সময় কাটাচ্ছে, অনেকে মোবাইল দিয়ে সেলফি তুলছে। শুনেছি রাতে এই গেটওয়ে এবং তাজ হোটেল আলোকসজ্জায় সজ্জিত হয়, কিন্তু আমার পক্ষে এত রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না।

প্রায় এক ঘণ্টা ঘোরাঘুরি করে এলিফ্যান্টা কেভে যাওয়ার আকর্ষণকে উপেক্ষা করে আমি লিওপোল্ড ক্যাফের উদ্দেশে হাঁটা শুরু করলাম। তাজ হোটেলের পাশের রাস্তা ধরে, কোলাবা ও রিগ্যাল সিনেমা হলের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে থাকলাম। পুরো পথটাই জমজমাট এক বাজারের রাস্তা, যেখানে রয়েছে নানা ধরনের বুটিক, বইয়ের দোকান এবং বিভিন্ন পণ্যের পসরা। এই এলাকাটি পর্যটক ও স্থানীয়দের কাছে সমানভাবে জনপ্রিয়। এখানে ঐতিহাসিক স্থাপত্যের পাশাপাশি রয়েছে অসংখ্য খাবারের দোকান, যা এলাকাটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

তাজ হোটেলের পাশের রাস্তা, কোলাবা- শাহিদ ভগত সিং রোড (আগের নাম ছিল কলাবা কজওয়ে) আর রিগ্যাল সিনেমা হলের পাশ দিয়ে আমি ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম। পুরো পথটাই জমজমাট বাজারের রাস্তা, যেখানে নানা রকম বুটিক, বইয়ের দোকান আর বিভিন্ন পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসে আছে। এই এলাকাটি পর্যটকদের এবং স্থানীয়দের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই এলাকায় ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের পাশাপাশি রয়েছে নানা ধরনের খাবারের দোকান। গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া থেকে এর দূরত্ব হবে আধা মাইলের মতো, আর প্রায় ১৫ মিনিট হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম লিওপোল্ড ক্যাফেতে।

লিওপোল্ড ক্যাফে মূলত পার্সি ইন্ডিয়ানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম দিককার ক্যাফেগুলোর একটি। এটি ১৮৭১ সালে প্রথমে একটি তেলের দোকান হিসেবে শুরু হয়, পরে এটি একটি জনপ্রিয় ক্যাফেতে রূপান্তরিত হয়। এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম তা একটি পারিবারিক ব্যবসা হিসেবে পরিচালিত হয়েছে। একসময় এটি ছিল

বিদেশি জাহাজের নাবিক, খালাসি এবং বন্দরের শ্রমিকদের জন্য স্বল্পমূল্যের খাবার ও পানীয়ের একটি জনপ্রিয় জায়গা। বন্দরের খুব কাছে হওয়ায় এটি দ্রুত কর্মজীবী মানুষের ক্যাফে হিসেবে খ্যাতি পায়। মূল প্রতিষ্ঠাতাদের নামগুলো বিস্তৃতভাবে নথিভুক্ত না হলেও, মালিকানা ইরানি সম্প্রদায়ের মধ্যেই থেকে যায় এবং তারা ক্যাফেটির পার্সিয়ান আতিথেয়তা ও মুম্বাইয়ের রাস্তার সংস্কৃতির মিশ্রণে অনন্য চরিত্র বজায় রেখেছেন।

ক্যাফেতে ঢুকতেই চোখে পড়ল প্রতিটি টেবিল ভর্তি—চারপাশে খাবারের মনোহর গন্ধ। আশেপাশে তাকিয়ে দেখলাম বেশিরভাগই বিদেশি অতিথি। কেউ খাবারের সঙ্গে বিয়ার খাচ্ছে, আবার কেউ ভারী পানীয় উপভোগ করছে।

হাতে মেনু নিয়ে দেখলাম—ভারতীয়, ইতালিয়ান, চাইনিজ এবং কনটিনেন্টালসহ নানা ধরনের খাবারের বিশাল সংগ্রহ, যার মধ্যে জনপ্রিয় পার্সি খাবারও রয়েছে। মোট প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ আইটেম। রেস্টুরেন্টটির অভ্যন্তরভাগ বেশ খোলামেলা, ঔপনিবেশিক স্টাইলে উঁচু ছাদ, কলাম, ধীরগতির সিলিং ফ্যান পরিবেশটাকে আরামদায়ক করে তুলেছে। ক্যাফের দেয়ালে দেখা যায় পুরনো দিনের ছবি, মোটরবাইকের নামফলক ও নানা স্মারক—যা একদিকে ইতিহাস, অন্যদিকে সাহস ও আশার প্রতীক। ওপরের একটি তলায় পরিবারদের জন্য একটু নিরিবিলি বসার ব্যবস্থা রয়েছে।

একজন ওয়েটারের সঙ্গে কথা বলার সময় জানতে চাইলাম কখন ভিড় তুলনামূলক কম থাকে। তিনি জানালেন, "সকালে ৭টার দিকেই একটু ফাঁকা থাকে, না হলে সারাদিনই এভাবেই জমজমাট থাকে। প্রতিদিন দুই শিফটে কাজ করি—সকালে আর বিকেলে। কথার ফাঁকে বোঝা গেল, এদের পরিবেশনায় রয়েছে প্রচণ্ড পেশাদারিত্বের ছাপ।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করলাম, বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষদের উচ্চস্বরে আলাপচারিতা চলছে, কিন্তু প্রায় কারোরই মোবাইল বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারে আগ্রহ নেই। সবাই যেন সময় উপভোগ করছে, কারো কোনো তাড়া নেই।

আমি অর্ডার দিলাম—জনপ্রিয় পার্সি খাবার খিমা পাও, মাটন কাটলেট এবং বেরি পুলাও। যদিও খাবারের দাম তুলনামূলক বেশি, প্রতিটি আইটেমই ৫০০-৬০০ রুপির নিচে নয়, তবে স্বাদ ও পরিমাণে একেবারে সন্তোষজনক।

২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতের মুম্বাই শহরে ঘটে যায় ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা, যা '২৬/১১ মুম্বাই হামলা' নামে পরিচিত। এই সন্ত্রাসী হামলার প্রথম লক্ষ্যবস্তুগুলোর একটি ছিল লিওপোল্ড ক্যাফে। সন্ধ্যা প্রায় ৯টার দিকে দুইজন সন্ত্রাসী ক্যাফেতে ঢুকে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। সে সময় ক্যাফেটি দেশি-বিদেশি পর্যটকে পরিপূর্ণ ছিল, এবং মুহূর্তের মধ্যেই চারপাশে

আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই বর্বর হামলায় দুইজন কর্মচারীসহ প্রায় ১০ জন নিহত হন এবং বহু মানুষ আহত হন।

গুলির ক্ষতচিহ্ন আজও ক্যাফের দেয়াল, ছাদ এবং মেঝেতে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান, যা সেই বিভীষিকাময় রাতের নীরব সাক্ষী হয়ে রয়েছে। হামলার পর চারদিন ক্যাফেটি বন্ধ রাখা হয়। তবে আশ্চর্যের বিষয়, শহরের সাহস, পুনর্জাগরণ ও প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে লিওপোল্ড খুব দ্রুত আবার চালু হয়। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বাইরে, লিওপোল্ড ক্যাফে আন্তর্জাতিকভাবে আরও পরিচিতি পায় গ্রেগরি ডেভিড রবার্টসের ২০০৩ সালে প্রকাশিত বিখ্যাত উপন্যাস শান্তারাম-এর মাধ্যমে। উপন্যাসে ক্যাফেটিকে প্রধান চরিত্রদের মিলনস্থল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা পাঠকদের বাস্তব অভিজ্ঞতা নিতে অনুপ্রাণিত করে। ফলস্বরূপ, এই স্থানটি আজ শুধু খাবার খাওয়ার একটি জায়গা নয়, বরং ইতিহাস, সাহস, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের এক অনন্য মিলনস্থল হয়ে উঠেছেড়্যা সারা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের কাছে এক 'মাস্ট ভিজিট' গন্তব্য।

ফুটনোট:

লিওপোল্ড ক্যাফের একটি শাখা একসময় আমাদের চট্টগ্রাম বন্দরেও ছিল। আমরা আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়েছি। সেই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবেই অতীতের সেই গৌরবময় স্মৃতি আজ হারিয়ে গেছে। এখন এই তথ্য আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

চিলিওয়াক: কানাডার বনগহীন

মাহমুদ হাফিজ

ঘুম ভেঙেই শুনি পাহাড়ি স্রোতস্বিনীর কলধ্বনি। আবিষ্কার করি শুয়ে আছি ঘনবন আর পাহাড়ি নির্জনতায়। দূরাগত নদীর নিরন্তর কলতানই শুধু কানে আসছে। ভাবি, আমি এখানে কেন?

সংকীর্ণ কেবিনের বাংকবেড থেকে নেমে বাইরে আসি। পাশেই বইছে পাহাড়ি কঙ্করময় নদী। চারদিকে ঘন বন। এতোক্ষণে সূর্য ওঠার কথা থাকলেও আকাশছোঁয়া পাইনবৃক্ষের ঘনত্ব ভেদ করে আলো এখনও বুনো নির্জনতায় পৌঁছেনি। বরফাচ্ছাদিত পর্বত শীর্ষে ঠিকই আগুয়ান রোদের ঝিলিক।

গত কয়েকদিন মাথায় জমে থাকা অজস্র স্মৃতির ভীঁড় রিফ্রেশ করে ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করি। পূর্বরাতে নদী কিনারে ক্যাম্পফায়ার শেষে মধ্যরাতে

ফিরেছি। অন্ধকারে নিজ নিজ বিছানা হাতড়ে চারজনের দলের সবাই কোনরকম চোখ বুঁজেছি। চারের তিনজনই প্রকৌশলী, কারিগর ও ভাষা শিক্ষক। আমিই কেবল সংবাদ ও তথ্যের কারবারি। যোগাযোগজালের পেশাদার হয়ে গভীর পাহাড়ি জঙ্গলে নেটওয়ার্কবিহীন জীবন অনেকটা দুঃস্বপ্নের। সেটাই এখন বাস্তব। চোখ থেকে ঘুমের ঘোর যতো সরতে থাকে, সময় ও ভ্রমণের ঘটনাবহুল পরম্পরা পিছনে সরে বনবিজনে আমার অবস্থানের শানেনুজুল ততোই স্পষ্ট করে তোলে। নদীতীরের বেঞ্চে বসি। মস্তিস্কের স্মৃতি ফ্ল্যাশব্যাক হলে আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

কানাডার ভ্যাঙ্কুর ভ্রমণে এসে পূর্বপরিচিত বন্ধুদের সঙ্গে শহরের বাইরে যাত্রা শুরুর কথা মনে পড়ে। সেই্ দুর্গম জনপদের নাম চিলিওয়াক। চিলিওয়াক নিকটস্থ দূরপাহাড়ের গেটওয়ে মাত্র। আসলে চলে এসেছি কানাডিয়ান নর্দার্ন ক্যাসকেড রেঞ্জের গভীরে। এখানে কোন জনবসতি নেই, বিদ্যুৎ ও পানি নেই। নেই দূর আলাপের যোগাযোগ। পর্বতময় বন ও ঝরনাবহুল ঝরা ও পাহাড়ি নদীই এখানে পুরো প্রকৃতিতে কর্তৃত্ব করছে। কেউ এর নাম দিয়েছে তামিহি। এই নামেই ক্রিক, বন, ক্যাম্পগ্রাউন্ড, বুনোপথ বা ট্রেইল। কোলাহলমুখর শহুরে কংক্রিটের জীবন থেকে মানুষ কখনো কখনো নির্জনতালোভী হয়। এরাই কষ্টসৃষ্টে চিলিওয়াকে এসে পৌঁছায়। এরপর ট্রেকিং, হাইকিং,পাহাড়ি কাঁচা সড়কে গাড়িতে পৌঁছে যায় গভীর জঙ্গলে। ওয়াকিং, রানিং, এ্যাঙলিং, রিভার রাফটিং, ক্যাম্পিংসহ নানা এ্যাডভেঞ্চারের জন্য তামিহি রোমাঞ্চপ্রিয় পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্র।

কানাডা- আমেরিকার নানা প্রান্ত থেকে আমাদের পূর্বপরিচিত লেখক, সাংবাদিক, প্রকৌশলী,পাইলট, সঙ্গীতশিল্পী, স্পোর্টসম্যানরা এসে পৌঁচেছে তামিহি এলাকায়। এরা পাহাড়ে হন্টনের পর গাইবে জীবনজাগানিয়া কোরাস। বসবে ক্যাম্পিং, ক্যাম্প ফায়ার, হবে রিভার রাফটিং। আমাদের প্রত্যাশাই বুনো নির্জনতা। আমি তথ্যকারবারি বলে নেটওয়ার্কপ্রিয়। এই বুনো নির্জনতায় নেটওয়ার্কহীন জীবন কেমন সে অভিজ্ঞতা নিতেও এমুখো হয়েছি।

সকালে বন্ধু উইলের অন্টারিও স্ট্রিটের বাসা থেকে তার সঙ্গে গাড়িতে বের হই। ডাউনটাউন থেকে আরেক বন্ধু হার্লি মিলসকে এবং পাশের তারকা হোটেল থেকে সান্দিয়াগোর রংজনকে তুলে নেয় উইল। দুই কানাডিয়ান উইল আর হার্লি, আমেরিকানা রংজন আর আমি একই নৌকার যাত্রী। চিলিওয়াকগামী অন্যরা যখন ক্যাম্পিংয়ে থাকবে, আমরা তখন থাকার পরিকল্পনা তামিহি মিডোজের বনবিজনের কেবিনে।

কেবিনবাসীগণ

জানা ছিল এটা রাস্টিক কেবিন। বেড আর ম্যাট্রেস ছাড়া কিছু নেই। বুকিংকালে বেডশিট, পিলো আর ব্লাংকেট নিয়ে যেতে বলা হয়েছিল। বিগত সন্ধ্যায় বুনোপথে প্রবেশের সময় আমাদের কেবিনে চেক ইন করার জন্য মহিলা ম্যানেজার এমন নির্দেশনা দিল যে, গাড়ি চালানোয় উইলের দক্ষ হাতও কেঁপে গেল আধঘণ্টা বিভ্রান্তিকর ঘোরার পর। হেডলাইটের আলো দূরে ফেলে বনপথের কাঁচা রাস্তায় আমরা এদিকে সেদিক ঘুরে লাচার হই। ক্যাম্পগ্রাউন্ড,পরিত্যক্ত রেসিডেন্টাল ভেহিকেল, ঘোড়ার আস্তাবল আর নির্মানাধীন কেবিনের মতো আস্তানা দেখি। ওয়েবসাইটে ছবি দেখে বুকিংকৃত আমাদের সে কেবিন আর খুঁজে পাই না। নির্জন বুনোপথে অন্তত আধঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে আমরা আবার ফিরে আসি তামিহি মিডোজের প্রবেশতোরণে। প্রবেশ তোরণ বলতে বনপথের এক জায়গায় বাঁশ আকৃতির লৌহদণ্ডে রাস্তা বন্ধ করে রাখা। পাশে পরিত্যক্ত রেসিডেন্টাল ভেহিকেলের দেয়ালে লেখা: অনধিকার প্রবেশকারী বন্দুকনলের নিশানাযোগ্য। তোরণমুখের অদুরে ডেরায় গিয়ে ম্যানেজারকে জানালে, সে আবার পথ বাতলায়। মিনিট পনেরো গাড়ি চালিয়ে আমরা বনের আরও গভীরে যাই। পথের শেষে দেখতে পাই পর পর তিনটি কেবিন। অবস্থান তোরণ থেকে দূরে, নদীর কিনারে, জেমস নামের পুকুর সংলগ্ন দুর্গম বনে। লতাগুল্মে ভরা প্রাঙ্গণ, প্রকাণ্ড সব বৃক্ষ আচ্ছাদিত চারপাশ। মাঝের কেবিনটির নম্বর ২, নাম- রডফাদার্স। আমি গডফাদার্স উচ্চারণ করেছিলাম-ভ্রমণসঙ্গী হার্লি শুধরে দেয়।

ক্যাম্প ফায়ার

বারান্দার পর ছোট্ট একটি কক্ষ। একটি আটপৌরে সোফা ও গোলাকার টেবিল। সামনেই ছোট্ট পরিসরের মাঝখানে বোর্ড দিয়ে বিভাজন দুটি কক্ষের আদল দেয়া। দরজা নেই। বিভাজিকার মুখে দুটি লম্বা কাপড় ঝোলানো। পিছন দিকে বিভাজিত কক্ষেই দুটি জানালা, সাদামাটা কাপড়ের পর্দা ঝোলানো। বারান্দার সিঁড়ির নিচে লোহার চুলা। চারপাশেই জঙ্গলাকীর্ণ। প্রাকৃতিক কর্ম সেখানে সেরে নেয়ার উৎসাহই দেয়া হয়ে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে। তবে তিন কেবিনের অন্তত ১২ অতিথির জন্য বনপ্রান্তে একটি মোবাইল টয়লেটের দেখা মেলে। সেখানে পানির ব্যবস্থা নেই। টয়লেটে পেপার দিয়ে কর্মসম্পাদন করা হলে পলিব্যাগে ভরে তা সঙ্গে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। আবর্জনা ফেলে গেলে মোটা অর্থদণ্ডের হুশিয়ারি।

বারন্দায় উঠে কেবিনঘরে উঁকি মেরেই সম্বিত ফেরে চারজনের। ক্যাম্পিং ল্যাম্প আনিনি। এন্তেজামের দায়িত্ব ছিল উইলের ওপর। কাউবয় শহরখ্যাত আলবার্টা প্রদেশের ভূমিপুত্র উইল হয়তো ভুলে গেছে। কারিগরি হাতে সে মাথার ওপরে লাগানো বৈদ্যুতিক বাতি ঘাটাঘাটি করে আলো জ্বালাতে চেষ্টা করলো, কিন্তু ব্যর্থ। আহা, আমার দেশের জোনাক পোকাদের এখানে এই বুনো রাতে বড় প্রয়োজন !

মোবাইল পর্দার হালকা আলোয় আমরা রাত গুজরানে বিছানা এন্তেজাম করতে থাকি। অনন্ত অন্ধকারে বুনো নির্জনতার গাম্ভীর্য যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

দূরাগত নদীতরঙ্গের নিরন্তর নৈঃশব্দের মধ্যে যেন অন্তর্সঙ্গীত। দিনের আলোয় আকাশনীলের নিচে বিস্তৃত সবুজ পটভূমিতে তরঙ্গমালার ফেনায়িত সফেদ এঁকে রাখে রঙের বৈপরীত্য। দিনে বিপুল দৃশ্যভোজন, রাতে নির্জনতাকে আমরা পয়সা দিয়ে কিনতে এসেছি। তার মাথার নিউরণে স্মৃতি হিসাবে ভরে নিয়ে যেতে চাই।

আমাদের কণ্ঠ নিম্ন থেকে আরও নিম্নস্তরে পৌঁছে। অন্ধকারে একে অন্যের কথা সাইসুই শব্দ হয়ে কানে পৌঁছে।

: পাশের কেবিনে লোক আছে, উই শ্যুড রেস্পেক্ট দেম।

: ইয়েস, ইতোমধ্যে তাদের ঘুমিয়ে পড়ার কথা।

: আমাদের কারো কাছে কি হেডল্যাম্প আছে?

: আছে, ব্যাটারির চার্জ শেষ!

: উপায় কী! আমরা মোবাইলে স্ক্রিনের আলোতে বিছানা ঠিক করে নিতে পারি।

: ওকে, হার্লি ইউ আর টল, ইউ ক্যান টেক ডাবল বেড

দিনের আলোয় রডফাদার্স কেবিন

তামিহি বনের সর্বত্রই পাহাড় থেকে নেমে আসা এরকম ঝরা

: আই এ্যাম টেকিং আপার ওয়ান অব টু বাংক বেড

: ওকে, উইল, আর ইউ গোনা টেক লোয়ার ওয়ান?

: আই উইল স্লীপ ইন স্লিপিং ব্যাগ। সো আই'ম মেকিং দ্য সোফা ইন টু আ বেড।

গাড়ির বনেটের লটবহর থেকে নিজ নিজ বালিশ, শীট ও ব্লাংকেট এনে বিছিয়ে নিই। হার্লি বলে- প্রকৃতির ডাকে উঠলেও আমরা যেন আস্তে আস্তে দরজা খুলি, রংঝনের ঘুম যেন না ভাঙে। রংজন বলে ওঠে, স্লিপিং ব্যাগে ঘুমিয়ে গেলে আমার আর ঘুম ভাঙে না।

ভরজীবন সাংবাদিকতার অভ্যেস অনুসারে ভ্রমণকালে সঙ্গীরা ঘুমিয়ে গেলে আমি কম্পিউটার খুলে বসি। সারা দুনিয়া হাতের মুঠোয় নিয়ে শুরু করি তথ্যের কারবার। ফিচার লিখি, সংবাদ লিখি, নেপথ্য কাহিনি লিখি, মেইল করি ঢাকায়। এখানে কিসের কী! বিদ্যুৎ নেই, পানি নেই, নেটওয়ার্ক নেই। আছে শুধু অবারিত প্রকৃতির সান্নিধ্য।

তিন ভ্রমণসঙ্গী এখন আরামে ঘুমাচ্ছে। আমি আশপাশের বুনোপথ, জেমস পন্ড পুকুর, বনের লতাগুল্ম, ফুল আর আকাশমুখী বৃক্ষ দেখে পুলকিতমনে নদীতীরের বেঞ্চে বসেছি। ভ্রমণে আমার এই এক অভ্যসে। যতো রাতেই ঘুমানো হোক, আল্লাহর নামে শুরু করে নিরিবিলি সকালটি নিজের মতো কাটাই। তা সে বাংলাদেশের চিলাহাটি হোক আর কানাডার চিলিওয়াক। অন্যরা জেগে যাওয়ার আগে এখন সেটাই করছি।

কিছুক্ষণ বাদে একে একে সবার ঘুম ভাঙে। উইল পোর্টেবল চুলায় গ্যাস চার্জ করে নাস্তার জোগাড়-জন্ত করে। তিনজনের নাস্তা তৈরি আর পানের জন্য পর্যাপ্ত পানি নেই। এই বিজনে টিকে তো থাকতে হবে! হার্লি পানির খালি বোতলগুলো জড়ো করে বলে আমি পানির খোঁজে বেরুচ্ছি। উইল আমাকে বলে তুমিও সঙ্গে যাও। ডিস্কোভারি চ্যানেলের 'ম্যানস ভার্সেস ওয়াইল্ড'সিরিজের মাইকেল গ্রিলসের মতো বনপাহাড়ে ঘুরলে ফিচার ও স্টোরি জমাতে পারবে। রংজন প্রাত:কফির স্বাদ বাড়াতে আইরিশ ক্রিম বেলিজ হাতে ঝিম মেরে বসে আছে, এখন কফির গরম কাপ তার হাতে আসেনি। আমি কালবিলম্ব না করে আরও দুটি খালি বোতল নিয়ে হার্লিকে অনুসরণ করি।

তামিহি ফরেস্ট ও ক্রিকের নানা জায়গা থেকে ঝরনা নিম্নগামী হয়ে চিলিওয়াক নদীর সৃষ্টি করেছে। রাফটিং, মৎস্যশিকারীদের আনোগানা ও ডিম পাড়তে উজানে ওঠা শ্যামনের আত্মাহুতিতে নদীর পানির চেয়ে ঝরনার জল ভালো। আমাদের আগ্রহ মানবীয় স্পর্শহীন ঝরনার জল। পানির খোঁজে দু'জন গহীন অরণ্যপথে ইতিউতি ঘুরি। উৎকর্ণ হই বনের কোন গহীন থেকে ঝরনার শব্দ আসে কী না। কয়েক জায়গায় এই শব্দ শুনে সেদিকে যাই, কিন্তু বিস্তর পাথর কেটে লাফিয়ে নামা ঝরনা থেকে পানি সংগ্রহযোগ্য নয়। আমরা সুবিধাজনক ঝরনার ঢাল খুঁজতে থাকি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তামিহি ক্রিকের এক জায়গায় পেয়ে যাই। দেখি পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে পাথুরে ঘর্ষণে নেমে আসা পানি স্ফটিকস্বচ্ছ রূপ নিয়েছে। লম্বা পাইন সারির ভিতরে দিয়ে ঠিকরে আসা সকালের সূর্যকিরণে তা মায়াময় সৌন্দর্য তৈরি করেছে। দু'জন সে পানি পান করে দেখি তা স্বাদু ও মিঠা। জীবনে এতো সুস্বাদু ও সহনীয় তাপমাত্রার প্রাকৃতিক পানি পান করেছি কী না সন্দেহ। আকাশের দিকে মুখ করে দু'জনই সমস্বরে শুকরিয়া উচ্চারণ করি। শুকরিয়া শব্দটি কানাডিয়ায় জন্ম নেয়া হার্লিই বলে ওঠে আগে। ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দি, উর্দু বা মুসলিমদের ভাষা থেকে শুকরিয়া শব্দটি সে রপ্ত করেছে।

পানি নিয়ে আমাদের ফেরা দেখে চুলার সামনে দাঁড়ানো উইলের চোখ চমকিত হয়। উইলের ক্যারিশমায় আমাদের ক্যাম্প কফির পেয়ালাগুলো পরক্ষণেই গরম হয়ে ওঠে।

দুই

পাহাড়ে হন্টনশেষে ক্যাম্প লাভাররা তামিহি ক্যাম্পগ্রাউন্ডে তাঁবু ফেলেছে। পরদিন রাফটিং আগ্রহীরা নদীতীরে তাঁবু ফেলে দিনের আলোর জন্য অপেক্ষা করছে। আমরা চারজন নানা জায়গার বলে অঙ্গীকার করেছি আলোহীন কেবিনজীবন। রাতে আবার ডাক পড়লে সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে জড়ো হই নদীতীরের বুনো ক্যাম্প ফায়ার স্পটে। আগুনে ঝলসানো খাবার খাওয়ার অভিনব আয়োজন। আমার মতো সমতলপুত্রের কাছে আনকোরা ও উপভোগ্য। ফিরে যাই আদিম পাথুরে যুগে। নিউজিল্যান্ডের এ্যামি ম্যাকমুলান, আইসব্রেকার জিসপার্ট, বার্নাবে'র পাইলন, কোকুইটলামের গ্রেইমি, ভিক্টোরিয়ার ডেক্সুস, সানসাইন দ্বীপের বেভার দম্পতি, ডাগ কেইর, সিয়াটলের চার্লস, হেয়ারিকপ্টার ও আমরা চার কেবিনবাসী আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসে গল্প আড্ডায় জমিয়ে তুলি ক্যাম্প ফায়ার। গ্রেইমি ও এ্যামি ঝলসানো বীফের সঙ্গে লম্বা বান যোগ করে বার্গার বানাতে থাকে। পাইলন জাম্বিল থেকে বের করে সরিষার সস। নিজ নিজ জীবনের বিব্রতকর মুহূর্তের গল্প বলে সবাই স্মৃতিকাতর হয়ে ওঠে। আমার গল্প শুনে ব্যাংলাদেশ ব্যাংলাদেশ শব্দে মুখর করে তোলে অন্যরা। কৃত্রিম রাগত: স্বরে বলি, তোমরা শুধু 'ব্যাং ব্যাং'করো, আমরা বলি বাংলাদেশ। সবাই বলো বাং বাং-বাংলাদেশ।

উন্মুক্ত আকাশের নিচে আগুন ঘিরে যেন বসে যায় শুদ্ধ করে বাংলাদেশ বলার ক্লাশ।

আগুনের লেলিহান মধ্যরাতে উর্ধ্বগামী হয়ে আকাশস্পর্শী হতে চাচ্ছে। চারপাশ আমাদের কোলাহল ক্রমশ থেমে যতো নৈঃশব্দের দিকে যায়, নদীতরঙ্গের কথা ততোই সশব্দ হয়ে ওঠে! সেই শব্দকথার অন্তর্ভেদী রহস্য বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ !!

আমাজনে বৃষ্টিবনে

রওনক আফরোজ

পাকা রাস্তা, হাইওয়ে যেমন হয়। রাস্তার দু'দিকে চেনা-অচেনা, ছোট-বড় প্রচুর গাছ। গাড়ি চলছে, ঝকঝকে টয়োটার মিনিভ্যান, এরসাথে চলছে আমার ননস্টপ প্রশ্ন; এটা কী গাছ, ওটা কী, আমগাছ নাই? ব্র্যাজিল নাট কই.... উত্তর দিতে ড্রাইভারকেও ননস্টপ কথা বলতে হচ্ছে। পেছনে আমার ভ্রমণসঙ্গীরা দীর্ঘ পথযাত্রায় সম্ভবত ক্লান্ত, তাই চুপচাপ। আমিও ক্লান্ত কিন্তু আমার কথা বলতে ভালো লাগছিলো। আমি খুব বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলাম, ড্রাইভার মিল্টন, আমাদের ট্যুর কোম্পানির মালিকও তিনি; নিজস্ব উচ্চারণে অনর্গল চমৎকার ইংরেজি বলছে। ব্রিটিশঘেঁষা উচ্চারণ, পারফেক্ট না হলেও প্রায়বিশুদ্ধ গ্রামার এবং শক্তিশালী শব্দভাণ্ডার। যাক, আজ গুগুল অনুবাদের ছুটি! গতরাতে হোটেলে ভাষা পার্থক্যের কারণে যে ক্লান্তিকর অবস্থায় পড়েছিলাম সেটা মনে

করে এখন একটু স্বস্তি পেলাম। ফ্রন্ট ডেস্কের তরুণী মেয়েটা একবর্ণ ইংরাজি জানে না। সে আমাদেরকে খাওয়ার পানির সন্ধানটাও দিতে পারেনি। পরে লবিতে রাখা ভেন্ডিং মেশিন থেকে পানির বোতল বের করে দেখালে সে বুঝেছিল।

ওয়াশিংটন ডিসি থেকে পানামা সিটি প্লেনে ৫ ঘণ্টা ২০মিনিট, পানামা সিটি থেকে মানাউস ৪ ঘণ্টা ননস্টপ ফ্লাইট। পানামা সিটিতে দীর্ঘ যাত্রা বিরতির সুযোগে সিটি দর্শনটা চমৎকার ছিল। তবে, এটা ছাড়া সারাটা সময় ঘুম অথবা ঘোরে কেটেছে। জাগরণে ছিলাম সামান্যই। ডিসি এয়ারপোর্ট থেকে এ পর্যন্ত বিরতিসহ ২৪ ঘণ্টার পথ। তারও আগে বাসা থেকে ৬ ঘণ্টা নিজ ড্রাইভ করে গাড়ি বন্ধুর বাসায় রেখে পরের ১ ঘণ্টার রাস্তা উবারে এসেছি।

যাহোক, প্লেনের পাইলট যখন মানাউসে স্বাগত জানালো তখন স্থানীয় সময় ভোর তিনটা চল্লিশ। বাইরে তাপমাত্রা ৭১ ডিগ্রি ফারেনহাইট। ৩০ শে ডিসেম্বর, শনিবার। আমরা ৪ জন একমত হলাম যে, যেহেতু সকাল ৮টায় ট্যুর গাইড আমাদের পিকআপ করবে, হোটেলে পৌঁছে আমরা সবাই একটু ঘুম/ বিশ্রামের চেষ্টা করবো, যেটুকু সময় পাওয়া যায় আরকি!

পানামা সিটিতে ১৫ ঘণ্টার যাত্রা বিরতি নিয়েছিলাম। এখানে গুগুল ট্রান্সলেশনের ভরসায় মেট্রো, বাস, ট্যাক্সি করে সারাদিন ঘুরে আমি তখন এই অ্যাপ ব্যবহারে ওস্তাদ। মানে, কচুবনে শিয়াল রাজা আরকি! ফলে ট্যাক্সি ডাকা ইত্যাদি দায়িত্ব আমার ওপরে পড়লো। তো ফোন বাগিয়ে গুগুলকে ধরে এয়ারপোর্টের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের মেয়েটার সাথে ফোনে পর্তুগিজ আর ইংরেজি চালাচালির পরে মেয়েটা একটা রিসিপ্ট দিল। সেটা হাতে বাইরে বের হতেই ট্যাক্সি চালকরা চারিদিক থেকে ঘিরে ধরলো। এরপরে ওরা নিজেদের মধ্যে কীসব বলাবলি করে । এরপর একটু লিডার টাইপের এক ড্রাইভার এগিয়ে এসে এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলের ভাড়া যা চাইলো সেটা আমার গবেষণায় প্রাপ্ত সম্ভাব্য ভাড়ার চেয়ে অনেকটাই বেশি। নোপ, তা কেন দেবো? তাহলে রাত জেগে, দিন জেগে এত রিসার্চ করে কী লাভ? আর সবাই জানে, অধিকাংশ এয়ারপোর্টে ট্যাক্সি চালকরা ট্যুরিস্টদের ঠকানোর চেষ্টা করে। অনেক বছর আগে একবার কোলকাতা এয়ারপোর্টে ট্যাক্সিচালক আমার কাছে এত বেশি ভাড়া চেয়েছিলো যে পাশ থেকে শুনতে পেয়ে একজন পুলিশের বিবেকে মনে হয় খুব লেগেছিলো। তিনি ট্যাক্সিচালককে শুধু ধমক দেয়া না, একটা চড়ও বসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, যা দিদিকে বিস রূপিতে ঠিকঠাক মতো পৌঁছে দিয়ে আয়। এই গল্পটা আমি সুযোগ পেলেই করি। তবে, সময় মতো ওমন পুলিশ তো সব জায়গায় থাকে না। এখন উবার এসে অনেক সুবিধা হয়েছে। দর কষাকষির সুযোগ নাই। তবে উবার ডাকতে হলে ওয়াই-ফাই অথবা ফোনে ডেটা

আমাজনের ভাসমান বাড়ি

লাগবে। আমি ই-সিম চালু করে উবার ডাকতে উদ্যত হলে আমাদের ঘিরে ধরা ট্যাক্সিচালকরা একসাথে বলে উঠলো, উবার মানাউসে, বিশেষ করে এয়ারপোর্টে নাকি অবৈধ। আমি ততক্ষণে উবার ডেকে ফেলেছি। তার মানে, উবার এই শহরে আছে কিন্তু প্রাইভেট ট্যাক্সি ড্রাইভারদের সিন্ডিকেট ইন একশন! ওরা এয়ারপোর্টে ঢুকতে পারবে না।

সৌভাগ্যবশত উবার ড্রাইভার সামান্য ইংরাজি জানতো। কথা সত্যি, সে এয়ারপোর্টের পিকআপ পয়েন্টে এলো না। আমরা উবারচালকের ডিরেকশন মতো রাস্তা ক্রস করে এয়ারপোর্টের লংটার্ম গ্যারাজে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। আর এতসব করতে গিয়ে আমাদের মূল্যবান সময়ের অনেকটাই নষ্ট হলো। কথা আছে না, Penny wise, pound foolish!

ব্রাজিল পৃথিবীর ৫ম বৃহত্তম এবং ৭ম জনবহুল দেশ। মানাউস, ব্রাজিলের ২৬টি স্টেটের মধ্যে বৃহত্তম আমাজনাস স্টেটের রাজধানী। ব্রাজিলের উত্তর-পশ্চিমে, এমাজন রেইনফরেস্টের কেন্দ্রে নেগ্রো নদীর তীরে অবস্থিত শহরটি সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও সম্ভারে স্পন্দিত। নিজেদের আধিপত্য নিশ্চিত করতে ১৬৬৯ সালে দুর্গ নির্মাণ দিয়ে মানাউসে পর্তুগিজ উপনিবেশবাদের সূচনা হয়। ১৮৩২ সালে মানাউস (Manaus A_© Mother of Gods) নামকরণের মধ্য দিয়ে এটাকে উপশহর ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ১৮৪৮ সালে এই নাম পরিবর্তন করে Cidade da Barra do Rio Negro করা হয় যেটা ১৮৫৬ সালে পরিবর্তন করে আবার মানাউস করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচুর রাবার উৎপাদনকারী

চলেছি আমাজনপানে

অঞ্চল হিসাবে মানাউস আন্তর্জাতিক রাবার ব্যবসার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। রবার ব্যারণদের ব্যক্তিগত সম্পদের প্রাচুর্য সুক্ষ্ম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে। একদিকে আদিবাসী রাবার শ্রমিকদের শোষণ ও নির্যাতন চলে অন্যদিকে সম্পদের আতিশয্য অভিনব স্থাপনা নির্মাণে রসনা ও রসদ জোগায়। ফলশ্রুতিতে এ শহর বিত্ত ও বৈভবে ঝলমল করে ওঠে। সে সময়ে মানাউসকে "Paris or Tropic" বলা হতো। প্যারিসের Les Halles এর অনুকরণে ১৮৮২ সালে এখানে Adolpho Lisboa City Market প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়া Teatro Amazonas অপেরা হাউসের রাজকীয় ও নান্দনিক সৌন্দর্য্য এখনও বিখ্যাত ট্যুরিস্ট আকর্ষণ। Teatro Amazonas আমার এখানে আসার অন্যতম কারণ ছিল। কিন্তু হা হতোস্মি! খুনি অতি সামান্য আলামত অসাবধানে ফেলে রাখার জন্যে যেমন ধরা পড়ে আমিও তেমনি সামান্য ভুলের জন্য মানাউসে এসেও এই অপেরা হাউসের ভেতরে ঢুকতে পারিনি। সে কাহিনি অন্য কোথাও বলবো।

মানাউস থেকে আমাজন বনে প্রবেশের জন্য যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্গমন পয়েন্ট আছে মানাউস থেকে উত্তর-পশ্চিমে প্রায় চল্লিশ কি.মি দূরত্বে Iranduba তেমন একটি পয়েন্ট। এটা আমাজোনাসের সবচেয়ে ছোট মিউনিসিপাল এরিয়া। আমরা এখন সেখানে যাচ্ছি।

মানাউস এয়ারপোর্ট থেকে Hotel Farol da Barra- ২০ মিনিটের রাস্তা। ভোররাত বলেই হয়তো ১৫ মিনিট সময় লেগেছে। প্রশস্ত সড়ক, অলিগলি পার হয়ে উবার একটা ছোট গলির সামনে গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার বললো, এসে গেছি, এই তোমাদের হোটেল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে আমার কেমন অস্বস্তি হলো। চারিদিকে সুমসাম, রাস্তায় মিটমিটে আলো জ্বলছে। রাস্তার পাশের দোকানগুলো ছোটছোট, সব বন্ধ, এই অসময়ে বন্ধ থাকারই কথা। সামনে অপ্রশস্ত ফুটপাথ। হাত বা পায়ের কাছে সবকিছু পাওয়া যাবে বলে ডাউনটাউনে হোটেল নেয়া হয়েছে। ভাড়াটাও বিবেচ্য ছিল। ইন্টারনেটের তথ্য মতে রেস্টুরেন্ট, শপিং ছাড়াও প্যালেস অব লিবার্টি মিউজিয়াম, এমাজন থিয়েটার, প্রভিন্সিয়াল প্যালেস আর্ট গ্যালারি ইত্যাদি খুব কাছে হওয়ার কথা, কিন্তু চাক্ষুষ এই প্রতিবেশ দেখে তেমন কিছু আশেপাশে আছে বলে মনে হলো না। ডাউনটাউনের কোনো আলামতও চোখে পড়ল না। একটু দমে গেলাম, কারণ হোটেলটা সবার হয়ে আমিই বুক করেছিলাম।

আর সেখানেই শেষ না।

পাড়া দেখে ভড়কে গিয়েছিলাম, এবার হোটেল দেখে তো আরও বোকা বনে গেলাম। মান্না দে'র সেই গানের মতো, কি চেয়েছি আর কি যে পেলাম্। ফটো যে কত প্রতারক হতে পারে হোটেলের গেট মানে দরজায় দাঁড়িয়ে বুঝলাম। অপ্রশস্ত একটা সিঁড়ির ওপরে ওনিং দেয়া। চারধাপ সিঁড়ি উঠে একপাল্লার দরজা টেনে ধরে ভেতরে ঢুকতে হবে। ঢুকেই একটা সোফা, একটা লাভসীটের সামনে ছোট কাঁচের টেবিল দিয়ে বসার ব্যবস্থা। সামনেই রিসেপশন। সুন্দরী এক তরুণী একগাল হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানালো বটে কিন্তু দুএকটা প্রশ্ন করতেই বুঝলাম একবর্ণ ইংরাজি জানে না। আবার গুগুলকে ডাকো। পানামা সিটিতে ছিল স্প্যানিশ, এখানে পর্তুগিজ। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দুইভাষায় লেনদেন। তারচেয়ে অনেক বড় সমস্যা হোটেলে এলিভেটর নাই। তবুও ভালো যে, দোতলায় আমাদের রুম, আরও উঁচুতে না। আমরা তখন ক্ষুধিত ও ক্লান্ত। মেয়েটা অনেক প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারলো না; শুধু জানালো, ৭টার পরে যে রিসেপসনিস্ট ডিউটিতে আসবে সে ইংরাজি জানে। সে পরের কথা পরে। গোসল করে, এখন কিছু খেয়ে আমাদের একটু বিশ্রাম নিতে হবে।।

যাহোক, চেকিং শেষে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় যে যার বরাদ্দ ঘরে ঢুকলাম। আমাদের সফরসঙ্গী মাহতাব ভাই ও তাঁর স্ত্রী বুলিভাবী। আমরা পাশাপাশি ঘর পছন্দ করলাম।। ঘরের দরজায় এমাজনীয় ফুল, পাখি, নদী ইত্যাদির ছবি; উজ্জ্বল রঙে হাতে আঁকা, ফাইন টিউনিং নাই, মোটাদাগে আঁকানো বলে অন্যরকম সুন্দর। ঘরটা ছোট। একটা টেবিল-চেয়ার, ছোট বিছানা। তো ব্যাগ স্যুটকেস গুছিয়ে তুলতেই আমাদের দরজায় নক, বাইরে বুলিভাবী। কী ব্যাপার? বাথরুমে

গরমপানি নাই, শ্যাম্পু-কন্ডিশনার নাই, গোসল হবে কীভাবে? তাইতো, এখন উপায়? চেহারা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলেও আসলে খুব অপ্রস্তত লাগছিল।

এদিকে আমাদের বাথরুমের মেঝে দিয়ে পানি গড়িয়ে বেডরুমে ঢুকছে। এখানে পানি এলো কোত্থেকে? আবার নিচে রিসেপশনে গেলাম। মেয়ে তো কিছু বোঝে না। সাথে করে উপরে নিয়ে এলাম। সে ঘর দেখলো, বাথরুম দেখলো। ছোটবেলায় দেখেছি আমাদের বাড়িতে যখনতখন মেহমান আসতো। বিরক্ত হওয়া যাবে না; আব্বা বলতেন, সবার বাসায় মেহমান আসে না, ওটা আশীর্বাদ। তো এই রেইনফরেস্ট এলাকায় বৃষ্টিও তেমনি আশীর্বাদ হয়ে যখনতখন ফিরে ফিরে আসে। যা বুঝলাম, আমরা এখানে আসার কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টিঅতিথি এসেছিল। ঘরের জানালা খোলা পেয়ে তিনি এখানেই ঢুকে পড়েছিলেন। এতসব ঝামেলা সত্ত্বেও পরে অবশ্য বুঝেছিলাম, ওই হোটেল নিয়ে খুব ভুল করিনি, সত্যি ওটা মানাউসের অন্যতম প্রাইম লোকেশন ছিল।

ঠিক সকাল ৮ টায় মাহতাব ভাইয়ের টেক্সট পেয়ে নিচে নামলাম। ট্যুর কোম্পানির গাড়ি এসে গেছে। ঘুমের দেখা নাই বলে রেডি হয়েই ছিলাম। নিচে নেমে দেখি গাড়ির পাশে লম্বা, স্লিম, হাফপ্যান্ট- হাফসার্ট, স্যান্ডেলশু পরা শ্যামল রঙের আকর্ষণীয় একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। পরিচয় হলো। এই ভদ্রলোকটিই মিল্টন, আমাদের ড্রাইভার কাম ট্যুর অপারেটর। সাত সীটের চকচকে টোয়োটা মিনিভ্যান। ড্রাইভারের সাথে গল্প করা এবং ছবি তোলার সুবিধার জন্য আমি সামনে বসতে পছন্দ করি। আমি সামনে বসলাম, বাকি তিনজন পেছনের সিটে।

-আমি কায়াপো নৃগোষ্ঠীর। আমাজনের জঙ্গলে জন্ম ও বিভিন্ন গ্রামে বেড়ে উঠেছি। আমার বাবা শিশুকালে আমাদের ত্যাগ করে অন্যগ্রামে চলে যায়। আমাদের কোনো স্থায়ী আবাস ছিল না। মা খুব কষ্ট করে আমাদের বড় করেছে। প্রথম সন্তান বলে অল্প বয়সে মা-কে সাহায্য করতে আমাকে কাজ শুরু করতে হয়। নিজে একটু থিতু হতেই ছোট ভাইবোনদের কাজের ব্যবস্থা করে একজন একজন করে শহরে এনেছি। এখন সবাই যে যার মতো মোটামুটি ভালো আছে।

আমি হাঁ হয়ে মিল্টনের কথা শুনতে থাকি। এই ট্যুর কোম্পানিটার মালিক মিলটন একা। সে কন্যা, জায়া, ভাই, ভাইবউ-পরিবারে উপযুক্ত সবাইকে নিয়ে ব্যবসাটা চালায়। নিজে যথেষ্ট পরিশ্রম করে ব্যবসাটাকে বড় করেছে। করোনা মহামারিতে যে ক্ষতি হয়েছে সেটা অনেকটাই পূরণ হয়ে এসেছে। ও ইংরাজি জানে বলে দেশে-বিদেশে যোগাযোগের কাজটা ও নিজেই করে, বলাই বাহুল্য। ৪ সন্তানের বড়টি মেয়ে-বিয়ে দিয়েছে। সামান্য টুকটাক প্রশ্ন করতেই মিল্টন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসব বলে যায়। কাহিনির সারাংশ সেই, জীবনসংগ্রাম, পরিবার, দায়িত্ব। এই

বনগহীনে

কাহিনি পৃথিবীর হাজার বছরের, অগণন মানুষের। রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও প্রেজুডিসভরা মানসিক সীমান্তরেখা তুলে দিলে এক পৃথিবী, এক জাতি, এক ধর্ম।

গাড়ি চলছে, আমি আড়চোখে মিল্টনের দিকে তাকাই। প্রসন্ন মুখাবয়ব। ফুলেল প্রিন্টের হাফহাতা সার্টের ভেতর থেকে সুপুষ্ট বাহু দেখা যাচ্ছে। স্টিয়ারিং ধরে সামনে তাকিয়ে ও কথা বলছে। উন্নতনাসা, শক্ত চোয়াল, মাথার চুল খুব ছোট করে ছাঁটা। আফ্রিকানদের মতো কুঁচকানো। মোটেও কোনো অর্ধশিক্ষিত আদিবাসী মনে হচ্ছে না।

-তুমি এত ভালো ইংরাজি শিখলে কী করে? প্রশ্ন শুনে ও আমার দিকে তাকায়। হয়তো ভাবছে, এ সম্ভাব্য জীবনিকার না ট্যুরিস্ট?

-স্কুলে সামান্য, বাকিটা নিজের চেষ্টায়।

আমেরিকান ইংরাজি ফ্রেজ-ইডিয়মের নির্ভুল প্রয়োগই শুধু না, খেয়াল করলাম ও কালচারাল নুয়ান্সগুলোর ব্যবহারও জানে।

-নিজে নিজে? সেটা কেমন?

-আমি খুব ছোটবেলা থেকে মনোযোগ দিয়ে ইংরাজি গান শুনি, সিনেমা দেখি, বই পড়ি। ইউটিউব তো আছেই।

-কার গান পছন্দ করো?

-হুইটনি হিউস্টন, রড স্টুয়ার্ড, থেকে টিম্বারলেক অনেকের কথাই বললো। এরপর দুম করে ও আমাকে জিজ্ঞেস করলো, মাউন্টেনমামা তোমার পছন্দ না? তোমার

অঞ্চলের গান, বলেই মিল্টন গুনগুন করে গাইতে লাগলো...Country road take me home, to the place I belong, West Virginia, mountain mama....

এই গানটা যখনই শুনি, আমাকে আপ্লুত, আচ্ছন্ন করে। আহা, আমার ছেড়ে আসা শৈশব, পাহাড় ছিল না কিন্তু ধানের ক্ষেত, মেঠো পথ। ভিন্ন প্রেক্ষাপট কিন্তু একই আবেগ, একই আকুতি! তবে, আমি চমৎকৃত হলাম আমাজনের এক আদিবাসীর এমন ভিন্নস্তরের রুচি দেখে। মানুষের প্রবৃত্তি, প্রাকৃতিক ও সহজাত জীবনবোধ, আকাঙ্ক্ষা-এসবকিছু ভৌগোলিকতার অনেক উর্ধে। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় দীর্ঘদিন বসবাসের কারণে গানটা যেন আমার নিজের, এমনটা মনে হয়। মনে হয়, জন ডেনভার যে পথে হেঁটেছিলো আমিও সে পথে অনেকদিন ধরে হাঁটছি।

বললাম, এটা আমার অতি প্রিয় গান। সেই সাথে মনে পড়লো, কেনিয়ার মাসাইমারা গেম রিজার্ভের Sarova Mara Game Camp এ ফায়ারপ্লেসের মৃদু আলোয় মার্গারিটার কাপে চুমুক দিতে দিতে একজন আফ্রিকান আদিবাসী শিল্পীর কণ্ঠে যখন এ গানটা শুনছিলাম তখন সবার অগোচরে আমার চোখ বারবার ভিজে যাচ্ছিল, Country road take সব যড়সব, কিন্তু এই প্রবাসীর হোমটা আসলে কোথায়?

প্রায় তিরিশ মিনিটের পথ যাওয়ার পরে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে মিলটন ওর স্ত্রী মারিয়াকে তুলে নিলো। মারিয়া আমাদের নাস্তা নিয়ে অপেক্ষায় ছিল। মারিয়া কী শ্বেতাঙ্গ? গায়ের রং আর হালকা সোনালি চুল তেমনি বলছে। তবে, মিল্টনের ভাইয়ের মতো সেও একদম ইংরাজি জানে না। আর সে কারণেই সারাক্ষণ মিটমিট করে হাসছে। পরে জেনেছি, মারিয়া স্থানীয় আদিবাসী কন্যা, সম্ভবত রক্ত শঙ্কর হয়ে গেছে। মারিয়াকে তুলে নিয়ে প্রায় ৫ মাইল যাওয়ার পরে মারিয়া যেখানে নামলো সেখানে ওর কলেজপড়ুয়া মেয়ে অপেক্ষা করছিল ট্যুরের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে। মনে মনে হাসলাম, এ যে অন্য ভার্শনের রিলে রেস।

পানিভরা খানাখন্দ। গতরাতেও বৃষ্টি হয়েছে। প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টি হয়-না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। বিষুবীয় আবহাওয়া। ছোটবেলায় ভূগোলে পড়েছিলাম-উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে পুষ্ট রেইনফরেস্ট মানে বৃষ্টিবনের কথা।

কিছুদূর যেতে কিছু বাড়িঘর চোখে পড়লো। কাঠের প্রায় ১০-১৫ ফুট খুঁটির ওপরে কাঠের ছোটছোট ঘর।

জায়গাটা ভারী সুন্দর। গাছের ঘনছায়া, শুমশাম ভাবালুতাকে ভেঙে দিচ্ছে পাখিদের বহুভাষিক আলাপচারিতা। গাড়ির শব্দে রাস্তা থেকে সরে যাচ্ছে গৃহপালিত প্রাণীরা। আমাদের গাড়ির দিকে তাকিয়ে হাত তুলে, চিৎকার করে

কীসব বলছে গেঁয়ো চেহারার লোকজন। অধিকাংশই অত্যন্ত সুঠাম ও দীর্ঘদেহী। বুঝলাম মিল্টনকে সবাই চেনে। ওর গেস্ট বলে হয়তো ওরা আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে।

গাড়ি যেখানে থামলো সেখানে বেশ কিছু মানুষ জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির এসি ছেড়ে নিচে নামতেই একটা হালকা উষ্ণ ও জলীয়ভাব শরীরে লেপটে গেল। এটা খুলনার সুন্দরবন কিংবা দিনাজপুরের সিঙারা ফরেস্ট হতে পারতো, কিন্তু না; মেটো গন্ধ বলছে আমরা অন্যকোথাও, অন্য কোনোখানে আছি।

এ জায়গাটার নাম Balneario Cachoeira do Castanho, যাকে একটা অপরিসর সৈকত বলা যায়। Castanho লেকের সৈকত।

বর্ষার সময় এই পুরো এলাকাটা ডুবে যায়। বাড়িগুলো তাই খুঁটির ওপরে।

লেকের পাড়ে ছোটবড় রেস্টুরেন্ট যা দেখছি, সব অস্থায়ী। পানির উচ্চতা নাকি পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত উঠতে পারে। বন থেকে পানি বের হয়ে কুলকুল করে একটি জলপ্রপাত হয়ে Castanho লেকে পড়ছে। পানির রং কোথাও বাদামি, কোথাও রুপালি। বেশি না, ছয় থেকে সাত ফুট নিচে পাথরের ওপরে পড়ার আগে সকালের কোমল রোদে পড়ন্ত পানি চিকচিক করছে। তারপর গড়িয়ে লেকে মিশে যাচ্ছে।

পানির এই পতন দৃশ্য সবসময়, সব জায়গাতেই সুন্দর।

এই মৃদুমন্দ জলপ্রপাত নাকি বর্ষাকালে(এপ্রিল থেকে আগস্ট) ফুলে ওঠা লেকে মিশে একাকার হয়ে যায়। পানির উপস্থিতি বা উচ্চতার ওপর ভিত্তি করে স্থানীয়রা বলে, এই এমাজন এলাকায় দু'টো সীজন-high এবং dry; হয় বন্যা, না হলে খরা।

লম্বা গাছগুলোর প্রায় ১৫ ফুট উচ্চতায় গায়ে গোল করে পানির দাগ দেখা যাচ্ছে। এখন খরা চলছে, সে কারণে কিছু বিশেষ সৌন্দর্য আমরা মিস করবো। যেমন, আমাজন লিলি। তবে, যা শুনলাম, এখানকার বর্ষাকাল ট্যুরিস্টরা হ্যান্ডেল করতে পারবে কিনা আমার সন্দেহ আছে।

এবার মিল্টন আমাদের নতুন ট্যুর গাইডের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বিদায় নিলো। এতক্ষণ মিল্টনে মুগ্ধ হয়ে ছিলাম। হঠাৎ কেমন মিইয়ে গেলাম। নতুন গাইড না জানি কেমন ইংরাজি জানে, এটা ভেবে একটু শঙ্কা হলো। আবার চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি বিরক্ত ও হতাশা। উজ্জ্বল নানান রঙের রেস্টুরেন্ট থেকে গানবাজনার প্রচণ্ড শব্দ আসছে। বনের স্নিগ্ধতায় মহাপতন। ডিসপোজেবল কাপ-প্লেট যেখানে সেখানে ডিসপোজ করা হয়েছে। ঠিক যেন, "সুরের গলায় লইট্যা আছে অসুরের বন্ধন...." গাইডকে দেখে আমি রীতিমতো অবাক। সম্ভবত

বৃন্দ ভ্রামণিক

পাঁচ ফুট হাইট, টিনটিনে স্বাস্থ্য। আমাদের দেশে ফর্সা যাকে বলে তেমন গায়ের রং, মিষ্টি চেহারার একটা ছেলে। ভালো করে দাঁড়ি-মোঁচ ওঠেনি। ফুলপ্যান্ট, ফুলসার্ট পরা, ঘাড় অব্দি লম্বা চুল, মাঝখানে সিঁথি। ভাবছি, এ আমাদের নিয়ে যাবে আমাজনের জঙ্গলে হাইকিং করতে? বলে কী? একটা বাচ্চা এনাকণ্ডা তো বিনা কসরতে একে গিলে ফেলতে পারবে! আমাদের তখন কী হবে? পথ হারিয়ে বন থেকে যদি বেরুতে না পারি? যাহোক, এসব তো আর ওকে বলা যায় না। বয়সচোরাও হতে পারে। একটু কায়দা করে জিজ্ঞেস করলাম। বললো, ছয় বছর ধরে সে এই চাকরি করছে কিন্তু জঙ্গলে যাওয়াআসা শৈশব থেকে।

সমতল থেকে বেশ নিচে ঘাট। ৩টা নৌকা বাঁধা আছে। একটার দিকে দেখিয়ে বললো, ওটাতে আমরা যাবো। পাথরে পা ফেলে আমাদের নিচে নামতে হবে।

একটা পাথরের সাথে মোটা দড়ি দিয়ে নৌকাটা বাঁধা । আমাদের দেশের ডিঙি নৌকার মতো ১২-১৩ ফুট লম্বা, ইঞ্জিন লাগানো। ছই জাতীয় কিছু নাই।

আমরা চার জন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম। নৌকা আমাদের কারোই পছন্দ হয়নি কিন্তু চেপে গেলাম। বুলিভাবী এমন নৌকায় করে যেতে হবে-তেমন প্ল্যান কেন করেছি বলে মাহতাব ভাইয়ের প্রতি খুব অসন্তুষ্ট চোখে তাকাচ্ছেন। বুলিভাবির চেহারায় ভীতির ফাউন্ডেশনে উষ্মার ব্লাশঅন। এখন তো আর উপায় নাই, পড়েছে মোগলের হাতে....। উনাকে মনে করিয়ে দিলাম, আদিবাসী পরিবারের অতিথি হয়ে জঙ্গলে রাত কাটানোর প্ল্যানটার কথা, যেখানে টয়লেট নাই, গাছের সাথে ঝুলানো মশারিহীন হ্যামকে ঘুমাতে হতো। এটা

আমাদের আগের প্ল্যান ছিল। প্রকৃতির ডাকে ভ্রমণে বের হয়েছি সত্যি কিন্তু সাপ-খোপের জায়গায় রাতে প্রকৃতির ডাক তো বিশেষ ডাক, সেই ডাকে জঙলে যাওয়া সেই তুলনায় আজকের এই ভ্রমণ তো অনেক ভালো। বললাম, ভয় চেপে যান, যতোটা রিস্কি ভাবছেন সেটা নাও হতে পারে। আল্লাহ ভরসা। মনে মনে বললাম, বদর বদর!

আমরা একেএকে গাইড আলফন্সের হাত ধরে দোদুল্যমান নৌকায় উঠলাম। ওর সহকারী ইঞ্জিনের হাতল ধরে বসে আমাদের অবস্থা দেখে মিটিমিটি হাসছে।

আমাদের সাথে যোগ দিলো সুইডেনের কলেজ পড়ুয়া দুইভাই, ইটালির একজন মধ্যবয়সী একাকী মহিলা, একজন ভেনেজুয়েলান এ একজন ক্যানেডিয়ান যুবক।

ওপরে ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু মেঘ কোলে নিয়ে নীলাকাশ তাকিয়ে, নিচে নেগ্রো নদীর কালচে পানি। আমি ভয়টয় তেমন একটা পাই না। তবুও বুকের ভেতরে কেমন অদ্ভুত একটা ধুকপুকি, উত্তেজনা। সত্যিই যাচ্ছি এমাজন বৃষ্টিবনে? খুশি খুশি লাগছে, কিন্তু যদি নৌকাডুবি হয়? বাপরে! ইউটিউবে যে সব এনাকণ্ডা দেখেছি!

-আচ্ছা, তুমি যে এতগুলো মানুষ নিয়ে নদী তারপরে জঙ্গলে যাচ্ছো, তোমার ভয় করে না? আমি আলফন্স কে আবার জিজ্ঞেস করি।

-না। বলেছি তো আমি অনেকদিন থেকে এই কাজ করি। ও হাসে।

-তোমার বয়স কতো? আমি কৌতূহল দমাতে পারিনা।

ছেলেটা কিলকিল করে হাসে আর কলকল করে কথা বলে। শ্রুতিমধুর একটা আক্সেন্ট আছে কিন্তু নির্ভুল, অনর্গল ইংরাজি বলতে পারে। এই ভাসমান গ্রামের কোনো একটাতে ওর জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। শহরে পড়াশুনা করতে গিয়েছিল, ভালো লাগেনি। ফিরে এসেছে পানি, গাছ ও শেকড়ের টানে।

এই নদীতে ঘাসজাতীয় একধরনের চিকণ গাছ জটলা বেঁধে ছোটছোট সবুজ দ্বীপ সৃষ্টি করেছে। নানা রঙের ও ঢং এর পাখি সেই দ্বীপে খেলছে। নদীর এক পাশ মিশে গিয়েছে জঙ্গলে, অন্যপাশে কাঠের ঘরবাড়ি, পানি যার উঠোন-আলফনস পরিচয় করিয়ে দিলো-floating house. না, ঘরগুলো ভেসে যাচ্ছে না। খুঁটি পানিতে ডুবে থাকার কারণে এগুলোকে ভাসমান মনেহচ্ছে। সামনে বর্ষাকাল, পানি আরও বাড়লে ঘরবাড়ি রেখে বাসিন্দাদের অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। শুকনো সময়ে ফিরে এসে হয়তো ঘর বাঁধবে অন্য কোথাও অন্য কোনো খানে।

নৌকা চলছে। পানি ও ইঞ্জিনের শব্দে আমাদের কথা ও একান্ত ভাবনা মিশে যাচ্ছে।

(পর্ব দুই)

অবশেষে নৌকা একটা ঘাটে ভিড়লো। আলফন্সের সহকারী নৌকার ইঞ্জিনে আটকানো বৈঠা সদৃশ হাতল ধরে ব্যালান্স রাখছে আর ও নৌকার সামনের অংশ মাটিতে ধরে দুলুনি থামানোর চেষ্টা করছে, কাম অন গাইস্ওয়ান পারসন এট আ টাইম্, আলফন্স ওর হাত বাড়িয়ে দেয়। ফাঁকা চারিদিক। ঘাট বলতে তীর; কোনো স্থাপনা, সিঁড়ি, বাঁধানো ঘাট-এমন কিছুই নাই। ধরে নামার জন্য শুধু আলফন্সের হাত। তো ওর হাত ধরেই একে একে আমরা তীরে নেমে এলাম।

কাদা প্যাচপ্যাচে, পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনাভরা আঁঠালো মাটি। কাদাময় পথটুকু শেষ হলে বালুমাটি। তীর থেকে আনুমানিক ১০০ গজ দূরে বনাঞ্চল শুরু হয়েছে। ওদিকে যেতে হবে আলফন্স বনের দিকে হাত উঠিয়ে দেখায়। আমরা ওদিকে যাবো, বলতে বলতে ও এক এক করে সবার হাতে ১ লিটারের পানির প্লাস্টিক বোতল ধরিয়ে দিয়েছে। ব্যাকপ্যাকে নিজের পানি, গলায় ক্যামেরা ও অন্যান্য জিনিষপত্রের সাথে এটা নিয়ে হাঁটতে হবে। ট্রেকিংয়ে পানি জীবনদায়ী জানি। তারপরেও মনেমনে ভাবলাম, কেন বাবা, পানিটা পরে দিলে কী হতো?

দক্ষিণ আমেরিকার এই বিশাল গ্রীষ্মমন্ডলীয় বন, আমাজন অববাহিকায় অবস্থিত আমাজন রেইনফরেস্ট পৃথিবীর বৃহত্তম রেইনফরেস্ট। এটি নয়টি দেশ পেরু, কলম্বিয়া, ভেনিজুয়েলা, ইকুয়েডর, বলিভিয়া, গায়ানা, সুরিনাম এবং ফরাসি গায়ানার কিছু অংশ জুড়ে রয়েছে। প্রায় ৬.৭ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার (২.৬ মিলিয়ন বর্গমাইল) বিস্তৃত এই বনের ৬০% ব্রাজিলের অন্তর্ভুক্ত। এটি আনুমানিক ৩৯০ বিলিয়ন পৃথক গাছের আবাসস্থল ছাড়াও সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের জন্য বিখ্যাত। বিশ্বের পরিচিত প্রজাতির ১০% এই বনাঞ্চলে রয়েছে। আমাজন একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্বন সিঙ্কও, যেটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে। এটি ভারতের দ্বিগুণ আয়তনের।

অভূতপূর্ব গাছপালা, ফুল ও ফলের বৈচিত্র্য বলাই বাহুল্য, চোখের জন্য মুগ্ধকর ও মনের জন্য উত্তেজক। যত হাঁটি, জঙ্গল ক্রমে ঘন হতে থাকে। যদিও দলে হাঁটতে শুরু করেছিলাম, হাঁটার গতি ভিন্নতা এবং ব্যক্তিগত পছন্দ ও আগ্রহের কারণে সদস্যরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে। আমি যে সত্যিই আমাজনের জঙ্গলে ঢুকছি এই বিশ্বাস মাথায় সেট করতে আমার কিছুটা সময় লেগে যায়। আমাজনে যাচ্ছি, এ খবরে বন্ধুরা বিস্ময়, আত্মীয়স্বজন বিরক্তি ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিল।

-ইউরোপের কোনো দেশে অথবা ক্যারিবিয়ানের একটা রিসোর্টে হাত-পা মেলে রিল্যাক্স করে ছুটি কাটাবে, তা না, তুমি কিনা এতগুলো টাকা খরচ করে আমাজনের জঙ্গলে যাচ্ছো মশার কামড় খেতে। এটা ছিল আমার পুত্রটির অসুখি, অসন্তুষ্টি প্রকাশ।

-হুম, আমি মুখ টিপে হাসি। ছেলে ভুল বলেনি।

-আমি হলেপুত্রটি কোথায় যেত। এক এক করে সংক্ষিপ্ত বর্ণনাসহ সুরম্য, সুরক্ষিত জনপ্রিয় সব স্থানের নাম বলে যায়।

-ওসব জায়গায় পোকা, মশা নাই?

-না, কেন থাকবে

-এনাকন্ডা, পিরহানা, জংলি ট্রাইবাল মানুষ?

-মানে?

-তাহলে ওখানে গিয়ে লাভ কী?

-বারে, আরাম করবে, হাত-পা ছড়িয়ে সুন্দর বিছানায় সারাদিন ঘুমাবে। বিকালে বিচে চুল উড়িয়ে হাঁটবে।

-বলো কী! আমি ওকে থামিয়ে দেই। ঘুমানোর জন্য টাকা খরচ করে দূরে যাবো কেন বলো? আমার নিজের বিছানার মতো আরাম তো আর কোথাও পাই না আব্বু

-ধ্যাত, তোমার যেখানে খুশি যাও, তুমি ক্রেজি!

তো, নিজের খুশি মতো পছন্দের জায়গায় এসেছি। গৃহবন্ধুকেও বগলদাবা করে এনেছি বটে তবে সে যে বুলেটে কামড় দিয়ে রেখেছে, মাঝেমাঝে বোঝা যাচ্ছে।

যদিও বিশ্বজয়ের আনন্দ কেমন কোনোদিন জানতে পারবো না তবুও অনেকটা সে রকম ভাব নিয়ে আমি চলতে শুরু করি। চেষ্টা করি গাইডের আশেপাশে কিংবা পাশেপাশে থাকতে, ও যা বলছে সেটা মন দিয়ে শুনতে। মুশকিল হলো অতিসামান্যে অতি উৎসাহের কারণে আমি যা কিছু নতুন দেখি সেটার ছবি তুলি, চেনার চেষ্টা করি আর পিছিয়ে যাই। ওই পিচ্চি পাকাগাইড আমার জন্য অপেক্ষা না করে যখন হাঁটা দেয় তখন আমি “কিউরিয়াস জর্জ” এর মতো সমস্যায় পড়ে যাই। পায়ের নিচে বিছিয়ে থাকা প্রাচীন শেকড়, সরু পথের দুইপাশে হাত বাড়িয়ে অচেনা সব গাছগাছালি, ওপর থেকে ঝুলে থাকা লতাগুল্ম এড়িয়ে দ্রুত হাঁটা যায় না। কোথাও গাছ ঘন হয়ে এই রোদজ্বলা দুপুরে কৃত্রিম সন্ধ্যা নামিয়েছে। সেই অন্ধকারে ভয়হীন আমি ভয় পেয়ে যাই। আমি এই বনের গঠন, বিচিত্র উদ্ভিদ ও প্রাণী, রহস্যময় নৃগোষ্ঠী, সভ্য মানুষের ঐতিহাসিক অভিযাত্রা, এডভেঞ্চারে এসে হারিয়ে যাওয়া এবং প্রাণে বেঁচে থাকার যে সব রোমহর্ষক সত্য ঘটনা, কল্পকাহিনি পড়েছি, সিনেমা দেখেছি সেগুলো মনে পড়ে যায়। Anaconda, Jungle Cruise,

The Emerald Forest এইসব সিনেমার কাহিনি মনে করে রোমাঞ্চিত, আতঙ্কিত, উদ্বেলিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। আমাজন বৃষ্টিবনে প্রাচীন সভ্যতার খোঁজে এসে পুরো দলসহ হারিয়ে যাওয়া The Lost City of Z i নায়ক ফসেটের কথা মনে পড়ছে। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে, বিবিসি আমাজন রেইনফরেস্টে সবুজ গাছপালার গভীরে একটি প্রাচীন শহর আবিষ্কারের খবর প্রকাশ করে, যেখানে এটি সহস্রাব্দ ধরে লুকিয়ে ছিল। প্রায় ২,৫০০ বছর আগে নির্মিত, শহরটি সম্ভবত প্রায় ১,০০০ বছর ধরে জনবসতিপূর্ণ ছিল। এই অঞ্চলটি একটি আগ্নেয়গিরির ছায়ায় অবস্থিত যা এই অঞ্চলের জন্য অস্বাভাবিকভাবে সমৃদ্ধ মাটি তৈরিতে সাহায্য করেছিল এবং সম্ভবত এই সমাজের পতনের কারণও ছিল। তবে কী ফসেট কিছু গল্পে প্রকৃতি এবং প্রাকৃতের সাথে মানবজাতির দ্বন্দ্ব উপস্থাপনের কায়দা আমাজন অরণ্যকে একটি বিপজ্জনক স্থান বলে প্রতিষ্ঠিত করেছে বটে। তবে, সত্যিকারের বিপদ যে নাই, তাও তো না!

প্রকৃতি, প্রকৃতিমানব কখন বিপজ্জনক হয়? ভ্রামণিকগণ, বিজ্ঞানীরা, নৃতাত্ত্বিকগণ বছরের পরে বছর ধরে এই মহাঅরণ্যকে চিরে, ছিঁড়ে, খুঁড়ে দেখতে, জানতে চেয়ে এর কৌমার্যের সৌন্দর্যকে যেভাবে দলিত করেছে এর কোনো হিসাব নাই। তারপরেও ব্রাজিলের আদিবাসী বিষয়ক সংস্থা, FUNAI, অনুমান করে যে শুধুমাত্র ব্রাজিলেই এখনও ১০০টি অসংস্পর্শিত উপজাতি গোষ্ঠী রয়েছে। অনুমান করা হয় যে ১৬০টি প্রজাতির স্থলবাসী স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং ৩,০০০ প্রজাতির উভচর প্রাণী এখনও অনাবিষ্কৃত রয়েছে। এই প্রজাতিগুলি বিলুপ্ত হওয়ার আগে আবিষ্কার করার প্রতিযোগিতা চলছে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে, সংখ্যাটি অনেক গুণ বেশি, আনুমানিক ৩০,০০০ প্রজাতি এখনও অনাবিষ্কৃত, যার বেশিরভাগই এই রেইনফরেস্টে। অনুমান করা হয় যে, গ্রীষ্মমন্ডলীয় বন প্রজাতির ১% এরও কম তাদের রাসায়নিক যৌগের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। এই সব বিশেষজ্ঞদের জানার ও ভাববার বিষয়। আমি আপাতত আলফন্সের পিছু ছাড়ছি না!

আলফন্স আমাদের এ গাছ, ও গাছ দেখায়; কত কথা বলে, নানা রকম তথ্য দেয়। কোনটা মিথ আর কোনটা সত্য বোঝাতে চেষ্টা করে। ঘাস যে কত ধারালো হতে পারে সে সেটা চাক্ষুষ দেখানো শেষ করার আগেই এই কিউরিয়াস জর্জের হাত কাটা সারা। লজ্জায় গোপনে কাপড়ে হাত মুছে ফেলি। এই হাইকিংয়ের শুরুতে আমাদেরকে খুব সাধারণ কিছু সেফটি টিপস দেয়া হয়েছিল কিন্তু পরে, মানে ভ্রমণ শেষে জেনেছি এই জঙ্গলে গাছের থেকে বিভিন্ন অসুখ হতে পারে। এমনকি আন্টিবায়োটিক কাজ করে না এমন মারাত্মক ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণও খুব বিরল না। যাহোক, আলফন্স আমাদের বিভিন্ন ওষধি গাছ, গাছের ব্যবহার, রাবার গাছ থেকে কিভাবে রাবার সংগ্রহ হয়, ইত্যাদি দেখায়। আকাশ থেকে রোদ ধরে আনার জন্য কোনো কোনো গাছ এত লম্বা যে তার মাথা দেখতে কষ্ট হয়। এখন ড্রাই সিজন। হাই ঋতুতে, মানে বর্ষাকালে (জানুয়ারি-জুন) অন্য আর সব গাছগাছালিসহ এই গাছগুলো যখন চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট পানির নিচে চলে যায় তখন বনের চেহারা কেমন হতে পারে সেটা কল্পনা করতে পারলাম না। গাছের শরীরে পানির দাগ স্পষ্ট রিং আকারে বসে আছে। বর্ষাকালে এই বনে নৌকা

আমাজনের বনের ভিতরের ছবি

ছাড়া প্রবেশ কিংবা চলাচল করা যায় না। জল-স্থলের ভৌগোলিক সীমারেখা একাকার হয়ে গেলে বনের স্থায়ী অধিবাসী জীবজন্তুর সাথে তখন মাইগ্রেন্ট মানে অভিবাসীরা এসে যোগ দেয়। ব্ল্যাক কেম্যান, জাগুয়ার, বিভিন্ন রকমের বানর ও পাখি, সবুজ আনাকন্ডা, স্লথ, মিষ্টিপানির স্টিং রে মাছ, ডলফিন, আরাপাইমা পিরহানা মাছ, বৈদ্যুতিক বাইম, বিষাক্ত ব্যাঙ, বিশাল আরমাডিলো সব একাকার। এইসব শুনতে শুনতে চোখের কোনা দিয়ে গোপনে আশেপাশ একটু দেখে নিই। সিটি স্লিকার আমরা, শখের এই ভ্রামণিকগণ একটা মশার কামড় খেয়ে বেনাড্রিল মলম নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করি তাই আমাজন রেইনফরেস্টে বসবাসকারী তিরিশ মিলিয়নেরও বেশি মানুষের প্রতিদিনের সংগ্রামের কথা ভেবে হতবাক হয়ে যাই। ভয়াবহ কিছু না হলেও, বাইম মাছ দিয়ে বিদ্যুতায়িত ভেজা গাছে ফল পাড়তে ওঠা মানুষের টুপ করে ফলের মতো পানিতে পড়ে যাওয়ার ঘটনা নাকি খুব বিরল না। বর্ষায় আমাজনের বনে প্রায় সারাক্ষণ বৃষ্টিপাত ও যাতায়াতের অসুবিধার কারণে ভ্রামণিকের সংখ্যা কমে যায় বলে ট্যুর কোম্পানিগুলো বেশ ডিস্কাউন্ট দেয়। না ভাই, যা শুনলাম; যা দেখছি, এরপরে আমার বর্ষাকালের দমবন্ধ করা সৌন্দর্য্য দরকার নাই। তাছাড়া, আমরা শুষ্ক মরশুমে বিনা ডিসকাউন্টে এসেও যে ভোগান্তিতে পড়েছিলাম সেটাই বা কম কী!

কানের পাশ উড়তে উড়তে মশা গান গাইছে, গায়ে বসছে। যার যা কাজ! পোকা, মশা এদের বিকর্ষণ করা জন্য যে বডিস্প্রে ব্যবহার করেছি সেটা কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে না বরং উলটে মশাদের আকর্ষণ করছে বলে আমার সন্দেহ হতে লাগলো। হালকা রঙের ফুলহাতা কাপড় পরার কথা থাকলেও কিভাবে যেন ঠিক উলটো ঢঙ্গের কাপড় পরেছি। বনের ভেতরে ঘন আর্দ্র বাতাস স্থির হয়ে আছে। পায়ের নিচে প্যাঁচপেচে মাটি, পচা পাতা আর গাছের ডাল। পিঠে ব্যাকপ্যাক, গলায় ঝোলানো ক্যামেরা, বগলে পানির বোতল- এই অবস্থায় হাঁটতে হবে, দেখতে ও শুনতে হবে। সবচেয়ে বড়কথা এই প্রতিবেশের সবটুকু উপভোগ করতে হবে, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। পারছি কী? এই যে গাছের ক্ষত বেয়ে রাবার নামের রক্ত ঝরছে, বিস্ময়কর সব বনৌষধির আবিষ্কার ও ব্যবহার, টোরোনিরো গাছের পাতা পোড়ানো ধোঁয়া সুগন্ধি মশা ও অন্যান্য পোকামাকড়কে তাড়িয়ে দিচ্ছে অথচ এই গাছের অন্য নাম কেন বাস্টারড বুলেটউড- আলফন্সের ফস করে পাতা জ্বালানোর ভিডিও করতে করতে এসব ভাবছিলাম। এসব নিয়ে অনেক তাত্ত্বিক ও দার্শনিক কথা মাথায় এলেও দ্রুত পট পরিবর্তনের কারণে কোনো ভাবনাই স্থায়ী হচ্ছে না।

জঙ্গল এখন আরো নিবিড়, অসমান পথে উপরের দিকে যাচ্ছি-এন্টিগ্রাভিটি। বোতল খুলে পানি খেয়ে বোতলটা আবার বগলদাবা করি। হতচ্ছাড়া লোকজন খালিবোতল এদিক-ওদিক ফেলে রেখেছে। পরিবেশদূষণ দেখে বরাবরের মতো ব্যথিত হই। ঘাম লেগে শরীরের কাটা জায়গাগুলো জ্বলছে। ওপরে ঠেলে উঠতে এখন একটু কষ্ট হচ্ছে। ট্রেকিং পোল আনা হয়নি। পড়ে থাকা গাছের একটা ডাল ভেঙে ট্রেকিং পোল বানিয়েছি। নিজেকে ছোটখাট ম্যাকগাইভার মনে করে হাসি পাচ্ছিল কিন্তু হাসির বদলে আমি হাঁপাতে থাকি। দলের অল্পবয়সী সদস্যরা তরতর করে উঠে গেছে। ওদের এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

কাম অন গাইসকাম! লেট মি শো ইউ সাম্থিং উপরে উঠে সমতলে দাঁড়াতেই আলফন্সের আহবান। সবাই জড়ো হলে ও আমাদের একটা গাছের কাছে নিয়ে যায়। গুঁড়ি থেকে প্রায় তিনফুট উঁচুতে পিঁপড়ার বিরাট ঢিবি, সেখান থেকে পিলপিল করে বের হয়ে ঝাঁকেঝাঁকে পিঁপড়া কিলবিল করে মোটা গাছটাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আলফন্স দুহাত গাছের ওপরে রাখলে মুহূর্তে পিঁপড়া উঠে দুইহাত ছেয়ে যায়। ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের মধ্যে ভীতিসূচক নানারকম গুঞ্জন ওঠে। এক হাত দিয়ে আরেক হাতের পিঁপড়াগুলোকে ডলতে ডলতে আলফন্স মিটিমিটি করে হাসতে থাকে। এরপরে সে হাতের উন্মুক্ত তালু একে একে আমাদের নাকে ধরে, স্মেল ইট! পুরো ব্যাপারটা আমেরিকানদের ভাষায় "ইয়াইক্স্" কিন্তু মানতেই হয়, পিঁপড়ার রসের জৈবিক গন্ধটা খুব খারাপ ছিল না। এভাবেও নাকি মশা, পোকামাকড় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়! মানে, "মাছের তেলে মাছ ভাজা"র একটি কার্যকরী উদাহরণ আজ স্বচক্ষে দেখলাম। যাহোক, আলফন্স এ পর্যন্ত বেশ কিছু আইটেম ডেমোনেস্ট্রেশন করে দেখিয়েছে। দু'একজন পায়ে দঁড়ি লাগিয়ে তরতর করে ওর গাছে ওঠা দেখে তেমনটা চেষ্টাও করেছে। আমি ছোটবেলায় গেছো, আব্বার কাছে "জংলিমেয়ে" (যদিও আব্বা আমার জামগাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ে যাওয়া, সাইকেল নিয়ে সেগুন গাছের সাথে মহাধাক্কা খাওয়া এমন অনেক কিছু কোনোদিন জানতে পারেননি) বলে পাড়ায়, বাড়িতে সুখ্যাত ছিলাম। তবে, মৃদু ইচ্ছে হলেও এখানে আর গাছে ওঠার ঝুঁকি নেইনি, ঘাসে হাত কাটার পরে শুধু চুপচাপ দেখে গেছি। হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দিয়ে আমি ঝুপ করে পিঁপড়ার চাকে দু'হাত রাখতে মুহূর্তে কনুই পর্যন্ত ছেয়ে গেল ছোটছোট অগুণিত পিঁপড়ায়। গা শিরশির করতে লাগলো। ভালো করে কিছু বুঝে উঠবার আগেই দু'হাতভরা কিলবিলে আমাজনিয়ান পিঁপড়া দল বেঁধে গুজবাম্প ঠেলে দ্রুত আমার বুকের ওপরে উঠে আসতে লাগলো।

ছুটি

রহমান মৃধা

পাশ্চাত্য দেশে, বিশেষ করে সুইডেনে, মানুষ প্রতি বছর সাধারণত পাঁচ থেকে সাত সপ্তাহ ছুটি পান। পুরো বছর ধরে সপ্তাহে পাঁচ দিন, প্রতিদিন প্রায় আট ঘণ্টা কাজ করতে হয়। শীতকাল অবশ্য কিছু কঠিন মুহূর্ত নিয়ে আসে, তবুও কাজ সময়মতো শেষ করতেই হয়।

গ্রীষ্মে, যখন দিন দীর্ঘ আর সূর্যের আলো বেশি সময় থাকে, তখন অনেকেই একসাথে তিন-চার সপ্তাহের ছুটি নেন। ছুটি শুরুর আগে প্রত্যাশা থাকে—শান্তি, আনন্দ, নতুন অভিজ্ঞতা। কিন্তু বাস্তবতা অনেক সময় সেই প্রত্যাশার সঙ্গে মেলে না।

ছুটির আনন্দ কখনো বিষাদে পরিণত হয়—টাকা ফুরিয়ে যাওয়া, পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়া বা প্রত্যাশা পূরণ না হওয়া থেকে। এর ফলে মানসিক ক্লান্তি, হতাশা ও নেতিবাচক চিন্তা ফিরে আসে, যা আবার কাজে মনোযোগে প্রভাব ফেলে।

গবেষণায় দেখা গেছে, ছুটি-পরবর্তী হতাশা ("post-vacation blues") সাধারণত একদুই সপ্তাহ স্থায়ী হয়। প্রত্যাশা ও বাস্তবতার ব্যবধান যত বেশি, মানসিক প্রভাব তত গভীর হয়। অর্থনৈতিক চাপ এই অবস্থা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে-যা মনোযোগ, উৎপাদনশীলতা ও সৃজনশীলতা কমিয়ে দেয় এবং আবার হতাশার চক্রে ফিরিয়ে আনে।

কেন ছুটির পর ক্লান্তি আসে

ঘুমের রুটিন ব্যাহত হওয়া, বিশ্রাম থেকে হঠাৎ দায়িত্বে ফেরা, কাজের প্রত্যাশার চাপ, শারীরিক কার্যকলাপের অভাব কিংবা অস্বাস্থ্যকর খাবারড়সবই ছুটি শেষে উদ্যম কমিয়ে দেয়। দীর্ঘ বিশ্রামের পর মস্তিষ্ককে কাজে ফিরতে মানসিক "পুনঃপ্রশিক্ষণ" প্রয়োজন।

করণীয়

কাজ শুরু হওয়ার অন্তত একদুই দিন আগে ঘুম-জাগরণের স্বাভাবিক রুটিনে ফিরতে হবে। প্রথম দিনে ভারী কাজ না নিয়ে ছোট লক্ষ্য দিয়ে শুরু করা উচিত। হালকা ব্যায়াম, পুষ্টিকর খাবার, পর্যাপ্ত জলপান, সংক্ষিপ্ত বিরতি ও মাইন্ডফুলনেস ক্লান্তি কমায়। ছোট সৃজনশীল কাজ বা পরিবেশ পরিবর্তন মস্তিষ্ক সক্রিয় রাখে।

বাংলাদেশ-সুইডেন তুলনা

বাংলাদেশে নাগরিকদের ভ্রমণ ও অবকাশের সুযোগ এখনও সীমিত। বড় শহরে কিছু আধুনিক সড়ক ও পাবলিক ট্রান্সপোর্ট থাকলেও, গ্রামীণ এলাকায় সুবিধা অপর্যাপ্ত। অর্থনৈতিক সামর্থ্যের অভাবে অনেকেই মাত্র কয়েক দিনের ছুটি নিতে পারেন, যেখানে সুইডেনে নাগরিকরা আগে থেকেই পরিকল্পিত দীর্ঘ ছুটি কাটাতে পারেন।

সম্ভাবনা ও অগ্রগতির পথ

যদিও কিছু ভাগ্যবান নাগরিক বাংলাদেশে ছুটি উপভোগের সুযোগ পান, তবুও সীমিত সময়, অপর্যাপ্ত পরিবহন ও অর্থনৈতিক চাপের কারণে অধিকাংশ মানুষের জন্য তা চ্যালেঞ্জিং।

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় বিনিয়োগ, শিল্প-কারখানা উন্নয়ন এবং শহর-গ্রামের

বাল্টিক সাগরের তীরে

পরিবহন নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন। পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে নিরাপত্তা ও সেবার মান বাড়াতে হবে।

সবচেয়ে জরুরি হলো সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণ। একটি দেশ তখনই টেকসই উন্নয়নের পথে এগোতে পারে, যখন নাগরিকরা নিজেকে সেই উন্নয়নের অংশীদার মনে করে। আর তখনই ছুটি বা অবকাশের আনন্দ শুধু একটি শ্রেণীর জন্য নয়, সবার জন্য সমানভাবে উপভোগ্য হবে।

কিন্তু ছুটি শুধু নীতি বা পরিসংখ্যানের প্রশ্ন নয়—এটি এক গভীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারও নাম। আমার কাছে ছুটির মানে কেবল বিশ্রাম নয়, বরং নিজেকে নতুনভাবে খুঁজে পাওয়া, ভিন্ন সংস্কৃতিকে জানা এবং বেঁচে থাকার আনন্দকে আবার আবিষ্কার করা। সুইডেনের মতো দেশে দীর্ঘ ছুটি আমাকে সেই সুযোগ করে দেয়, যেখানে বাংলাদেশের নাগরিকরা এখনো সীমিত কাঠামোর ভেতরে বন্দি। এই ব্যবধান আমি নিজেই উপলব্ধি করেছি, যখন সুইডেন থেকে গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে ছুটে গিয়েছি ভূমধ্যসাগরের তীরেড়আন্তালিয়া ও আলানিয়ায়।

আন্তালিয়া-আলানিয়া: রোদ, ইতিহাস আর হৃদয়ের সংলগ্ন এক ভ্রমণ

স্টকহোম আরলান্ডা এয়ারপোর্টে বসে আছি। আমাদের ফ্লাইট প্রায় এক ঘণ্টা দেরিতে ছাড়বে বলে ঘোষণা এসেছে। জানালার ওপারে নীল-ধূসর আকাশে কিছুটা অস্থিরতা, বিমানের ডানায় জ্বলজ্বল করে উঠছে সতর্ক আলো। অথচ আমার মন ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে সেই নীল উপকূলের শহরে—আন্তালিয়ায়।

ঠিক এই মুহূর্তে পৃথিবীর একদিকে যুদ্ধের আতঙ্ক, অন্যদিকে পর্যটনের প্রতিশ্রুতি। গতরাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হঠাৎ করে ইরানের তিনটি সন্দেহজনক রাসায়নিক ঘাঁটিতে আঘাত হেনেছেন। তার প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বমিডিয়া উত্তাল, তেল ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত শঙ্কায় ইউরোপের মুদ্রাবাজারে নড়াচড়া দেখা দিয়েছে। এমনকি শান্তিপ্রিয় সুইডেনেও কিছু প্রতিক্রিয়া পড়তে শুরু করেছে—এয়ার ট্র্যাফিক আরও সতর্ক, নিরাপত্তা জোরদার।

তবে আমি যাচ্ছি একেবারে অন্য মেরুতে—ভূমধ্যসাগরের তীরঘেঁষা তুরস্কের এক শহরে, যার দুই প্রান্তে দুই বিপরীত বাস্তবতা: এক প্রান্তে ইজরায়েলের আগ্রাসন, আরেক প্রান্তে আন্তালিয়ার নীল সমুদ্র, পাথুরে উপকূল, আর ইতিহাসের গর্ভে ডুবে থাকা গলিপথ। এমনই এক শহরে আমি পা রাখতে চলেছি, যেখানে রোদ আর রোমান সভ্যতা পাশাপাশি বসে থাকে।

আন্তালিয়া শুধু একটি শহর নয়—এটি একটি অনিবার্য মিলনস্থল: ইতিহাসের, প্রকৃতির, আর কূটনৈতিক বাস্তবতার। যেখানে হাদ্রিয়ান গেটের নিচে দাঁড়িয়ে আপনি ভাবতে পারেন, সময় কেমন করে গত দুই হাজার বছর ধরে একটানা

স্টকহোম সিটি ম্যালারনের নৌভ্রমণে বন্ধুদের সঙ্গে

বয়ে চলেছে। যেখানে কালেয়িচির ঘরগুলোর জানালায় লটকে থাকা রঙিন ফুল আপনাকে মনে করিয়ে দেয়, মানুষ এখনো সৌন্দর্যের পেছনে ছুটে।

এবং হ্যাঁ, তুরস্ক এখন ইজরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মঞ্চে উচ্চকণ্ঠ। কূটনীতিক চাপ বাড়ছে, যার একপাশে মানবতা, অন্যপাশে রাজনীতি। এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আন্তালিয়া হয়ে উঠছে না কেবলই ছুটির গন্তব্য, বরং এক প্রকার নীরব প্রতিবাদ, এক নিরাপদ আশ্রয়, যেখানে আপনি পালাতে পারেন রক্ত, বোমা আর হেডলাইন থেকে। আপনি যেতে পারেন সমুদ্রের ঢেউয়ের নিচে, যেখানে নেই টেলিপ্রম্পটার, নেই খবর, কেবলই আকাশ আর পানি।

তুরস্কে পৌঁছে আমি রওনা দেব ডুডেন ঝরনার পথে। সেই জলপ্রপাত, যার পানি নেমে যায় সোজা সাগরে—যেখানে প্রকৃতি যেন সভ্যতার চেয়ে পুরানো। কিংবা আমি হয়তো হারিয়ে যাবো আন্তালিয়ার কোনো ক্যাফেতে, ছোট্ট এক এস্তানবুলের মতো যেখানে তুর্কি কফির গন্ধে ওসমানীয় যুগের স্মৃতি জেগে ওঠে।

এই শহরটি শুধু ভ্রমণকারীদের জন্য নয়, তাদের জন্যও যারা সত্যি সত্যিই কিছু অনুভব করতে চায়। যারা বুঝতে চায়, শান্তি মানে কেবল নিরবতা নয়ড়একটা উপলব্ধি, একটা অবস্থান।

তুরস্কের নীলাভ উপকূল ধরে যখন ছোট্ট উড়োজাহাজটা নেমে আসছিল, তখন দূর থেকে যে শহরটা মেরিনার মতো চকচক করছিল, সেটাই ছিল আন্তালিয়া। ভূমধ্যসাগরের কোলে অবস্থিত এই শহরটিকে আমি আগেও কয়েকবার দেখেছি কিন্তু এই প্রথম লিখতে বসেছি। আজ এই মুহূর্তে, জুনের রোদমাখা দুপুরে, আমি সত্যিই এখানেড়ইতিহাস, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর আধুনিক বিলাসবহুলতার এক অনন্য মিলনস্থলে।

বিমানবন্দর থেকে বের হতেই যেন সমুদ্রের নোনাজল গায়ে এসে লাগলো। পাইন গাছের সুবাস আর গরম বাতাসে এক অদ্ভুত মুক্তির গন্ধ। সোজা রওনা দিলাম কালেয়িচি—পুরনো আন্তালিয়ার হৃদয়। পাথরের আঁকাবাঁকা রাস্তা, ওসমানী কালের বাড়ি, আর প্রতিটি কর্ণারে ছোট্ট ক্যাফে—সবকিছু যেন সময়ের মধ্যেই আটকে আছে। এখানেই আমি দেখলাম সেই প্রাচীন হাদ্রিয়ান গেট, যা ২য় শতাব্দীতে রোমান সম্রাট হাদ্রিয়ানের স্মরণে নির্মিত। সেই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন কোনো সময়যানে চেপে ইতিহাসের ভেতরে ঢুকে পড়েছি।

পরদিন ভোরবেলা রওনা দিলাম ডুডেন ঝরনা দেখতে। শহরের একেবারে কাছে এমন অপূর্ব এক প্রাকৃতিক বিস্ময় যে লুকিয়ে থাকতে পারে, তা আমি ভাবতেই

পারিনি। ঝরনার তীব্র শব্দ, আর পানির ছিটেফোঁটা মুখে লাগতেই মনে হলো—প্রকৃতি যেন নিজেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

তবে আন্তালিয়ার সবচেয়ে মনছোঁয়া অংশটা ছিল এর মানুষ। স্থানীয় তুর্কি বৃদ্ধ যখন বললেন, "Sen kalbinde taşıdığın ne varsa, burada yankı bulur" (তোমার হৃদয়ে যা আছে, তা এখানে প্রতিধ্বনিত হয়), তখন আমি বুঝলাম—এই শহর কেবল একটি স্থান নয়, এটি একটি অনুভূতি। আন্তালিয়া শুধু চোখকে নয়, হৃদয়কেও জাগিয়ে তোলে।

সন্ধ্যায় হারবারে বসে মাছভাজা খেতে খেতে, দূরের আলো আর নৌকার প্রতিচ্ছবি দেখে মনে হচ্ছিল—আমি কোনো রূপকথার উপকূলে বসে আছি। অচেনা মানুষ, অচেনা ভাষা, অথচ মনে হচ্ছিল এই শহরের সঙ্গে আমার বহু পুরানো কোনো আত্মীয়তা আছে।

ভূমধ্যসাগরের ঠিক দক্ষিণে, তুরস্কের আনাতোলিয়ান উপকূলে ছড়িয়ে থাকা পাহাড়ের গায়ে যে শহরটি ঝুলে আছেড়তার নাম আলানিয়া। পর্যটকেরা একে বলেন "সমুদ্র-রোদ আর প্রাচীন দুর্গের শহর।" কেউ কেউ বলেন—এ শহর জীবনের বাকি অংশ শুরু করার উপযুক্ত জায়গা। লাল পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা সেই ১৩শ শতকের দুর্গ—Alanya Castle—DuwK দেয় ইতিহাসের আড়াল থেকে, আর নীচে ঝলমলিয়ে ওঠে Cleopatra Beach—যেখানে শোনা যায়, প্রাচীন মিশরের রানী নিজ হাতে বালি ছড়িয়ে গিয়েছিলেন।

তুরস্কের পথে নজরকাড়া ফুল

ভূমধ্যসাগর পারের আন্তালিয়ায়

আর যখন সূর্য সাগরের পানিতে লালচে ছায়া ফেলছিল, আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম ক্লিওপেট্রা বিচে। এমন শান্ত, স্বচ্ছ আর কোমল ঢেউ আগে কোথাও দেখিনি। লং চেয়ারয়ে হেলান দিয়ে, হাতে ঠান্ডা লেবু পানীয়, দূরে পাল তুলে ভেসে চলা নৌকা দেখে মনে হচ্ছিল—জীবন একটু থেমে থাকুক এইখানে।

এই শহর ঠিক কতোটা পর্যটনের, আর কতোটা প্রতীক্ষার—তা বলা মুশকিল। হয়তো যাঁরা এখানে আসেন, তাঁদের কারো অপেক্ষা ছিল নির্জনতা, কারো মুক্তির, আবার কারো নিজের কাছে ফিরে যাওয়ার।

ঘুমটা ঠিক কখন এসেছিল মনে নেই। হয়তো ভোররাতে, যখন বাইরে হালকা বৃষ্টির মতো শব্দ হচ্ছিল—হয়তো বাতাসে পাম গাছের পাতা দুলছিল, কিংবা হয়তো আমার ক্লান্তি আর মানসিক অস্থিরতা পরস্পরকে নিঃশেষ করে একটা নিঃশব্দ চুক্তিতে পৌঁছেছিল।

তবে যখন ঘুম ভাঙে, তখন জানালার কাঁচে রোদ এসে ধাক্কা মারছে।

আলানিয়ার সকালের আলো এমন, যেন আপনি এক অন্য জগতের শরীরে ঢুকে পড়েছেন।

হোটেলের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। নিচে সুইমিংপুলে কিছু মানুষ ঘোরাফেরা করছে। দূরে সমুদ্ররেখা—ধূসর নীলের পাশে বালুর সোনালি বিস্তার। এতটা শান্ত, এতটা সুনসান অথচ জীবন্ত এক দৃশ্য আগে দেখিনি।

সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, আমি বুঝি একটা বিরতি পেয়েছি—সময়ের, ক্লান্তির, এবং সবুজাভ দুশ্চিন্তার।

আলানিয়া শুধুই একটা সমুদ্রতীরের শহর নয়, এটি অনেকখানি অপেক্ষা—যেমন এক ধরণের ছুটিরও প্রতীক্ষা, নিজের ভেতরে ফিরবার প্রতীক্ষা। চারপাশের পাহাড়, দুর্গ, উপকূল আর সেই অতীত—সব মিলে যেন এক গূঢ় নীরবতা। আপনি যদি সেই নীরবতাকে জায়গা দেন, তাহলে সে কথা বলবে।

অনেক কিছু বলবে।

সকালের আলো একটু একটু করে জানালার পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকছিল, আর আমি উঠে দাঁড়িয়ে এলাম বারান্দায়। সাগর তখনো কিছুটা কুয়াশার মতো নীল, কিন্তু বাতাসে ছিল অদ্ভুত এক তাজা ঘ্রাণড়লবণ, বালি আর বেঁচে থাকার গন্ধ।

টার্কিশ ব্রেকফাস্টের জন্য নেমে এলাম হোটেলের ছাদের রেস্টুরেন্টে। হোটেলের খাবারঘরে গিয়ে দেখি অল ইনক্লুসিভ ব্রেকফাস্টের আয়োজন চলছে। একপাশে নানা ধরনের পনির, টমেটো-জলপাই-ডিমের মেলবন্ধন, অন্যদিকে মধু আর রুটি—তুরস্কের ক্লাসিক সকালের অভ্যর্থনা। কফি হাতে নিয়ে বসে পড়লাম জানালার ধারে।

আর তখনই যেন বুঝতে পারলাম—এই শহর আমাকে তাড়াহুড়ো করতে বলছে না।

এই শহর আমাকে থামতে বলছে।

শুধু দেখতে, শুনতে, শুষে নিতে বলছে।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি ছিল যা—তা হলো ভূমধ্যসাগরের দৃশ্য। ঠিক সামনেই জলের গভীর নীল এক বিস্তার, আমি তাকিয়ে ছিলাম আর ভাবছিলাম—এমন শান্ত, এমন শুদ্ধ একটা সকাল আমি শেষ কবে পেয়েছিলাম?

খাবার শেষে আর দেরি করিনি, নামলাম সরাসরি সাগরে। প্রথম পা রাখতেই জলের শীতল স্পর্শে কেঁপে উঠেছিলাম, তারপর যখন পুরো শরীর ডুবে গেল সেই নীলের ভেতরে—মনে হলো আমি যেন হারিয়ে যাচ্ছি। মনে পড়ে গেল ছোটবেলার সেই সাঁতার, খেলার ছলে জলে ডুবে থাকা, নিঃশব্দে শুয়ে থাকা সেই ছায়াঘেরা পুকুরের জল।

এখানে, এই আলানিয়ায়, আমি যেন নিজের অতীতে ফিরে গেছি। বাস্তবতাকে যেন কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখা গেছে। কেউ কিছু চায় না, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে না—শুধু ঢেউ এসে এসে বলে যায়: "এখানে তুমি ঠিক আছো।"

লোকাল লাঞ্চ আর দুপুরের অলসতা

সাগরের জলে কিছুটা সময় কাটিয়ে, আমি দুপুরে বের হলাম স্থানীয় এক ছোট্ট রেস্টুরেন্টে—হোটেল থেকে সামান্য দূরে, যেখানে স্থানীয় লোকেরা খেতে আসে।

সেখানে পেলাম আলানিয়ার ঘরোয়া খাবার: গরম গরম "কেবাব", ডালনার মতো "İmam bayıldı", পাশে দই, সঙ্গে তাজা রুটি। পরিবেশন করছিল এক হাসিখুশি বৃদ্ধা, যার চুলে জড়ানো ছিল গোলাপি রুমাল, মুখে প্রশান্ত হাসি।

খাওয়া শেষে আমি হাঁটতে হাঁটতে আবার ফিরে এলাম হোটেলে, কিছুক্ষণ বিশ্রাম, তারপর আবার সেই চেনা পথ—সাগরের ধারে। দিন যেন এক নিরবচেতন পুনরাবৃত্তি, কিন্তু প্রতিবারই নতুন স্বাদের।

আলানিয়া রাসেল: পাহাড় চূড়ার পথে ইতিহাসের হাতছানি

ভূমধ্যসাগরের নীল জলরেখা যখন তুরস্কের দক্ষিণ উপকূলে এসে থামে, তখন সেখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে এক নিঃশব্দ পাহাড়। সেই পাহাড়ের গায়ে লাল পাথরের প্রাচীরঘেরা যে কাসেলটি যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে আছে, সেটিই আলানিয়া কাসেল (Alanya Kalesi)। আর এই দুর্গে পৌঁছানোর যে সরু, আঁকাবাঁকা, উঁচু-নিচু পথ—স্থানীয়রা যার নাম রেখেছে "রাসেল"—সেই পথ নিজেই যেন এক স্বতন্ত্র চরিত্র।

এই রাস্তা একদিকে যেমন নিয়ে যায় ইতিহাসের কাছে, অন্যদিকে প্রকৃতির সৌন্দর্যে এমনভাবে ভরপুর যে প্রতিটি মোড়ে দাঁড়িয়ে আপনি একটু থমকে যেতে বাধ্য হন। নিচে সাগরের টলমলে নীল জলরাশি, পাশে শতবর্ষ পুরানো সাইপ্রেস গাছের সারি, আর উপরে গড়িয়ে যাওয়া প্রাচীন দেয়াল—সব মিলিয়ে পথটাকে মনে হয় এক চলন্ত কবিতা।

এই রাস্তার এক পাশে রয়েছে তুর্কি ঘরানার ছোট্ট ছোট্ট ক্যাফে ও হস্তশিল্প বিক্রেতাদের দোকান, যারা আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে চায় এক কাপ চায়ের ছায়ায়। অন্য পাশে রয়েছে সেই পুরাতন পাথরের দেয়াল, যেখানে রোমান, বাইজানটাইন, সেলজুক, ও ওসমানীয় ইতিহাসের ছাপ একত্রে জেগে থাকে।

রাসেল ধরে যখন আপনি ধীরে ধীরে ওপরে উঠবেন, আপনি কেবলই উঠবেন না—আপনি পেছনে ফেলে যাবেন সময়। পেছনে পড়ে থাকবে নিচের শহরের

স্যান্ডহ্যামন সমুদ্র সৈকতে দোঁহে

কোলাহল, সমুদ্রের চঞ্চলতা, আর উপরে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবে আলানিয়া কাসেল, যা ১৩শ শতাব্দীতে সেলজুক সুলতান আলাউদ্দিন কায়কুবাদের আমলে নির্মিত হয়। পুরো দুর্গটি প্রায় ৬.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এবং ভিতরে রয়েছে ১৪০টিরও বেশি প্রাচীন টাওয়ার, হ্যামাম, মসজিদ ও জাদুঘর।

তবে এই পথের সবচেয়ে মুগ্ধকর বিষয় হলো, এটি কেবল গন্তব্যে যাওয়ার রাস্তা নয়ড়এটি নিজেই একটি গন্তব্য।

রাসেল হলো সেই স্থান, যেখানে আপনি হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে যেতে পারেন নিজের ভেতরের সত্তায়।

যেখানে প্রতিটি ধাপে আপনি অনুভব করতে পারেন কেমন ছিল সেই জীবন, যখন যুদ্ধ মানেই ছিল দুর্গ রক্ষা, শান্তি মানেই ছিল প্রাচীরের ভিতরের নির্ভরতা।

দুর্গচূড়া থেকে দিগন্তের পানে

যখন আপনি কাসেলের সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছান, তখন নিচের আলানিয়া শহরটিকে মনে হয় কোনো এক রূপকথার বইয়ের চিত্র। দূরের ক্লিওপেট্রা বিচের সোনালি রেখা, জাহাজে ভরা হারবার, আর সবুজ পাহাড়ে বোনা ঘরগুলোড়সব মিলিয়ে মনে হয় সময় এখানে থেমে আছে।

পর্যটকদের জন্য একটি পরামর্শ:

রাসেল ধরে কাসেলে উঠতে চাইলে হেঁটে যাওয়া সবচেয়ে আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতাড় বিশেষ করে বিকেলের দিকে, সূর্য যখন অস্ত যাওয়ার প্রস্তুতিতে থাকে। তবে চাইলে ছোট বাস বা ক্যাবেও যাওয়া যায়। কিন্তু সত্যিকারের ইতিহাস ও প্রকৃতির সংস্পর্শ পেতে হলে পায়ে হেঁটেই অনুভব করুন এই পথ।

আন্তালিয়া-আলানিয়া কোনো একক অভিজ্ঞতার নাম নয়। এটি সূর্যের আলোয় ঝলমলে ইতিহাস, নীল জলরাশির দোল, লোকজ গল্পের শহর। এটি সেই শহর, যেখানে আপনি শুধু ভ্রমণ করেন না—আপনি নিজেকে খুঁজে পান, কখনো নিজের আয়নায়, কখনো প্রিয় মানুষের চোখে।

এই যাত্রায় আমার পাশে ছিল মারিয়া—আমার সহধর্মিণী, আমার সহচরী, যিনি কেবল সঙ্গী নন, বরং প্রতিটি দৃশ্যের গভীরে যার হাসি, যার নীরবতা, যার অনুভব মিশে আছে। শহরের প্রতিটি অলিতে গলিতে, প্রতিটি রোদের টানে, প্রতিটি সমুদ্রের ঢেউয়ে তার উপস্থিতি যেন আমার অনুভূতির প্রতিধ্বনি হয়ে বাজে।

হয়তো আজ রাতে, হয়তো অনেক বছর পর, হয়তো কোনোদিনই না—তবু আমি জানি, একদিন আমার আর মারিয়ার পায়ের চিহ্ন পড়বে সেই নির্জন বাঁকে, যেখানে সমুদ্র নিঃশব্দে গল্প বলে, আর রোদ ঝরে পড়ে কোনো পুরানো দেওয়ালে। আমরা একসঙ্গে দাঁড়াবো সেই মুহূর্তে, যেখানে শহর আর স্মৃতি এক হয়ে যায়, সময় থমকে থাকে, আর জীবন তার প্রকৃত অর্থ খুঁজে পায়।

আন্তালিয়া-আলানিয়া, তুমি আর কেবল একটুকরো শহর নও—তুমি আমাদের দু'জনার মধ্যে ভাগ করে নেওয়া এক নীরব অনুভূতি, এক রৌদ্রাত স্মৃতি, এক মুহূর্ত যা চিরকাল বেঁচে থাকবে—ভাষার উর্ধ্বে, সময়ের সীমার বাইরে।

আমিশ গ্রামে এক শান্ত বিকেল

লোপা মমতাজ

এক সরল অথচ অদ্ভুত মায়ার ভেতর দিয়ে চলতে শুরু করেছিল আমার দিনটি। সাউথ পয়েন্ট, ইন্ডিয়ানার রাস্তায় ঘুরছিলাম উদ্দেশ্যহীন। কোথাও বিশেষ যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল না, এমনকি মনে কোনও প্রস্তুতিও ছিল না। শীতের দুপুর ধীরে ধীরে বিকেলের দিকে গড়িয়ে পড়ছিল। বাতাসে ছিল কনকনে শীতের ছোঁয়া, সেই সঙ্গে এক ধরনের শিথিলতা। আকাশ ম্লান, সূর্যের আলো নরম হয়ে পড়ছিল, মনে হচ্ছিল যেন আলোর ওপরও শীতের পর্দা টানানো।

আমি হাঁটছিলাম নিজের ভেতরকার এক নিঃসঙ্গতা নিয়ে, যেন কোথাও পৌঁছাতে হবে না, শুধু পথটুকু হেঁটে যেতে হবে। দেশের বাইরে এলে, সপ্তাহ পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনটা কেমন আকুপাকু করতে

থাকে। ফিরে যাবার একটা তাড়া মাথায় কাজ করতে শুরু করে। এই অবস্থাতেই হঠাৎ এক বাঙালির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পরিচিত ভাষার ডাক, পরিচিত হাসি-বিদেশ বিভুঁইয়ে এ এক অদ্ভুত টান। আমি ইন্ডিয়ানায় উঠেছি নটর ডেম ইউনিভার্সিটির একটি হলে, উনিও উঠেছেন অন্য এক হলে। সেই দিন তিনি আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন একটি বাঙালি পরিবারের দুপুরের খাবারে। বেশ আন্তরিক ভঙ্গিতে তিনি আমাকে তাঁর ওই বাসায় সঙ্গে যেতে বললেন। সেই মুহূর্তে আমি যেন দেশের গন্ধ পেলাম—ভাতের ধোঁয়া, গরম ডালের গন্ধ, আর টেবিলে হাসিমুখে বসা মানুষ। পরিবারটির সঙ্গে তিনি আমাকে ফোনে কথা বলিয়ে দিলেন। ওনারা বললেন, তাঁরা যে গ্রামে থাকেন, তা আমার ভালো লাগবে। তাঁদের কথার ভেতরে এমন এক দৃঢ়তা ছিল, যা আমাকে কৌতূহলী করল। আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। তখনও বুঝতে পারিনি, আমি আসলে এক অনন্য অভিজ্ঞতার পথে পা বাড়াতে চলেছি।

সকালের নাস্তা সেড়ে গাড়িতে চেপে আমরা মিডলবেরির দিকে রওনা হলাম। জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখলাম শহরের রূপ বদলে যাচ্ছে। রাস্তার দুই ধারে বড় বড় দোকান, রঙিন বিলবোর্ড, ক্রমে আধুনিক জীবনযাত্রার চিহ্নগুলো একে একে ফিকে হয়ে আসতে শুরু করল। জায়গায় জায়গায় তুষারের সাদা চাদর বিছানো মাঠ, মাঝে মাঝে কাঠের বেড়া আর দূরে ছায়ার মতো খামারবাড়ি। গাড়ির ভেতরে উষ্ণতা, আর জানালার ওপাশে শীতের হিমেল কামড়—এই দুই বিপরীতের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে মনে হচ্ছিল আমি যেন সময়ের ভেতর পিছিয়ে যাচ্ছি। যন্ত্রসভ্যতার আধুনিকতার গতি থেকে ধীরে ধীরে আলাদা হয়ে এক অচেনা শূন্যতায় ঢুকে পড়ছি।

মিডলবেরি গ্রামের ভেতরে ঢুকতেই প্রথম বিস্ময়টির মুখোমুখি হলাম—রাস্তায় কোথাও কোনো মোটরগাড়ির শব্দ নেই। শহরের কোলাহল পিছনে ফেলে এসেছি, কিন্তু এখানে যেন শব্দই বিলুপ্ত। তার বদলে কেবল শোনা যাচ্ছে ঘোড়ার খুরের ধীর ছন্দময় শব্দ, কাঠের গাড়ির কড়কড়ানি। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে একতলা কাঠের বাড়ি, সাদামাটা কিন্তু দৃঢ়। চিমনি থেকে সাদা ধোঁয়া উড়ছে। শীতল বাতাসে সেই ধোঁয়া যেন আরও ঘন হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। রাস্তায় খুব বেশি মানুষ চোখে পড়ল না। ঠান্ডার কারণে হয়তো তারা ঘরের ভেতরে গুটিয়ে আছে। দূরে চোখে পড়ল একটি ঘোড়ার গাড়ি, ভেতরে একটি পরিবার বসা। গাড়ির জানালার ফাঁক দিয়ে এক শিশু মুখ বের করে তাকাচ্ছিল বাইরের জগতের দিকে। তার চোখে ছিল এক ধরনের স্থিরতা, যেন সময়ের ধীর ছন্দে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আমি যতটা

আমিশ ভিলেজ এর প্রবেশমুখে

দেখলাম, তার চাইতে না-দেখা জগৎ যেন আরও গভীর, আরও রহস্যময়। এই এলাকায় যে কমিউনিটি বসত গড়েছে, তাদেরকে বলা হয় আমিশ। মিডলবেরি থেকে একটু দূরে তাদের মূল এলাকা শিপশেওয়ানা।

গ্রামের ভেতরে যতই হাঁটছিলাম, ততই পরিষ্কার হচ্ছিল যে এখানে সময় সত্যিই অন্যভাবে চলে। বিদ্যুৎ নেই, নেই টেলিভিশন বা মোবাইল ফোন। কেরোসিন ল্যাম্পের হলুদ আলোয় তাদের সন্ধ্যা আলোকিত হয়। আমি কল্পনা করছিলাম—রাত নামলে সেই আলোয় পরিবারের সবাই একসঙ্গে বসেড় কেউ সেলাই করছে, কেউ বই পড়ছে, কেউবা প্রার্থনায় মগ্ন। আধুনিক আলো-আঁধারের ঝলকানি থেকে দূরে, তাদের জীবনে আলোর মানে অন্যরকম।

তাদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়েও শুনলাম কিছু কথা। শিশুদের পড়াশোনা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। এরপর তারা সরাসরি জীবনের কাজে নামতে শেখে—কৃষিকাজ, কাঠের কাজ, গবাদি পশু পালন। এক বাঙালি বন্ধুর কাছ থেকে শুনলাম, আমিশরা মনে করে বইয়ের পড়াশোনা মানুষকে আধুনিকতার দিকে টেনে নেয়, কিন্তু জীবনের মূল দক্ষতা শেখায় মাঠ আর ঘর। অথচ আমাদের দেশে স্কুল-কলেজে না পড়লে ভেবে নেই ভবিষ্যৎ অন্ধকার, আর তাদের কাছে অষ্টম শ্রেণির পর জীবন আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—কারণ তখন থেকেই তারা হয়ে ওঠে পরিবার ও সমাজের সহায়ক শক্তি। এখানকার জীবনের মূল ভিত্তি হলো কৃষিকাজ। মানুষ নিজের হাতে জমি চাষ করে, গরু-ঘোড়া লালন করে, আর তার বিনিময়ে প্রকৃতির দানকে জীবিকার রূপ দেয়। ঘরে তৈরি রুটি, দুধ, সবজি—সবকিছুতেই আছে মাটির গন্ধ। আমিশদের পোশাকও আলাদা করে চেনার মতো। পুরুষরা কালো বা গাঢ়

আমিশদের ঘর-বাড়ি

রঙের জামা-প্যান্ট পরে, বিয়ের পর দাড়ি রাখে, কিন্তু গোঁফ রাখে না। নারীরা লম্বা হাতার ফ্রক পরে, মাথায় সাদা বা কালো কাপড়ের পর্দা। কোনো উজ্জ্বল রং নেই, নেই আধুনিক ফ্যাশনের ছোঁয়া। মনে হচ্ছিল, তারা যেন পোশাকের মাধ্যমেও নিজেদের আলাদা করে রেখেছেড়্পৃথিবীর স্রোতে ভেসে না গিয়ে, নিজেদের ধারায় স্থির থাকার ঘোষণা দিচ্ছে ।

এখানে এসে তাদের গ্রাম, তাদের জীবনযাপন দেখার পাশাপাশি একটা প্রশ্ন আমার মনে ঘুরছিল—"আমিশ" নামটার উৎস কোথায়? গুগলে তার উত্তর পেলাম। ইংরেজি শব্দ হলো Amish, উচ্চারণ হয় এমিশ বা আমিশ-এর মতো। তবে শুনলে মনে হতে পারে "আমিষ", যা বাংলায় non-veg বোঝাতে ব্যবহার হয়; কিন্তু এর সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের কোনো সম্পর্ক নেই। আসলে এই নাম এসেছে একজন ইউরোপীয় ধর্মীয় নেতার নাম থেকে। তার নাম ছিল জ্যাকব আম্মান। তিনি ছিলেন ১৭শ শতকের সুইজারল্যান্ড-জার্মানির আনাব্যাপ্টিস্ট আন্দোলনের নেতা। আম্মান বিশ্বাস করতেন, খ্রিস্টানদের জীবন হওয়া উচিত আরও সরল, শৃঙ্খলাপূর্ণ এবং বাইবেলের আক্ষরিক ব্যাখ্যায় নির্ভরশীল। তাঁর অনুসারীরা আলাদা হয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে পরিচিত হয় "আমিশ" বা আম্মানের অনুসারী নামে। আজ তিন শতাধিক বছর পরে, সেই নাম বহন করেই তারা আমেরিকার গ্রামীণ জীবনে টিকে আছে।

আমিশরা মনে করে, পৃথিবীর প্রতিযোগিতায় বা আধুনিকতার ভিড়ে না গিয়ে আলাদা হয়ে চলাই ঈশ্বরমুখী জীবনের পথ। আমিশদের জীবনধারা গড়ে উঠেছে 'গেলাসেনহাইট' নামের এক বিশ্বাসের ওপর। এই বিশ্বাসের মূল কথা হলো দুনিয়া থেকে নিজেকে আলাদা রাখা, বিনয়ের সঙ্গে বাঁচা, ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা, আর শান্তি ও শৃঙ্খলার জীবন-যাপন করা। তাই তাদের জীবনে নেই ভোটের রাজনীতি, নেই সেনাবাহিনীর শপথ, নেই সরকারি পাঠশালা। নিজেরাই ছোট ছোট স্কুল চালায়, শিক্ষক আমিশ কমিউনিটিরই একজন তরুণ-তরুণী যিনি হাইস্কুল শেষ করার পর পড়ান। তারা নিজেদের ভেতরেই গড়ে তোলে চার্চ ডিস্ট্রিক্ট, যেখানে প্রার্থনা, পারস্পরিক সহযোগিতা আর সামাজিক শৃঙ্খলাই হয়ে ওঠে জীবনের মূল স্তম্ভ। এই সমাজকে চালিত করে এক অলিখিত বিধান—'অর্ডনুং'। পোশাক কেমন হবে, চুলের ছাঁট কেমন, কার কীভাবে চলাফেরা বা পরিবহন ব্যবহার করা উচিত— সবকিছুই নিয়মে বাঁধা। তাই তারা মোটরগাড়ির পরিবর্তে এখনো ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে, আর এই সীমাবদ্ধতার পথই তাদের কাছে স্বাধীনতার পথ। বাইরের দুনিয়ার ঝলমলে বিভ্রান্তি থেকে দূরে থেকে তারা আধ্যাত্মিক জীবনের গভীরতাকে টের পায়, যেন নিস্তব্ধ কোনো নদীর ধারে বসে আত্মায় স্রোতের শব্দ শোনে।

আমিশদের সমাজব্যবস্থা সমষ্টিভিত্তিক। তারা নিজেদের ভেতরেই বিয়ে করে, বাইরের মানুষদের সঙ্গে নয়। শুনেছি, মাঝে মাঝে কিছু ছেলে-মেয়ে কৌতূহল নিয়ে কমিউনিটি ছেড়ে বাইরে যায়। তারা আধুনিক শহরে গিয়ে দেখে আলো,

আমিশ গ্রামের গাড়ি

প্রযুক্তি, নতুন জীবন। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই তারা আবার ফিরে আসে। কেন? কারণ শিকড়ের টান এত গভীর যে বাইরে গিয়ে যত স্বাধীনতাই পাক, ভেতরের শূন্যতা তাদের টেনে আনে সেই ঘোড়ার গাড়ি, সেই কাঠের ঘর, সেই পরিচিত প্রার্থনার কাছে।

আমি ভাবছিলাম—আমাদেরও কি এমন টান নেই? নিশ্চয়ই আছে—বিদেশে এলেই তো আমরা খুঁজি ভাতের গন্ধ, বাঙালিদের মুখ, বাংলার গান।

যে বাঙালি পরিবার আমাকে আমন্ত্রণ করেছিল, তাঁদের কর্তা খুব আন্তরিকভাবে নিজের ভাবনা শেয়ার করলেন। তাঁর যুক্তি ছিল— আধুনিক সভ্যতা যত উন্নত হোক, ভেতরে তার ভঙ্গুরতা অসীম। বিদ্যুৎ, প্রযুক্তি, ইন্টারনেট সবই যদি একদিন বন্ধ হয়ে যায়, শহরের মানুষ প্রথমেই বিপদে পড়বে। তিনি বললেন, আমিশদের জীবন এতটাই স্বনির্ভর যে বাইরের কিছু থেমে গেলেও তাঁদের জীবনে কোনো

নটর ডেম ইউনিভার্সিটি, ইন্ডিয়ানার ক্যাম্পসে

বিরতি আসে না। তাঁরা নিজেরাই খাবার উৎপাদন করে, নিজেরাই ঘর বানায়, গরুর গাড়িতে চলে। এই গ্রামটা আমার কাছে এক ধরনের বীমা—যদি সব ভেঙে পড়ে, এখানেই জীবন একইভাবে চলতে থাকবে। আমি তাঁর চোখেমুখে তৃপ্তি দেখলাম। সেই তৃপ্তির মধ্যে যেন এক ধরনের নিরাপত্তা লুকিয়ে ছিল। মনে হচ্ছিল, তিনি এমন একটি জায়গা খুঁজে পেয়েছেন, যেখানে অনিশ্চয়তার ভেতরও স্থিরতা আছে। খেতে বসে কথা বলতে বলতে তার ফোন বেজে উঠল—এটা ছিল তার প্রতিবেশির ফোন। কাউকে হাসপাতালে নিতে হবে, আর ঘোড়ার গাড়ির তুলনায় যান্ত্রিক গাড়ি বেশি গতিশীল। তারা নিজে যান্ত্রিক গাড়ি চালায় না, তবে চড়তে পারে। তাই আমাদের বিদায় দিয়ে তিনি গাড়ি নিয়ে প্রতিবেশীর কাউকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে যাবেন।

আমিশরা একা নয়। পৃথিবীর নানা প্রান্তে এমন মানুষ আছে যারা আধুনিকতা থেকে দূরে থেকে নিজেদের রক্ষা করে। উত্তর আমেরিকায় মেনোনাইট সম্প্রদায়—আমিশদের মতোই সরল জীবন বেছে নিয়েছে। তারা কিছু আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, কিন্তু শহরের ভিড় থেকে দূরে থাকে। কৃষিকাজ, গবাদি পশু পালন, হস্তশিল্প—এসবই তাদের অর্থনীতির মূল। দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া ও প্যারাগুয়ের চাকো অঞ্চলে শত বছর আগে ইউরোপ থেকে আসা জার্মানভাষী মেনোনাইট উপনিবেশ আছে। বিশাল জমিতে তারা সয়াবিন, ভুট্টা আর গম চাষ করে। বাইরের বাজারে বিক্রি করে বাঁচে, কিন্তু জীবনযাত্রা আজও সাদামাটা। এশিয়ার ভুটানে Gross National Happiness নীতি চালু আছে, যেখানে উন্নয়নের চেয়ে সংস্কৃতি আর প্রকৃতিকে রক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে এখনো পানির মিল, কাঠের ঘর, কৃষিকাজ নির্ভর জীবন চলে। এমনও গ্রাম আছে যেখানে শীতকালে বরফে ঢেকে যায় পুরো এলাকা,বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তারা বছরের পর বছর স্বনির্ভর থাকে।

আমাদের দেশেও আছে এমন জীবনযাত্রা। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠী প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। তারা জুমচাষ করে, বাঁশ-কাঠ দিয়ে ঘর বানায়, স্থানীয়ভাবে বোনা পোশাক পরে। বিদ্যুৎ আর ইন্টারনেট আসছে ধীরে ধীরে, কিন্তু জীবনের মূল ছন্দ এখনও প্রকৃতিনির্ভর। তাদের সামাজিক কাঠামোও সমষ্টিভিত্তিক, যা আমিশদের সঙ্গে আশ্চর্যরকম মিলে যায় ।

গ্রামের বিকেলে যতটা দেখেছি, তার চেয়ে অদেখা ছিল আরও অনেক কিছু। মিডলবেরির নির্জনতা মোবাইল ক্যামেরায় ধরে রাখলাম। আমিশরা ছবি তুলতে

পছন্দ করে না, এমনকি তাদের বাসাবাড়িতেও ঝোলানো কোনো ছবি চোখে পড়ে না। তাদের জীবনধারা আর বিশ্বাসের প্রতি সম্মান রেখেই আমি ক্যামেরা নামিয়ে রেখেছি। মিডলবেরি থেকে একটু দূরেই আমিশ গ্রাম শিপশেওয়ানা। দেখা হলো না অনেক কিছুই। রাস্তায় চোখে পড়ল কেবল কয়েকটি ঘোড়ার গাড়ি, ভেতরে বসে আছে পরিবার—তারা হয়তো কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে কিংবা ঘরে ফিরছে। গ্রামের ভেতরের আসল জীবন আমার চোখে ধরা পড়ছে না। ঘরের ভেতরে তারা কীভাবে দিন কাটায়, রাতের প্রার্থনা কেমন হয়, উৎসবের দিনে কেমন আনন্দে মেতে ওঠেড়এসব অদেখাই থেকে গেল। আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন সময়ের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পারছি না। কেবল জানালার ফাঁক দিয়ে অল্প আলো দেখতে পাচ্ছি। এই না-দেখাটাই আমাকে আরও বেশি টেনে রাখল।

যখন গ্রাম ছেড়ে বের হচ্ছিলাম, তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। এক কিশোরী ঘোড়ার গাড়ির চাকায় ধুলো উড়িয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটছিলো। বাতাসে ঠান্ডা ছিল আরও তীক্ষ্ণ, কিন্তু সেই ঠান্ডার ভেতরেও এক ধরনের স্থিরতা। গাড়ির জানালা দিয়ে শেষবার তাকালাম কাঠের বাড়িগুলোর দিকে, মনে হচ্ছিল এখানে সময় অন্যভাবে বয়ে যায়—ধীরে, অথচ গভীরভাবে। শহরের দিকে ফিরতে ফিরতে মনে হচ্ছিল, আধুনিক জীবন যতই গতিময় হোক, তার ভেতরে যেন এক ধরনের শূন্যতা লুকিয়ে আছে। মিডলবেরির বিকেল আমাকে শিখিয়েছে, প্রযুক্তি ছাড়া জীবন কল্পনার চেয়ে বেশি সম্ভব, যদি থাকে কমিউনিটি আর দক্ষতা। মনে হচ্ছিল, একবার এসে দেখা যথেষ্ট নয়। হয়তো আবারও আসব, আবারও সময়ের স্রোতে ডুব দেবড়সেই শান্ত বিকেলে, যেখানে আধুনিকতা অনেক আগে এসেও না এসে থেমে গেছে, আর জীবন এখনও ধীরে, অথচ গভীরভাবে বয়ে চলেছে।

শ্বেতহস্তিনামা

সেলিম সোলায়মান

শ্বেতহস্তি পোষার মানে আগে জেনেছিলাম, নাকি শ্বেতহস্তির দেশের খবর পেয়েছিলাম আগে, সঠিক বলা মুশকিল তা আজ। তবে জেনেছিলাম দুটোই যে বালকবেলায়, এ নিশ্চিত। এ ব্যাপারে স্মর্তব্য আরো এই যে, শ্বেতহস্তি পোষা বিষয়ক জ্ঞান লাভ করেছিলাম ব্যকরন বই মারফত, আর শ্বেতহস্তির দেশের পেয়েছিলাম খবর “বাংলাদেশের ডায়েরি” নামক এক পুস্তক মারফত।

তো সেই দেশের খবর যখন জেনেছিলাম, তখনকার কালে সাধারণ জ্ঞানের অগাধ ভাণ্ডার হিসেবে তুমুল জনপ্রিয় এবং আমার কাছে অসাধারণ বলে বিবেচিত সেই বইটি থেকে; সাথে সাথেই সম্ভবত সেটিকে ব্যাকরণবইলব্ধ নিজের শ্বেতহস্তি বিষয়ক জ্ঞানের সাথে (হতে পারে উল্টোটাও) ব্যাপারটিকে এক সাথে ঘুটে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম যে, নিশ্চয়ই

ঐ দেশটি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ! তা না হলে ঐ দেশে শুধুই সাদা হাতিদেরই বসবাস কেন? এমনিতেই হাতি পোষা যখন বিরাট ব্যাপার, সেক্ষেত্রে সাদা হাতি পোষা যে আরও তুমুল ঘটনা, তা তো ঐ বাগধারা মারফতই জেনেছিলাম। যার মানে হচ্ছে বালকবেলার সেই কল্পনায়, ঐ দেশের সব হাতিই সাদা না হলেও, ওখানে অবশ্যই যে আছে অসংখ্য সাদা হাতি বনবাদাড়ে যেমন, আছে তেমনি নানান জনের পিলখানায়, ভেবেছিলাম এমনটাই। তদপুরি ধরে নিয়াছিলাম আরো যে, নিশ্চয় ওইদেশের রাস্তাঘাটে, পথে প্রান্তরে, গঞ্জে বাজারে, সার্কাসের কর্মচারী বা স্বাধীন মাহুতেরা সারাক্ষণই সাদা হাতি দিয়ে খেলা দেখিয়ে বেড়ায় !

শ্বেতহস্তি বিষয়ক সেই জ্ঞানলাভের ধারণা করি দেড় কী দুই দশক পর এবং এখন থেকে গুনে গুনে তিরিশ বছর আগে অতপর প্রথম গিয়েছিলাম যখন সেই শ্বেতহস্তির দেশে, তখন সেখানকার রাস্তার মোড়ে মোড়ে, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার সামনে, নানান আকারের হাতির যতো ভাস্কর্য দেখেছি ও উচ্চশ্রেণীর শপিংমলের অভিজাত দোকান থেকে শুরু করে ফুটপাতের বিক্রেতাদের কাছে অসংখ্য যেসব হাতির মডেল দেখেছি, তাতেও যেমন সাদা হাতি খুব একটা চোখে পড়েনি , তেমনি জ্যান্ত হাতি যে কয়েকটা দেখেছিলাম একটিও তার সাদা ছিল না ! চকিতেই তাতে মনে পড়েছিল হুমায়ুন আজাদের কবিতার সেই চরণসমূহ

"হে পুত্র, তুমি কিছুতেই বিশ্বাস রেখো না। ইস্কুলে

শেখাবে যে-সব মস্ত মিথ্যা, তাতে কখনোও ভুলে

বিশ্বাস কোরো না। তোমার সামনে খোলা যে-পুস্তক

জেনো তা প্রচণ্ড ভণ্ড, মিথ্যাভাষী, আর প্রতারক।

মনে রেখো যারা গলে ওই সব মুদ্রিত মিথ্যায়,

পরাজয় নিয়তি তাদের, তারা ধ্বংস হয়ে যায়।"

ব্যাপার হচ্ছে ,কবি ও বিজ্ঞানী দুজনেই সত্যসন্ধানী হিসেবে মান্য, জ্ঞানীগুণীজনদের কাছে। সে কারনে নির্বোধ আমিও অতি সহজে জ্ঞানীগুণীজনদের কাতারভুক্ত হওয়ার লোভে, এব্যাপারে তাদের সাথে একাট্টা একমত। এছাড়াও এ অধম মনে করি, সত্যসন্ধানে দুজনেরই যাত্রা শুরু হয় একই পথে। তবে পরবর্তীতে ঐ যে গান আছে না , সেই গানের কথা মতোই, দুজনের দুটি পথ অবশ্যই বেঁকে যায় দুটি দিকেই। সে পথ হলো কল্পনার। অকবি ও অবিজ্ঞানী আমার কল্পনার দৌড়ও অতিব সীমাবদ্ধ, অথচ লোভ তুমুল, সে পথ ধরার। কিন্তু সে যাত্রা তো শুরুই হয়নি আজো। কবি ও বিজ্ঞানী দুজনকেই সে জন্যই হয়তো আরো একইসাথে সত্য মানি।

এছাড়া স্কুল কলেজে তো ছিলাম বিজ্ঞান বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের পঙক্তিভুক্ত, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ তো একদম প্রাণীবিদ্যা বিষয়েরই; ফলে শ্বেতহস্তির দেশে গিয়ে শ্বেতহস্তির দেখা না পেয়ে, প্রথমে কবির কথা মনে পড়লেও, তারই পিছু পিছু

যৎসামান্য প্রানিবিদ্যা বিষয়ক যে জ্ঞান ছিল, মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল তাও; সে সময়!

ফলে বহুদিনের অযত্নে জমা ধুলো ঝেড়ে পুছে, নিউরনে রক্ষিত প্রাণীবিদ্যা বিষয়ক তথ্যের ভাণ্ডার হাতড়ে খুঁজতে শুরু করছিলাম, শ্বেতহস্তি বিষয়ক তথ্যউপাত্ত। এতে প্রথমেই যে তথ্য মনে পড়েছিল তা হল, হাতি প্রধানত দুই প্রকার; আফ্রিকান হাতি ও এশিয়ান হাতি। সাথে এও মনে পড়েছিল যে আফ্রিকান হাতিদের মধ্যে সম্ভবত দুটো প্রজাতি আছে। আর এশিয়ান হাতি, ইন্ডিয়ান হাতি নামেও পরিচিত।এ ছাড়াও হাতি বিষয়ে যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে এসেছিল আরো, তা ছিল হাতির ক্রমবিবর্তনের বিষয়টি।

প্যালিওন্টোলজিস্টরা আজ পর্যন্ত এ গ্রহে নানান সময়ে বিরাজিত ও বিচরিত যেসব প্রাণীর কালানুক্রমিকভাবে পূর্ণাঙ্গ ফসিল পেয়েছেন, তার মধ্যে হাতি অন্যতম। ঐসব ফসিলে ফসিলে যে সত্য লেখা আছে, তা অনুবাদ করে বিজ্ঞানীরা এই সত্যে পৌঁছেছিলেন যে, আজকের অতিকায় হাতি একসময় আকারে বড় জোর দু/তিন ফুট উচ্চতার ও মেরে কেটে ১০/১২ কেজি ওজনের একটি প্রাণী ছিল। গভীর মনোযোগে ফসিলভিত্তিক হাতির বিবর্তনের সেই বিষয়টি পড়েছিলাম, প্যালিওন্টোলজি ও ইভ্যুলিউশন পেপারে, পরীক্ষায় ভাল নম্বর তোলার আশায়।

ঘটনা হচ্ছে আমার প্রথম শ্বেতহস্তির দেশভ্রমণের সময়ের হাতিবিষয়ক ভাবনার নিরিখে ঐসব তথ্য মোটেও লাগসই হচ্ছিল না। তবে একদম যা কাজে লাগে নি, তাও না। প্রথম তথ্যে এটুকু তো নিশ্চিত হয়েছিলাম যে আফ্রিকান বা এশিয়ান হাতির কোনটার রংই সাদা নয়। এছাড়া শ্বেতহস্তির দেশে যে হাতি পাওয়া যায়, তা ঐ এশিয়ান হাতিরই জ্ঞাতিগোষ্ঠী।

তার মানে কী? এর মানে কী দাঁড়ায় এই যে, শ্বেতহস্তি বিষয়টি এমনি এমনিই প্রচলিত হয়েছে? হ্যাঁ দিকে দিকে মানব সমাজের নানান গল্পে, উপকথায়, মিথে নানান ধরনের আজিব জীবের বিবরণের মতো সাদা হাতির কথাও যেহেতু আছে, সেহেতু ধরেই নেয়া যায় যে ঐ ধারণাটিও, মিথ, গল্প বা রূপকথা থেকেই তবে প্রচলিত হয়েছে সমাজে। যেমন শুনেছি ভারতীয় মিথে, ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতের রং ছিল সাদা। ব্যাপার হচ্ছে সেই ঐরাবতের চারটা না পাঁচটা মাথায়, সাত সাতটা শুঁড় থাকলেও, বাস্তবে মানুষ শুধু ঐ সাদা রঙটাকেই ধারণ করেছে মনে হচ্ছে তার বিশ্বাসে।

তদপুরি সেসময় এও মনে পড়েছিল যে ছোটবেলায় কোন এক গল্পে পড়েছিলাম, অপুত্রক কোন এক রাজার পঞ্চত্বপ্রাপ্তিতে পরবর্তী রাজা কে হবেন, তা নিয়ে সকলে ভীষণ ঝঞ্ঝাটে পড়লে, রাজার পিলখানার সাদা হাতি সে সমস্যার সমাধান দিয়েছিল। সমগ্র রাজ্য দৌড়ে, ঘুরে ঘুরে, অবশেষে সেটি কোন এক রাখাল বালককে শুঁড় দিয়ে প্যাঁচিয়ে তুলে এনে সিংহাসনে বসিয়েছিল। সে গল্প পড়ার পর আমারও যে কতবার

রাখাল হয়ে গরু ছাগল চড়াবার ইচ্ছা জেগেছিল, তারও তো নাই ঠিক ঠিকানা নাই কোন!

সেসময় এসব ভাবতে ভাবতেই মগজের তথ্যভাণ্ডারে প্রাণিবিদ্যার জেনেটিক্স বিষয়টির যে সামান্য কিছু তথ্য জমা ছিল সেসব হাতড়াতেই মনে পড়েছিল, আমাদের দেশ থেকে শুরু করে একদম ঘোরতর কালো রঙ্গয়ের আফ্রিকান মানুষদের মাঝেও তো জেনেটিক বিভ্রাটে একদম সাদা মানুষের যেমন জন্ম হয়, ঘটতে তো পারে তেমন হাতিদের মধ্যেও । অতএব সাদা হাতি ব্যাপারটা শুধু গল্প, মিথের বিষয় না হয়ে বাস্তব ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনাই সুপ্রচুর। তবে প্রকৃতির খেয়ালী বেখেয়ালি ব্র্যান্ডমনেসের ভেল্কিতে ঐ জেনেটিক বিভ্রাটও ঘটে যেহেতু কালেভদ্রে, সেহেতু সাদাহাতির জন্মও একটি বিরল ঘটনা হওয়াই স্বাভাবিক।

কালো মানুষদের মাঝে সভ্যতার সেই প্রাতকাল থেকেই তাদের উপর বীভৎস নিপীড়ন চালানো সাদা মানুষদের গাত্রবর্ণটির প্রতি তীব্র মোহ থাকলেও, নিজেদের জেনেটিক বিভ্রাটজনিত কারণে একদম সাদা এলবাইনো শিশু জন্মালে, সে কিন্তু বাড়তি খাতির পায় না। অথচ একই ঘটনা ঘটে যখন হাতির জগতে, এই মানুষই সেটিকে দেয় সুউচ্চ মর্যাদা। ব্যাপার তো দেকি বড়ই আচানক!

সে যাক শ্বেতহস্তির দেশভ্রমণের কথা লিখতে গিয়ে এইমাত্রই হুঁশ হয়েছে অধমের যে, এরই মধ্যে অধমের আজন্ম বদভ্যাসের কারণে ভ্রমণ বাদ লিখে ফেলেছি এক শ্বেতহস্তিনামাই ! আসা যাক এবার তবে মূল বিষয় ভ্রমণে।

ব্যাপার হচ্ছে সেই কিশোর বয়স থেকেই কিরো বেনহামের হাত দেখা সম্পর্কিত বই সামনে ধরে , নিজ করতলে বিদেশ ভ্রমণ রেখার হদিস খুঁজে বেড়ালেও, ভুলেও ভাবিনি কখনো চাই যেতে কোন দেশে ! তবে এও ঠিক, কোনমতে দেশের সীমান্ত পার হলেই বিদেশ ভ্রমণ হয়ে গেল, এমনও মনে করিনি কেন জানি! ফলে ভারতভ্রমণকে বিদেশভ্রমণ রেখার সাথে মিলাইনি মোটেও। এমতাবস্থায় পেশাগত কারণে ১৯৯৫ সনে প্রথম যখন বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ এসেছিল, তাতে আনন্দে আটখানা নয় হয়েছিলাম ষোলআনাভাবে ষোলখানাই ।

কারণ গন্তব্যটি যে ছিল আমার, সে সময়ের ইউরোপিয়ান আম্রিকানদের কাছে ভ্রমণের জন্য অন্যতম জনপ্রিয় শহর বলে বিবেচিত ব্যাংকক! আর আম্রিকান ইউরোপিয়ানদের ধামাধরাই তো আমাদের মজ্জাগত! ফলে বিদেশ ভ্রমণের খাতা খুলতে গিয়ে প্রথম চোটের সেই ব্যাংককযাত্রা নিয়ে বড়ই উত্তেজিত উদ্বেলিত ছিলাম। শুধু আমিই কেন ? আমার সেই ব্যাংকক যাত্রার খবর, সেসময় বন্ধু সহপাঠী আত্মীয় প্রতিবেশী মহলেও হয়ে উঠেছিল আলোচ্য বিষয়। সেসব আলোচনায় আমার ঐ বিদেশভ্রমণ নিয়ে, সরবে সকলেই বাহবা দিলেও, অন্তরে অনেকেই যে ছিলেন তুমুল ঈর্ষান্বিত, টের পেয়েছিলাম তাও।

একথা বলার কারণ, ঢাকা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বের ব্যাংকক শহরে আজকাল প্রতিদিন সরাসরি ঢাকা থেকে উড়ে যায় কমপক্ষে ৫টি এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট, তারপরও ব্যাংকক যাওয়ার জন্য যে কোন মাসের সপ্তাহের ছুটির দিন বাদে অন্যান্য দিনের টিকিট কষ্টেসৃষ্টে পাওয়া গেলেও, সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে হয়ে গেছে তা শ্বেতহস্তির দেখা পাওয়ার মতোই ঘটনা আজ ! অথচ ১৯৯৫ সনে এই রুটে থাই এয়ারলাইন্সের সবেধন নীলমণি যে ফ্লাইটটি উড়াউড়ি করতো, সেটিও পুরোপুরি ভরার জন্য যাত্রী পাওয়া যেত না অনেক সময়।

এমতাবস্থায় আমার সেই প্রথম ব্যাংকক যাত্রার তিরিশ বছর পর, এ বছর সপরিবারে ওখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভিসার খোঁজ নিতে গিয়ে শুনি, একসময় পারলে সেধে সেধে দিতো যেই ভিসা, সেটি পাওয়াও নাকি এখন হয়ে গেছে শ্বেতহস্তির মতোই বিরল!

চিয়াংমাইয়ের ঐতিহাসিক ওয়াত চেদি লুয়াং বৌদ্ধ মন্দির

এ প্রসঙ্গে আরেকটি ব্যাপার কবুল করে নিচ্ছি, তা হলো অধমের ভ্রমণসমূহের বেশির ভাগই পেশাগত হওয়ায়, বিদেশ ভ্রমণের অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গ ভিসা নেয়া, টিকিট করা, এসব ব্যাপারে আমি যে একেবারে নবিস বুঝতে পেরেছি তা, ছেড়েছি যখন কর্পোরেটজগৎ। পেশাগত জীবনের শেষ দুই যুগেরও অধিক সময় ধরে বছরে করেছি যত ভ্রমণ, সেগুলোর ভিসা, টিকিট, হোটেল বিষয়ক সকল কিছুই পরম নিষ্ঠায় ও যত্নে সামলেছে আমার সহকারীরাই! অতএব এই ভিসা নেয়া যে সময়ে সময়ে, কী রকম গব্বযন্ত্রনার হতে পারে, তা তো টের পাইনি! ফলে এখন যখনই মুখোমুখী হই সেই যন্ত্রণার, তাতে একদিকে যেমন তুমুল কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি আমার সুপ্রিয় সহকারীদের, তেমনি দেই নিজের পরগাছাসুলভ অকর্মণ্যতাকে ধিক্কার।

এবার তাই নিজের সেই অক্ষমতাকে সক্ষমতায় পরিণত করার মানসে নিজেই অনলাইন ভাণ্ডার ঘেঁটে, থাই ভিসা ফরম নামিয়ে, পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র একাট্টা করে এক ট্রাভেল এজেন্সির এক এক্সপার্টের শরণাপন্ন হতেই, উনি যখন বোঝালেন কী কঠিন আর জটিল হয়ে উঠেছে আজকাল থাই ভিসা পাওয়া, হতাশ হয়েছিলাম ভীষণ। সবচেয়ে বেশি হতাশাটি ছিল, আমার বোনের এই ভিসা পাওয়ার সম্ভাবনা যে সুদূরপরাহত, তার সেই রায় শুনে! কপাল ভাল যে, সেসময় ট্রাভেলমেটের স্বত্বাধিকারী সুহৃদ রোটারিয়ান বাবর ভাইয়ের কথা মনে পড়েছিল। তাতে ওনাকে ফোন করতেই, বলেছিলেন উনি

"আরে দূর, বলেন কী! আপনার ও আপনার পরিবারের জন্য এ তো কোন ব্যাপারই না। পাঠিয়ে দেন সব আমার কাছে।"

তাতে আশায় বুক বেঁধে অচিরেই সবকিছু তার অফিসে পাঠিয়ে দিলে, অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা পরদিন ফোনে বলেছিলেন, গত তিন চার বছরে আমি যেহেতু একবারও যাইনি থাইল্যান্ডে, খুব ভাল হয় আমি যদি আমার এর আগের থাইল্যান্ড ভ্রমণের সব ভিসাগুলোর ফটোকপি পাঠাই।

তো তার পরামর্শ মাথা পেতে নিয়ে পুরানো সব পাসপোর্ট ঘেঁটে ঘেঁটে থাই ভিসার ফটোকপি করতে গিয়ে প্রথমবারের মতো হৃদয়ঙ্গম করিলাম যে, গত তিরিশ বছরে থাইল্যান্ড গিয়েছে এ অধম সর্বমোট ২৭ বার ! এভাবে হঠাৎ নিজের এই সত্যের মুখোমুখি হয়ে মনে পড়েছিল ফের, মহামতি সক্রেতিস উচ্চারিত নিতান্তই সাধারন অথচ অমোঘ শব্দদ্বয় "নিজেকে জানো'র কথা! সাথে এও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, বিগত ২৭ বার শ্বেতহস্তির দেশে গিয়ে শ্বেতহস্তির দেখা না পেলেও, এবার ভিসা পেলে অবশ্যই দেখে আসবো শ্বেতহস্তি। নিশ্চয়ই এমনি এমনি ঐ নাম হয়নি, দেশটির।

কথা হচ্ছে আসলেই কী পাবো ভিসা? কারণ ভিসার জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় না হলেও ভিসাদাবি পোক্ত করার জন্য অতিরিক্ত বেশ কিছু দলিল

দস্তাবেজ বাবর ভাইয়ের অফিসে জমা দেওয়ার পর, ওনার কাছ থেকে জোরালো নিশ্চয়তা পেলেও, এরপর থেকেই নানান সুহৃদ পরিচিতজনের কাছ থেকে এই ভিসার ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতা যা শুনতে শুরু করলাম, তাতে মনে হল আরে এই ভিসাই তো মনে হচ্ছে বাংলাদেশীদের জন্য শ্বেতহস্তি দেখার মতই এক দুর্লভ ঘটনা হয়ে উঠেছে! মানে কী এর? কী এমন ঘটে গেল এরই মধ্যে যে থাইরা আজকাল বাংলাদেশীদের ভিসা ইস্যু করার ব্যাপারে এরকম হাতটান করে আছে?

আচ্ছা ভিসা দিলে যাবো, না দিলে যাবো না। এ নিয়ে হুদাই চিন্তা করে কী লাভ? যদিও আমার এবারের থাইল্যান্ড যাওয়ার উদ্দেশ্যের সাথে অন্যবারের যাওয়াগুলোর বেশ পার্থক্য আছে। অবশ্য এরকম পার্থক্য শুধু যে আমারই হয়েছে তাও নয়, হয়েছে এটা আরো অনেকের ক্ষেত্রেই গত তিরিশ বছরে। আগে তুমুল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশী ব্যাংকক যেত মূলত ব্যবসায়িক বা সৌখিন কেনাকাটার সাথে নিষিদ্ধ বিনোদনের মিলিত উদ্দেশ্যে। সে জায়গায় এখন কিন্তু একটা বড় সংখ্যার লোকজন যান ওখানে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে। তাতে বেশ আগে থেকেই ওখানকার অনেক হাসপাতালে বাংলাদেশীদের জন্য তৈরি হয়েছে খাঁটি বাংলায় বাৎচিত চালানোর ডেস্ক। এই আমি গত তিন দশকে যে ২৭ বার গেলাম ঐ দেশে, সেগুলোরই কোনটিতেই চিকিৎসাবিষয়ক উদ্দেশ্য না থাকলেও, এইবার কিন্তু আছে তা আমার।

ঘটনা হচ্ছে আমার বউয়ের পায়ের গোড়ালির একটা সমস্যার সামধান গত ছয় সাত মাসে, দেশের ৭/৮ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পুরোপুরি দিতে না পারাতে ঠিক করেছিলাম নেবো শরণ ব্যাংককের কোন একটা হাসপাতালের। এপয়েন্টমেন্টও নিয়েছি সে মোতাবেক। এ কারণে এমনও ভেবেছিলাম যে, করবো নাকি মেডিক্যাল ভিসার আবেদন? সে ভাবনায় এ বিষয়ে নানানজনের অভিজ্ঞতার বয়ান শুনে মনে হয়েছিল, সেক্ষেত্রে তারা নানান শর্ত সাপেক্ষে আমার স্ত্রীর ভিসার সাথে আমাকে ভিসা ইস্যু করলেও, বোনের ভিসা আবেদন হয়ে যেতে পারে নাকচ। সেজন্য ঐ ঝুঁকি না নিয়ে তিনজনের জন্যই আবেদন করেছি টুরিস্ট ক্যাটাগরিতে।

সেই থেকে এ বিষয়ে নানান এলে বেলে চিন্তা করতে করতে একদিন মনে হয়েছিল, এই যে এবারের ভিসা আবেদন করতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম গিয়েছি তিন দশকে থাইদেশে তিন নং সাতাইশ বার, তাতে থাই ভাষাই বা কতোটাই রপ্ত করতে পেরেছি দেখি তো ?

সে চিন্তায় নিজে একই সাথে পরীক্ষক ও পরীক্ষক সেজে দেখলাম, "সোয়াজদিকা" ও "কাপ কুন কা" এই দুটিতেই ঘটছে এখনো আমার। একই সাথে এও মনে পড়ল যে বেশ আগে এক সন্ধ্যায় থাই সহকর্মী ও বন্ধুনি সুনাইয়ানার ও আমি সেদিনের মিটিং শেষের ককটেল পার্টির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে গল্প করতে করতে মনে হয়েছিল হঠাত, আচ্ছা সুনাইয়ানা মানে কী বাংলায়, যাকে বলে সু নয়না তাই? আর

ওটা মনে হতেই সাথে সাথেই সুনাইয়ানাকে ইংরেজিতে প্রশ্নটি করতেই, সে তার থাইচোখ এক্কেবারে কপালে তুলে বলেছিল

"তুমি জানলে কিভাবে? থাই শিখেছ নাকি?"

সে সন্ধ্যায় যেই না বুঝেছিলাম ঝড়ে বক পরেই গেছে তাই তার প্রশ্নের উত্তর দেয়া এড়িয়ে সুন্দরী সুনাইয়ানা কে আরো চমকে দেয়ার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাহলে সুবার্ণাভূমি মানে নিশ্চয় গোল্ডেনফিল্ড। আর ভূমিবল মানে ল্যান্ডলর্ড বা ভূমির অধীশ্বর!

এতে বান্ধবী পার্ল মানে সুনাইয়ানা সে সন্ধ্যায় ধরে নিয়েছিল নির্ঘাত হয়ে উঠেছি আমি থাই ও বাংলা ভাষার একজন তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক। যে ভুল তার আমি ভাঙ্গাইনি আর। কারণ নারীবিষয়ে তুমুল অনভিজ্ঞ আমার মনে হয়েছিল, সুন্দরীদের ভুল ভাঙ্গাতে নেই।

পুরানো সেই কথা মনে হতেই ভাবলাম আরো, নাহ এইবার ভিসা মিলেই যদি যায়, তবে শুধু শ্বেতহস্তিই দেখবো না, বান্ধবী সুনয়নার সাথেও করবো দেখা। এমত ভাবনার সাথেই মনে হল আরো, বান্ধবী ভুল করে আমাকে তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক মনে করলেও এবং আমি অবশ্যই তা না হওয়ার পরও, একটা ব্যাপারে তো অবশ্যই তুলনামূলক আলোচনা করতেই পারে এ অধম!

নাহ গুরুগম্ভীর ও বিশাল কোন বিষয় না ওটা। এমনিতে খুবই সামান্য বিষয় হলেও ভ্রামণিকদের জন্য তা অসামান্য। তা হলো ভিসাতত্ত্ব। অন্য কোন দেশ বাদ থাকুক, তিরিশ বছরে থাই ভিসা পেতে গিয়ে নানান সময়ে যে সব অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার, তাতে এ নিয়ে অবশ্যই করতে পারি তুলনামূলক ভিসাতাত্ত্বিক আলোচনা। বিগত তিন দশকের নানান বাঁকে বদলেছে থাই ভিসা আবেদনের ও প্রাপ্তির গতিপ্রকৃতি যেমন , তেমনি জমেছে এ নিয়ে নানান অভিজ্ঞতাও

যেমন প্রথমবার যখন গিয়েছিলাম থাইল্যান্ডে সেই ১৯৯৫ সনে, গিয়েছিলাম সেসময় দুই সহকর্মী নাজমুল হাকিম ও ইসমাত জাহান রুপা সহ তিনজন আমরা। সে সময় যে ট্রাভেল এজেন্সি আমাদের এ বিষয়ে সার্ভিস দিত, অফিস ছিল তাদের সোনারগাঁও হোটেলে। নির্বোধের মতো ধরে নিয়েছিলাম আমি এই যে, ঐ ট্রাভেল এজেন্সি যেভাবে আমাদের নানান বসদের কাছ থেকে তাদের পাসপোর্ট নিয়ে গিয়ে ভিসাটিসা করিয়ে তুমুল তমিজের সাথে পৌঁছে দিয়ে যায় অফিসে, দেবে আমাদের তিনজনকেও ঐরকমই সার্ভিস! আসলে সে সময়ের নিতান্তই ছোটমাপের কর্মকর্তা আমরা ধারণাই করিনি যে, ঐ এজেন্সির লোকজন খুব ভাল করেই আমাদের অফিসের ফ্রিকুয়েন্ট ফ্লায়ারদের চেনেন।

ফলাফল, সেই ল্যান্ডফোনে যুগে ঐ অফিসের যিনি আমাদের ফোন রিসিভ করেছিলেন, ভদ্রতা করে জানিয়েছিলেন তিনি যে, সে মুহূর্তে তাদের অফিসে এমন

কেউ নাই যে আমাদেরকে ভিসা ফরম দিয়ে আসতে পারে। তবে চিন্তা নাই, তিনি কি চারদিন পর আমাদের কোন এক বড় বসের টিকিট পৌঁছে দিতে তাদের লোক যাবে যখন আমাদের অফিসে, তখন উনি চেষ্টা করবেন আমাদের তিনজনের জন্য তিনটা ভিসা ফর্ম পাঠিয়ে দিতে! সাথে বেশ জোরের সাথে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, ভিসা ফরম পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আমাদের নিজেদেরকেই যেতে হবে থাই এম্বেসিতে। ঐ এজেন্সি থেকে এরকম উত্তর পেয়ে বেশ দমে যেমন গিয়েছিলাম, আহতও হয়েছিলাম তেমনি ভদ্রোচিত তাদের ঐ অবজ্ঞায়।

সে যাক, হাতে আমার কিরো বেনহ্যাম বর্ণিত বিদেশ গমনরেখা থাকুক বা না থাকুক, সেই প্রথম যেহেতু সুযোগ এসেছিল হাতে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ, ঐ অবজ্ঞা কী আর ঠেকাতে পারে সেই বিদেশগমন? ফোন রেখেই তাই সাথে সাথেই সহকর্মী নাজমুলকে সহযাত্রী করে রিক্সা নিয়ে হাজির হয়েছিলাম দ্রুততম সময়ে ঐ ট্রাভেল এজেন্সিতে, ভিসা ফরম নিতে ও থাই এম্বেসির ঠিকানা সাকিন জানতে।

এরপর দিন দুয়েকের মধ্যেই সাত সকালেই ত্রিমূর্তি হাজির হয়েছিলাম গভীর মনোযোগে পূরণকৃত ভিসা ফরম, অফিসের চিঠি ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজ নিয়ে পাসপোর্টসহ থাই এম্বেসির গেইটে। সঠিক মনে নাই আজ, সে সময়ের থাই এম্বেসির গুলশানস্থ সেই বাড়িটির ঠিকানা। কিন্তু চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাই এখনো গাছপালাবেষ্টিত সম্ভবত গুলশান দুইয়ের ছায়াসুনিবিড় একতলা নাকি দোতলা সেই বাড়িটি।

মনে আছে আশু প্রথম বিদেশ ভ্রমণের উত্তেজনায় আমিই বাধ্য করেছিলাম সেদিন নাজমুল ও ইসমাতকে সকাল আটটার আগেই এম্বেসির সামনে হাজির হতে, যদিও তখনও খোলেইনি এম্বেসির ফটক। তবে ঐ রকম সাত সকালে হাজির হওয়ার উপকার পেয়েছিলাম হাতে হাতে তিনজনই। তা হলো সেদিনকার সকালে এম্বেসির সামনে জড়ো হওয়া সর্বমোট আট কি দশজন ভিসাপ্রত্যাশীদের মধ্যে আমরা তিনজনই আগে জমা দিতে পেরেছিলাম ভিসাআবেদন । তারপর সেই দিনের ৪ কি ৫ দিন পর, মানে পরের সপ্তাহের নির্দিষ্ট এক দিনে তিনজনে ফের গিয়েছিলাম দুপুর দুইটা না জানি তিনটার দিকে পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে দুরু দুরু বক্ষে। নাজমুল বা ইসমত মনে মনে কী ভাবছিল সেসময়, জানি না । তবে আমার কেন জানি বারবারই মনে হচ্ছিল, ভিসা ফরমের কোন ভুলভাল বা ডকুমেন্টসের কোন ত্রুটির জন্য, যদি ভিসা না দেয়!

কপালের জোর কখনোই আমার না থাকলেও, সেবার অবশ্যই ঐরকম কোন দুর্ভোগ নেমে আসেনি কপালে। পাসপোর্ট হাতে পেতেই, এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে দ্রুত পাসপোর্টের পাতা উল্টিয়ে নীল কালির স্ট্যাম্প সিলের উপর হাতে লেখা প্রয়োজনীয় তথ্যের নীচে ভিসা অফিসারের স্বাক্ষরিত সেই ভিসাটি দেখে, অবস্থা হয়েছিল আমার

"হৃদয় আমার নাচেরে, ময়ূরের মতো নাচেরে আ আ আ আ"

এ ছিল শ্বেতহস্তির দেশে যাবার আমার প্রথম ভিসা পাওয়ার অভিজ্ঞতা। তো সেই সময় থেকে দুই কি তিন বছর পর, আবারো অফিসিয়াল একটি মাটিঙয়ে এ যোগ দেবার আমন্ত্রণ পেতেই, গুলশানের সেই একই দালানে ভিসা আবেদন জমা দিতে গিয়ে মনে হয়েছিল, আরেহ দিন তো বদলেছে দেখি অনেক!

যতোই আমি গিয়ে থাকি না কেন আগেরবারের মতোই এম্বেসির ফটক খোলার আগেই, অকুস্থলে উপস্থিত হতে দেখি আরো অনেকেই হয়েছে হাজির আগেই। তবে সমস্যাও হয়নি তেমন। শুধু এরই মধ্যে লম্বা হয়ে যাওয়া লাইনের সবার পেছনে দাঁড়াতে হয়েছিল। তারপরও সেদিনের সান্ত্বনা ছিল এই যে এম্বেসির দরোজা খোলার আগ পর্যন্ত ক্রমে আরো অনেক ভিসা প্রার্থী আমার পেছনে এসে দাঁড়ানতে অবস্থান হয়েছিল আমার লাইনের মাঝামাঝিতে, তাতে ঘণ্টা দুইয়ের মতো লেগেছিল ভিসা আবেদন জমা দিতে। ভিসা আবেদনকারীদের লাইন বড় হয়ে যাওয়াকে অনুবাদ করে সেদিন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম যে তিন বছরে বাংলাদেশীদের থাই ভ্রমণ যা বেড়েছে তা অবশ্যই তিন গুণের বেশিই হবে।

সে যাক ঐ ভিসা আবেদন জমা দিয়ে আসার পরপরই মুখোমুখি হলাম অফিসে এক আচানক ঘটনার! ব্যাপার হচ্ছে ঐ সব দিনগুলোতে আমাদের অফিসের মতোই সম্ভবত বিদেশী নানান কোম্পানির লোকই যেতেন বিদেশে ঘন ঘন, তবে সেই শিকে ছিঁড়তো, বড় বড় স্যারদের কপালেই বেশি। তবে সেসময় নাদান বেসরকারি আমি, ঐ সময়ের ছোট সাইজের আমার সরকারী আমলা বন্ধুদের কাছে প্রায়শই শুনেছি সরকার বাহাদুরের নানান দপ্তরের গজার বোয়ালেরা কিভাবে তাদের দপ্তরের চুনোপুঁটি, কাচকি, খলসেদের বিদেশ যাবার নানান সুযোগ গাপ করে দিতেন অহরহ। ঠিক ঐরকম রাক্ষুসেভাবে না হলেও প্রায় একই ঘটনা ঘটতো আমাদের মত অফিসগুলোতেও।

ফলে বড় স্যারেরা তক্কে তক্কে থাকতেন কায়দাকানুন করে কী করে অধস্তনদের জন্য প্রযোজ্য মিটিং ট্রেনিংগুলোতে যাওয়া যায়। এমতাবস্থায় বড় স্যারদের আঙুলের ফাঁক গলে কোনমতে দুয়েকটা সুযোগ চুইয়ে বেরিয়ে গেলেই, শিকে ছিঁড়তো আমাদের কপালে। তদুপরি ঠোঁটকাটা আর প্রতিবাদী হিসেবে বিশেষ দুর্নাম থাকায় ঐ শিকে ছিঁড়তোই না কপালে আমার সহজে। তারপরও মাঝে মাঝে অসম্ভব ঘটনাও তো ঘটে এই গ্রহে। সে বার ঘটলো ওইরকমই কিছু।

ফলে ব্যাংককে যাওয়ার জন্য ভিসা আবেদন করে আসার দিন দুয়েক পর হঠাৎ আমাদের জার্মান এম ডি সাহেব ফোন করে তলব করলেন এ অধমকে তাঁর অফিসে। দ্রুততম গতিতে সে তলবে সাড়া দিয়ে গিয়ে শুনি তাঁর মুখ থেকে যে, আমার ব্যাংকক মিটিংটির ঠিক দিন সাত কি আট পর আমাদের সুইজারল্যান্ডের হেড অফিস একটা ট্রেইনিংয়ের আয়োজন করেছে ফুকেটে। তবে কথা তা না। বড় কথা হল তাতে যোগ দেবার জন্য যে ক্রাইটেরিয়া ঠিক করেছে হেড অফিস, তাতে সেই ট্রেনিঙয়ে আমারই যাওয়া কর্তব্য।

শুনে মনে মনে একদিকে তুমুল আনন্দিত হলেও, একসাথে ভাবছিলাম এভাবে বিড়ালের কপালে শিকে ছিঁড়লেই কী আর না ছিঁড়লেই কী? এম ডি সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম তাই, দেখো আমি তো মাত্রই ভিসার আবেদন করে এসেছি থাইল্যান্ডের, সেটি হাতে আসার পর ব্যাংকক গিয়ে, যে সময় থাকবে হাতে, তাতে তো নূতন ভিসার আবেদন করে ভিসা পেতে পেতে ট্রেইনিংই শেষ হয় যাবে।

শুনে এম ডি সাহেব বলেন, "ওহ তোমার পাসপোর্ট কি এখন থাই এম্বেসিতে নাকি? তাহলে তো ভালই হলো। থাই এম্বেসেডরের সাথে আমার ভাল জানা শোনা আছে। আমি তাকে একটা চিঠি পাঠিয়ে বলে দিচ্ছি তোমাকে যাতে মাল্টিপল না হলেও, অন্তত ডাবল এন্ট্রি ভিসা দেয়। এ নিয়ে তোমার কিছু করতে হবে না, বরং তুমিই যাচ্ছ ফুকেটে ধরে নিয়ে প্রস্তুতি নাও।" বলেই উনি তাঁর সেক্রটারিকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে শুরু করলে ফের তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে আসি নিজরুমে ।

এদিকে পিছু পিছু হাজির হয়ে এম ডি সাহেবের সেক্রেটারি এম্বেসি থেকে দেয়া আমার টোকেনের একটা ফটোকপি করে নিয়ে যায়। তারপর সে যে কী করেছিল তা তো জানি না। তবে নির্দিষ্ট দিনে থাই এম্বেসি থেকে পাসপোর্ট সংগ্রহ করে দেখি, নাহ মাল্টিপ্ল বা ডাবল না সিঙ্গেল এন্ট্রি ভিসাই ইস্যু করেছে। এদিকে আগেবার পাও সিল মারা থাই ভিসার চেহারাও বদলে গিয়ে হয়েছে সিংগাপুরের স্টিকারে। অবশ্য তাতে আর কি আসে যায় আমার? বরং ফুকেট নামের একটা নতুন জায়গায় যাওয়ার সুযোগ এভাবে হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় বড়ই চোট লাগলো মনে।

কিন্তু নাহ, ঘটলো তারপরই আবারো আচানক ঘটনা। যতদূর মনে পড়ে সেদিন কোন এক কারনে অফিস বন্ধ ছিল। সকালে ফোন পেলাম বসের কাছ থেকে হঠাৎ। এমডি সাহাবের বরাতে জিজ্ঞেস করলেন, মাল্টিপল বা ডাবল এন্ট্রি ভিসা পেয়েছি কিনা থাইল্যান্ডের আমি?

তাতে না বোধক উত্তর দিয়ে জানালাম যে, এই বিড়ালের কপালে শিকা ছিঁড়তে গিয়েও ছিড়ে না অনেক সময়ই। আমার এ জবাব শুনে বস ফোন কেটে দেবার আধাঘণ্টার ফের বাসার ল্যান্ডফোন বাজতেই আমার স্ত্রী সে ফোন ধরে আমাকে ডেকে বলে, "তোমাদের এম ডি সাহেবের ড্রাইভারের নাম কি নুরুল নাকি? ও চাচ্ছে তোমাকে। কথা বলো।"

এ কথা শুনে দ্রুত গিয়ে বউয়ের হাত থেকে ফোন নিয়ে কানে দিতেই শুনি ওপাশ থেকে বলছে হড়বড় করে সম্ভবত নুরুল

'স্যার আমার চাকরি বাঁচান। এম ডি সাহেব, না না না ম্যাডাম রাইগা আগুন। আপনের বাসার ঠিকানা বলেন। এখনি রওয়ানা করমু আমি আপনার পাসপোর্ট নিতে!"

ঘটনার কিছুটা আঁচ করতে পারলেও পুরো বুঝে উঠতে পারিনি তা। ভেবেছিলাম, কী আর হবে এই সময়ে। দুই দিন পরেই তো ব্যাংকক ফ্লাইট আমার। বোঝাতেও চেষ্টা করি তা নুরুলকে।

কিন্তু কথা তার একটাই "স্যার আমার চাকরিটা বাঁচান। চাকরি গেলে বউ ছেলেমেয়ে নিয়া আমি পথে বসমু। দয়া কইরা আপনের পাসপোর্ট দিয়েন। আমি আসতেছি।" বলেই নুরুল ফোন কেটে দেয়।

অতপর সে সময়ের জ্যামহীন ঢাকার বনানীতে অবস্থিত এম ডি সাহেবের বাসা থেকে রওয়ানা করে বারো কি পনেরো মিনিটের মধ্যেই নুরুল এসে হাজির হলে, জোর করে তাকে চা নাস্তা খেতে বসিয়ে তার হাতে পাসপোর্ট তুলে দিতেই নাকে মুখে চা নাস্তা খেতে খেতে জানায় সে

বছরখানেক আগে বিয়ে করা এমডি সাহেবের চতুর্থ স্ত্রী যিনি নাকি এক থাই তরুণী, উনি যে কী কারণে তুমুল রেগেছেন, তা সে জানে না । তাকে শুধু উনি বলেছেন, যে করেই হোক আমার পাসপোর্ট ওনার হাতে পৌঁছুতে হবে দুপুরের মধ্যে। সে জন্যই এসেছে নুরুল, আর আমি যেন তাকে আর কিছু জিজ্ঞেস না করি এ ব্যপারে। তার জ্ঞানমতে আমার পাসপোর্টেই নাকি চাকরি ঝুলে আছে এ মুহূর্তে।

বেচারা নুরুলের চাকরি রক্ষার্থে তার হাতে পাসপোর্ট তুলে দিয়ে ভাবলাম, হায়রে পরলাম এ কোন হাঙ্গামায়! এতে এখন সময়ের ভজঘটে পরে আখেরে না আমার ব্যাংকক ট্রিপটি যায় কেঁচে। অবশ্য একই সাথে এও মনে হল যে, নুরুল যদিও বলছিল আমার পাসপোর্টে তার চাকরি ঝুলে আছে, ঘটনাতো আরো গভীর। পাসপোর্ট না দিলে আমার চাকরিরও অবস্থা হতে পারে সাড়ে সাংঘাতিক! গেলে যাক কেঁচে এবারের ব্যাংকক ট্রিপ। চাকরি বাঁচলে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ তো আসবেই আরো।

পরদিন যথারীতি অফিসে যেতেই বস ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঘটনা কী? জানালাম তাঁকে যে ঘটনা হল নুরুলের হাতে পাসপোর্ট তুলে দিয়ে একই সাথে নুরলের আর আমার চাকরি বাঁচিয়েছি। এ শুনে হাসতে হাসতে জানালেন উনি, নুরুল আমার পাসপোর্ট নিয়ে পৌছুবার পরের ঘটনা।

তা হচ্ছে, মি. দোয়েগি মানে আমাদের এম ডি সাহেব আমার বসের কাছ থেকে যখন শুনেছেন থাই এম্বেসি আমাকে সিঙ্গেল এন্ট্রি ভিসা দিয়েছে, তাতে তিনি বেশ বিরক্ত হয়ে সাথে সাথেই তাঁর তরুণী থাই ভার্যাকে যে, থাই এম্বেসি কেন তাঁর চিঠিকে সম্মান করেনি। আর তা শুনেই তাঁর থাই স্ত্রী মিসেস জয় এক্কবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলেছিলেন যতো দ্রুত সম্ভব তাঁর হাতে যেন আমার পাসপোর্ট পৌঁছায়। কারণ পাসপোর্ট নিয়ে সশরীরে যাবেন উনি সোজা এ্যাম্বাস্যাডরের কাছে। তার কথা হচ্ছে, এ কেমন কথা? একজন থাই নাগরিকের স্বামী, যে নাকি হল বিশ্বখ্যাত এক কোম্পানির এম ডি তাঁর চিঠিকে এভাবে অগ্রাহ্য করলো থাই এম্বেসি !

সাথে বস জানালেন আরো যে, আসলেই নুরুল পাসপোর্ট নিয়ে পৌছুতেই উনি ঠিকই চলে গিয়েছিলেন সোজা এম্ব্যাসিতে। ওখানে ঘটনা কী হয়েছে ফিরে এসে ঐ ব্যাপারে মুখ না খুললেও, এ্যাম্বাসিফেরত মিসেস জয়, সেই থেকে আছেন বেশ খোশ মেজাজেই !

শুনে ভাবি, তার মানে পেতে যাচ্ছি তাহলে ডাবল এন্ট্রি ভিসাই। তবে সেই ভিসা যে কবে পাবো? তা তো জানি না। আগামীকালকের মধ্যে পাসপোর্ট হাতে না পেলে দেখা যাবে, ব্যাংককভ্রমণ আমার ঠিকই কেঁচে গেছে । তবে এতে একদিকে নুরুল আমার চাকরি যেমন রক্ষা পেয়েছে তেমনি যেতে পারবো নতুন জায়গা ফুকেট।

সে যাক এ জীবনের নানান সময়ে কপাল যে আমার ফাঁটা, তা নানাভাবে টের পেলেও, এক্ষেত্রে কিন্তু ঘটেনি তা। কারণ অবশেষে পরদিন না সেদিনই বিকেলে এম ডি সাহেবের সেক্রেটারি আমাকে পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিলে, দ্রæত তা খুলে দেখি যে, হ্যাঁ থাই এম্বেসি আগের সিঙ্গেল এন্ট্রি ভিসাটি বাতিল করে নতুন ডাবল এন্ট্রি ভিসা ইস্যু করেছে! তাতে হিপ হিপ হুররে বলে দিলাম দুতিন পাক খেমটা নাচ, মনে মনে।

সেই থেকে এ পর্যন্ত যখনই পড়েছি কোন ভিসা বিষয়ক দিগদারিতে, মনে পড়েছে মিসেস জয়ের কথা। আর মনে তা পড়লেই সালাম ঠুকি মনে মনে থাই অ্যাম্বাসেডর থেকে শুরু করে গোটা এম্বেসির ইট, সিমেন্ট ও বালু পাথরকেও ।

ভাবি, থাইল্যান্ডের এক স্বল্পশিক্ষিত মফস্বল বা গ্রামের মেয়ে কোন উপায়ে একজন ইউরপিয়ানের স্ত্রী হয়ে বাংলাদেশে আসার পর, তার দাবিকে কী মর্যাদাই না দিয়েছিল ঢাকার থাই এ্যাম্বাসি! অথচ পরবর্তীতে নিজে যখন টানা পাঁচ বছর কর্মপোলক্ষে কাটিয়েছি তিনটা ভিন্ন দেশে, নিতান্তই ঠেকায় পরে সেসময় যে দুয়েকবার গিয়েছি ওখানকার বাংলাদেশ এম্বেসিতে, বুঝতে পেরেছি উচ্চপদস্থ সরকারি তকমা ছাড়া আমাদের এ্যাম্বাসিগুলোর দারোয়ান, পিয়ন, ঝাড়ুদারেরাও, কাউকেই মোটেও পুছে না। ব্যতিক্রম ছিল শুধু ২০১০-১২ সালের শ্রীলঙ্কাস্থ বাংলাদেশ এম্বেসি। তবে সে প্রসঙ্গ ভিন্ন।

কিন্তু তারপরও সমস্যা এখন হলো এই যে, থাই ভিসার যে তুলনামূলক ভিসাতত্ত্ব এযাত্রায় লিখে শেষ করবো বলে ভেবেছিলাম, শেষ হলো না তাও। না থাক অধমের লেখায় সুপ্রিয় পাঠিকা ও পাঠককে আর আটকে রাখা ঠিক হবে না। অতএব ফুরুলো এবারের নটে গাছটি এখানেই।

কচ্ছের রণ

স্বপন ভট্টাচার্য

কচ্ছের রণ। গুজরাতি ভাষায় রণ কথাটার মানে হল লবণজলা। আবার জলে ডোবা মরুভূমিও বোঝায় রণ শব্দে। সংস্কৃতে ইরিণা বলতে বোঝায় লবণবাদা বা সল্ট ফ্ল্যাট-কে। মরুভূমি বলতে যে বালুকাময় অনন্ত শূন্যতার ছবি মনে ভেসে ওঠে তার সঙ্গে এই প্রাক-শীতের কচ্ছের মিল কমই। 'লিট্‌ল রান'- এ এলে মনে হবে কোথায় সে জলহীন, প্রাণহীন কান্তার মরু ? এ তো দিগন্তবিস্তৃত জলাভূমিতে প্রাণের বিচিত্র সমারোহ! তা হলেও ভূগোল বলছে এ মরু বটে, থর মরুভূমির পুব সীমানার এই আরব সাগর বিধৌত প্রাঙ্গণে এখন সব শীতের পাখিরা আসতে শুরু করেছে। পেলিক্যান, ফ্লেমিংগো, ক্রেন- তারা সব হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে চলে এসেছে সংসার পাতবে বলে। মরুর রুক্ষতা এখানে একেবারেই নেই। 'গ্রেট রান' সফরে গিয়ে অবশ্য মরু মিলেছে ,তবে সে তো এক অপার বিস্ময়! এখানে মরুভূমি আগাগোড়া শ্বেত, বালুর লেশমাত্র নেই কোথাও, তার বদলে যতদুর দৃষ্টি যায় শুধু লবণ আর লবণ! নুনের সাগর, না কি নুনের মরুভূমি বলা যায় তাকে? সারা পৃথিবীতে এমন শ্বেত মরুভূমি কমই রয়েছে এবং ইউনেস্কো যথার্থ কারণেই কচ্ছের রণ-কে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা দিয়েছে। তবে শ্বেত সেই মরুতে প্রাণ বলতে মুখ্যত উটবাহনে মানুষের আনাগোনা, উৎপাতও বলা যায়। জীববৈচিত্র্য কিছু থেকে থাকলেও তা লবণস্তরের তলায়। অমন তীব্র ঘনত্বের নুন সামলে কিছু ব্যাকটেরিয়া ছাড়া এবং লবণপ্রিয় কিছু গুল্ম ছাড়া আর কিছু বেঁচে থাকার সুযোগ শ্বেত মরুভূমিতে রয়েছে বলে মনে হয় না। এই দ্বিবিধ বৈচিত্রের টানে কচ্ছের রণে এই শীতকালে সারা পৃথিবী থেকে পর্যটকের দল আসে, তবে আমরা ঘুরে এসেছি তাঁদের সমাবেশের কিছু আগে, প্রকৃতিদেবীকে রুষ্ট হবার সুযোগ না দিয়েই।

আমাদের গুজরাট সফর শুরু হয়েছিল লিট্‌ল রান দিয়ে। পুবের সীমানা কোলকাতা থেকে ভারতভূমির পশ্চিম সীমানা কচ্ছে আসতে চাইলে আকাশপথে ভুজ-এ এসে গাড়ি নিয়ে আসা যায়। ভুজ গ্রেট রান-এর নিকটবর্তী কিন্তু লিট্‌ল রান থেকে তা দীর্ঘ পথশ্রমের কাজ। আমরা লিট্‌ল রান-এর জন্য বেছে নিলাম ট্রেন। শালিমার-পোরবন্দর এক্সপ্রেস-এ দুটো রাত কাটাতে হয় এই দূরত্ব অতিক্রমের জন্য। তাতে খরচ বাঁচে, কিন্তু আনাকাঙ্ক্ষিতভাবে সময় নষ্ট হয় তবে সেটা তো পৌঁছানোর পরে বুঝলাম! যাই হোক, সকাল নটা নাগাদ ভিরান্‌গাম নামের একটা মোটামুটি জনবিরল স্টেশনে নামলাম আমরা। সেখান থেকে আমাদের কোচ-সফর শুরু হল। কোচ এয়ার কন্ডিশনড্ এবং হেলান দেবার সুবিধে যুক্ত আরামদায়ক সীটে জোড়ে বসার ব্যবস্থা। সঙ্গে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছরের সঙ্গিনী রয়েছেন, ফলে জোড়ে নতুনত্ব নেই বরং চিরাচরিত প্রাচীনত্ব আছে- নাক ডেকো না, ছি ছি অন্যদের কথাটাও ভাবো... ধর, ওষুধটা খাবার সময় পার হয়ে গেল যে...... অনেকক্ষণ খালি পেটে আছো, নাও চিড়ে ভাজা খাও......এই নাও টক ঝাল লজেন্স, আসার সময় নিয়ে এসেছি...... । ইত্যকার বিশ্রম্ভালাপ ছিল বাকি পথের সঙ্গী এবং কি আশ্চর্য এগুলো সবই প্রয়োজনের সময় হাতে পেয়ে গেলে মনে হয় সত্যিই তো, যে সময় যেটা দরকার সেটা নিয়ে আমি আর কেন ভাবি , আমি বরং ইতিহাস- ভূগোলে মন দিতে পারি নিশ্চিন্তে।

কচ্ছের রণ থর মরুভূমির অংশবিশেষ। মরুভূমির অংশ, কিন্তু আদতে প্রকাণ্ড একটি লবণজলা- সল্ট মার্শ যাকে বলে। ভারতবর্ষের মানচিত্রে পশ্চিমপ্রান্তে গুজরাট রাজ্যের সীমারেখায় একজোড়া ওষ্ঠ ও অধরকে আরব সাগরের জলে তৃষ্ণা মেটাতে দেখা যায়। ওই ওষ্ঠাধরের ফাঁক দিয়ে স্থলভূমির দিকে অনেকটা ঢুকে এসেছে কচ্ছ উপসাগর। বর্ষার ভরা মরসুমে সাগরের জল উপছে পড়ে স্থলভূমির যে বিস্তৃত

শ্বেত মরুর দেশে

অংশকে ভাসিয়ে দেয় মোটামুটিভাবে কচ্ছের রণ সেটাকেই বলা যায়। গঠনে এই বাদা- মাডফ্ল্যাট বলা হয় যাকে- একটা বাটির মত, ফলে জল ঢুকে সহজে আর বেরোতে পারে না। গড়ে সমুদ্রতল থেকে ১৫ ফুট উচু হলেও ভূতাত্ত্বিকভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল এই অংশ ভূগর্ভজাত অনেক ওঠাপড়ার সাক্ষী। মাত্র কয়েকবছর আগেও এক ভয়ংকর ভুমিকম্পে ভুজ-এর জীবন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এমনই ভূতাত্ত্বিক খামখেয়ালিপনার শিকার হয়ে কচ্ছের এই সাগরবিধৌত অংশ মূল আরব সাগরের থেকে গত পাঁচ-সাত হাজার বছরে আলাদা হয়ে গিয়েছে। এককালে জাহাজ নিয়ে ঢুকে পড়ার মত নাব্যতা ছিল বলেই না আলেকজান্ডারের সেনাবাহিনী কচ্ছের উপকূলে আজ যেখানে সল্ট মার্শ, সেখানে নোঙর ফেলতে পেরেছিল! সেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া অংশেই থর মরুভূমি পরিণত হয়েছে লবণ-বাদায়। এর এক প্রান্ত ভারতের ভিতরে ঢুকে এসেছে অনেকখানি এবং অন্য প্রান্ত ছুঁয়ে রয়েছে পাকিস্তানের সিন্ধু-অববাহিকাকে। প্রায় ৯০ শতাংশ ভারতের সীমানাভুক্ত। খুব বর্ষার মরশুমে এই মরুভূমিকে জলে ডোবা একটা তৃণভূমি বলেই মনে হয়। রাজস্থানের ঘাঘর, লুনী নদী এসে মেশে এই লবণজলায়। শীতের সময় এবং শুখা মরশুমে জমে থাকা এবং সাগরে ফিরতে না পারা নোনা জল বাস্পীভূত হতে হতে বাদার বুকে রেখে যায় নুনের কেলাস। গ্রেট রান বা বাংলা করে যদি বলি 'বড়ো রণে'-এর প্রায় সাড়ে সাত হাজার বর্গ কিলোমিটার অংশ জুড়ে দেখা যাবে আরব সাগরের এই বিচ্ছিন্ন অংশটুকুর আবার সাগরে ফিরে না যেতে পারার কান্না শুকিয়ে লবণ হয়ে জমে রয়েছে আদিগন্তচরাচর। লিট্‌ল রান বা 'ছোট রণে' এমন শ্বেত মরুভূমি নেই কিন্তু ফিরে না যেতে পারা জল এখানে তৈরি করেছে স্বল্প থেকে মাঝ-গভীর লেক। জলায় ইতস্তত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ছোট ছোট দ্বীপভূমি। কিছু কাঁটা বন- মূলত বাবলা, কিছু বাদাবনের গাছ এবং কিছু নাছোড় লবণ সওয়া ঘাস-এই নিয়ে এইসব ছোট ছোট আইলেট বা দ্বীপখণ্ডের সীমায়িত উদ্ভিদবৈচিত্র, কিন্তু এর মধ্যেই গড়ে উঠেছে এক অভূতপূর্ব প্রাণ-উন্মাদনা যা দেখতে সারা পৃথিবীর পক্ষীপ্রেমীদের আনাগোনা চলতে থাকে সারা বছর জুড়েই, বিশেষত শীতে কেন না শীতে ফ্লেমিংগোরা আসে, আমরাও এসেছি তাদের টানে। এসে বুঝলাম শুধু পাখি নয়, পশুর টানেও আবার ফিরতে হতে পারে!

দুই রাতের ট্রেন সফরের ধকল না থাকাটাই সব চেয়ে বড়ো ধকল। বাসে করে লিটল রান ডেজার্ট ক্যাম্প-এ পৌঁছে স্নান খাওয়া সেরে আমরা তৈরি হয়ে নিলাম রণ সফরের জন্য। রণ সংরক্ষিত বায়োডাইভার্সিটি অঞ্চল, তদুপরি পাকিস্তানের সঙ্গে কমন বর্ডার থাকার জন্য একটু বেশি সংবেদনশীল। ঢুকতে অনুমতি লাগে তবে লিটল রণে ভ্রমণার্থী কম, কড়াকড়িও কম। বাহন বলতে জীপ বা ল্যান্ডরোভার এবং কোন নেভিগেব্‌ল রোড নেই সল্ট ফ্ল্যাটে কোথাও। অনুমান করা যায় ভরা মরসুমে এই জমি যখন জলে ডুবে থাকে তখন এই লবণজলা দূর থেকে দেখেই ফিরে যেতে হবে। আদতে মরু, তাই খুব শুখা মরশুমে এই জলা খরাস্তীর্ণ চেহারা ধারণ করে এবং তখন পশুপাখি প্রাণের দায়েই চলে যায় সবুজতর দ্বীপগুলিতে যেখানে নিদেন

উড়ন্ত পেলিক্যান

কিছু ম্যানগ্রোভ জন্মায়। তাই বেড়ানোর সবচেয়ে ভালো সময় হল এই শীতকাল। শীত মরুভূমিতে দিনে নামমাত্র, রাত্রে কিছু কামড় থাকে বটে তবে নভেম্বরের গোড়ায় আমাদের প্রায় কোন শীতবস্ত্রই লাগে নি। এই সময় জল সরে গেছে যে সব জায়গা থেকে, তার উপর দিয়ে চার চাকার গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ নয়। সহজেই চাকা শুকনো মাটির তলার জমে থাকা নরম পাঁকে ফেঁসে যেতে পারে। লিট্‌ল রান ক্যাম্পের ড্রাইভাররা দক্ষ। তাদের বলে দিয়েছিলাম বুনো গাধা এবং ফ্লেমিংগো দেখাতেই হবে। উত্তরে শুনেছিলাম-গ্যারান্টি। বুনো গাধা বা ওয়াইল্ড অ্যাস নামের জীবটি বকমধ্যে হংসযথা । গাধা যে সুদর্শন হতে পারে তা মানুষের জন্য বোঝা বইতে বইতে বেচারি নিজেই বিস্মৃত হয়েছে, কিন্তু এরা ওয়াইল্ড। গা সাদা আর বাদামীর ছোপযুক্ত, মানুষকে ভয় পায় এমন নয়, বিশ্বাসও যে খুব করে তাও নয়, কাছে গেলে পালায়। থাকে দল বেঁধে, তাদের নাতিউচ্চনাদ রাসভ কান পেতে শোনাও যায়। খুবই ফোটোজেনিক প্রাণি এরা, পোজ দেয়, ছবি তলা

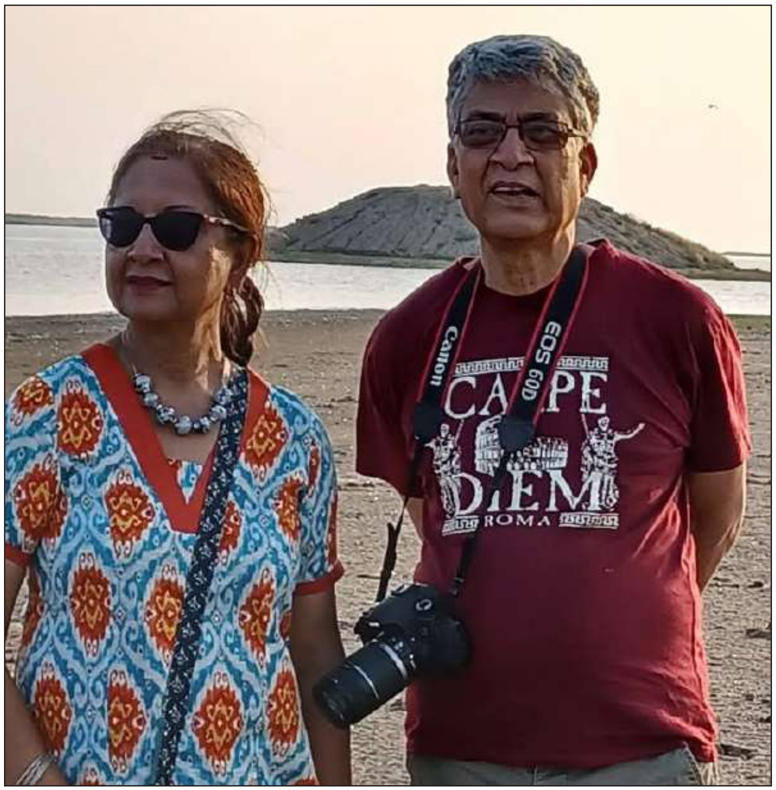

পিছনে লবণজলা

লবণ বানানোর কাজ চলছে

যায় সাধ মিটিয়ে। গাধা ছেড়ে নড়তে চাইছিলাম না, ড্রাইভার বললে ফ্লেমিংগো? সুতরাং চল, চল ফ্লেমিংগোর টানে। যে জলাভূমির সামনে সে আমাদের নামিয়ে দিল তার এপারটাই মোটরেব্‌ল, ওপারে জলা, গাড়ির চাকা বসে যাবে। সেই ওপারের জলাভূমিতে মেলা বসে গেছে ফ্লেমিংগো আর পেলিক্যানদের। মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গোলাপি ফ্লেমিংগোরা শীতের শুরু থেকেই আসতে শুরু করে এই লবণজলার লেকগুলিতে। নীচু অগভীর জলে খাদ্য অপর্যাপ্ত। এরা এখানে বাসা বানায়, ডিম পাড়ে, বাচ্চা বড় করে, তাদের উড়তে শেখায় এবং গ্রীষ্মের শুরুতে সপরিবারে উড়ে যায়। যারা দুর্বল, যারা উড়তে শিখল না, তাদের জন্য ওত পেতে বসে থাকে এখানকার শৃগালের দল। ডেজার্ট ফক্স তারা, লবণজলায় এদের চোখে পড়বে একটু ইতি উতি খুঁজলেই। পাখিদের মধ্যে সারস, বিভিন্ন রকম স্টর্ক, পেলিক্যানদের ছবি তোলা গেল প্রাণভরে। এক জায়গায় দেখলাম একপাল উট এসে জমা হয়েছে জলার ধারে। এখানে তো বসতি নেই, তাহলে এই উট কি গৃহপালিত নহে? গাইড বললে সত্যিই তাই, এরা জংলী উট। মানুষের ধারে কাছে থাকে বটে তবে এদের পোষ মানানো আইনে বারণ, কারন এরা হল পৃথিবীর

একমাত্র উট যারা সাঁতার কাটতে পারে। গ্রীষ্মে যখন এখানে কাঁটাঝোপও অপ্রতুল, তখন ওরা প্রায় দু' কিলোমিটার জলা সাঁতরে সাগরবিধৌত বাদাবনে চলে যায় খাবারের খোঁজে। মানুষের বসতি নেই বলা ঠিক হল না, বলা উচিত স্থায়ী বসতি নেই। এখানে স্থানে স্থানে জলা ইজারা নিয়ে একেবারে আভিধানিক অর্থেই নুন বানাচ্ছে কেউ কেউ। তার অস্থায়ী ঘর-সংসার বৌ-বাচ্চা নিয়ে এখানেই অন্তত ছ'মাস। জমা জলে আস্তে আস্তে নুনের কেলাস জমে। সময় সময়ে আলোড়িত করে না দিলে কেলাস গায়ে গায়ে জমে হয়ে উঠবে নুনের পাথর। তার তেমন দাম নেই। আগে এই লবণচাষীরা জলে নেমে লাগাতার পা দাবাতো, নির্মম ছিল সে পদ্ধতি। এখন অবশ্য বিদ্যুৎচালিত স্টারার সে চাহিদা মিটিয়েছে। ছ'মাসের চেষ্টায় যে নুন তৈরি হল তা শহরে বড়ো কোম্পানির কারখানায় বিক্রি করে আসে এরা। বাজারে প্যাকেটজাত নুনের দামই বা কত যে তার কাঁচামাল থেকে এদের জীবন আর একটু সুখের হবে, বাচ্চারা মরুভূমিতে পড়ে না থেকে ইস্কুলে যাবে? ফলে, এভাবেই চলছে বংশানুক্রমিক নুন-চাষীদের দেড় দু'টাকা কেজির জীবন।

এখানে এক রাত কাটিয়ে আমরা গেলাম ভুজ শহরে। সেখান থেকে গ্রেট রান বা বড়ো রণ ঘণ্টাদেড়েকের পথ। এটা তুলনায় অনেক বেশি চর্চিত। আসার পথে জলার পর জলায় কত যে পাখির সমারোহ। তার মধ্যে কপাল ভালো থাকলে নজর কেড়ে নেবে গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড। উড়তে সক্ষম পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে ভারি এরা। অতি অতি বিরলায়িত করে দিয়েছিল এদের শিকারিরা। এখানে তাদের জন্য রয়েছে স্যাংচুয়ারি। হাঁড়িচাঁচা বা সারস বা গগনবেড় চোখে পড়বে হাইওয়ে থেকে একশো মিটারের মধ্যেই। গুজরাট ট্যুরিজমের বিজ্ঞাপনের কল্যানে এখন সারা পৃথিবীতে ভ্রমনার্থীমহলে রান ফেস্টিভ্যাল- এর রমরমা খুব। ডিসেম্বরের শুরু থেকে শুরু হবে একমাসব্যাপী এই উৎসব। রণের অন্তত ত্রিশ কিলোমিটার আগে থেকে তৈরি হয়ে রয়েছে সারি সারি ডেজার্ট ক্যাম্প, হোমস্টে ইত্যাদি। শ্বেত মরুভূমির প্রবেশদ্বার ভারতীয় সীমা সুরক্ষা বল-এর কড়া পাহারা। পারমিট করিয়ে রাখা ছিল আগেই। একটা ড্রাইভওয়ে রয়েছে মাইলখানেক লম্বা যেটা সোজা গিয়ে মিশেছে একটা ওয়াচ টাওয়ারের দোরগোড়ায়। তবে সাধারণের গাড়ি সেখানে যাবে না। গেটের বাইরে রয়েছে উট বা অশ্ববাহিত শকট। কচ্ছের মানুষদের বলা হয় কচ্ছী। সীমান্তবর্তী অঞ্চল বলে এদের অনেক কৃচ্ছসাধন করতে হয়। এটা বিকল্প রোজগার ব্যবস্থাই বলা ভালো। তবে, কচ্ছী হ্যান্ডিক্র্যাফটু, পোশাক, নানা লোকশিল্প সারা দেশেই সমাদৃত। কিন্তু সেসব তো পরের কথা, আমরা উটবাহনে মরুতে নেমে অবাক। চারিদিকে শুধু নুন আর নুন। যতদূর চোখ যায় লবনের মরু। রোদ কড়া থাকলে সানগ্লাস আবশ্যক। সন্ধ্যার আগে সেই শ্বেত চরাচরকে রাঙিয়ে দিয়ে প্রকাণ্ড এক সূর্য দিকচক্রবালের সীমানা থেকে আমাদের বিদায় জানিয়ে গেল।

অচিন পাখি

হুসেইন ফজলুল বারী

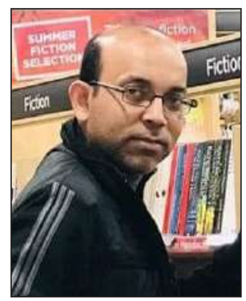

আমার বিলেতযাত্রার খবর শুনে এক রসিক বন্ধু হেসে বলেছিল, পাশ্চাত্যে মানুষের চেয়ে বৃক্ষ বেশি, কুলবধূর চেয়ে অভিসারিকা বেশি! শেফিল্ডে নবাগত আমি উৎসুক চোখে এদিক-ওদিক বার বার তাকাই। কিন্তু রাস্তাঘাট বেশ ফাঁকা বলে অভিসারিকা দূরে থাকুক, সাধারণ পথিকের চলাফেরাও নগণ্য। না, অইতো দেখা যায়, ওপাশের লেন ধরে টাইটস-শোভিত ঊরু কাঁপিয়ে আনমনে বাইক চালায় ঝাঁকড়মাকড় চুলের এক উচ্ছল তন্বী। কালচে রাস্তার দুপাশে কালচে গাছের সারি। পপলার, মালবেরি, হর্সনাট, ডুমুর, পাইন। ছায়াদায়িনী বৃক্ষের তলায় সবুজাভ মাঠ। মেঘলা আকাশের নিচে এ যেন এক ছায়ার রাজ্য। সবুজাভ প্রান্তরজুড়ে শুকনো পাতা ও শিকড়বাকড় জমে একাকার। হু হু করে বাতাস বয়। দূর থেকেই দেখা যায়, উঁচু

উঁচু শৃঙ্গের মাথায় সাদা বরফের টুপি। ধূসর, ঘোলাটে, শূন্য আকাশে মেঘদল ঘোরে উদ্ভ্রান্তের মতো। এর নীচে বিহঙ্গ উড়ে যায় ডানা মেলে। কালচে থামে বসে আছে একটা অচিন পাখি-এর চোখে ক্রুদ্ধদৃষ্টি, কণ্ঠেও এলোমেলো সুর। কান খাড়া করেও বিলেতি খেচরের ডাক বুঝি না। খানিক পরেই আবার রোদের ঝিলিক দেখি লতাগুল্মের ফাঁক গলে। ছায়াঘন মাঠে ছোট ছোট পায়ে হাঁটে অলস ভেড়ার পাল। তৃণময় ঢালে নিঃসঙ্গ শেরপার মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে কিছু পাতাবিরল গাছ। ঝিরিঝিরি ছায়ায় ঘাপটি মেরে বসে থাকা কুকুর গা ঝাড়া দিলে বিরক্ত হই। আশেপাশের ঝোপঝাড়ে প্রচুর জংলি ফুল ফুটেছে। লালচে আর হলদেটের মিশেলের এই ফুলগুলোর নাম জানি না। মনে পড়ল মহামতি যিশুর উপদেশ। তিনি প্রস্ফুটিত ফুল দেখে হাওয়ারিকে বলেছিলেন, ফুটন্ত ফুলগুলোর দিকে ভালো করে তাকাও। দেখো, বিনা পরিশ্রমেই কী সুন্দর পুষ্পদল বিকশিত হয়েছে, কিন্তু কিং সলোমনের চেয়েও এই ফুলগুলি স্বতঃস্ফূর্ত, রাজসিক ও জাঁকজমকপূর্ণ। কিং সলোমন কখনো এদের মতো সাজতে পারেন নি। প্রিয় বন্ধুগণ, ফুলের শোভা উপভোগ করো।

আমার মতো নবীন গবেষকের কী এতো আয়েশী হওয়ার সুযোগ আছে? আমার মাথায় বড়শির আলের মতো বিঁধে আছে এক ডেডলাইন- পরের সপ্তাহে সম্পূর্ণ গবেষণা প্রস্তাব ও লিটারেচার রিভিউ জমা দিতে হবে সুপারভাইজরকে। মানসম্পন্ন কিছু লিখতে না পারলে যে মান ইজ্জত নিয়ে টানাটানি শুরু হবে। ইস, এখনও সিংহভাগ লিখা কম্পোজ করা বাকি। এই বয়সে পড়তে এসে বেশ মুশকিলেই পড়েছি বুঝি। লেখাপড়া বেশ প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়েছে আজকাল। তটস্থ হয়ে জোর কদমে চলতে শুরু করলাম নিজ ডেরার দিকে।

অদূরে কোথাও ঘণ্টা বাজছে। নগরের দোকানপাট আর উঁচু বিলবোর্ডে বিজ্ঞাপনের বাহার। এক দোকানে বাঁকা হরফে উৎকীর্ণ- সেক্সশপ। চমকে উঠলাম। তবে দোকানটা এখন বন্ধ। এগিয়ে চলি সামনের দিকে। হুশহাস করে চলে ট্রাম বা ট্রেন। নীলবাস চলছে মেঘছোঁয়া পথে। সিটি সেন্টার পেরিয়ে গ্লিডলেস ভ্যালির মোড়ে পৌঁছতেই চোখে পড়ল উঁচু গির্জার শির। চলিষ্ণু মেঘ উপাসনালয়ের চূড়ায় প্রণতি জানিয়ে এগিয়ে গিয়ে শৈলমালার শিরে বাড়ি খায়। এই কপিশরঙা প্রার্থনাগৃহ নিয়ে নাকি অনেক অতীন্দ্রিয় উপকথা চালু আছে। শুনেছি, বয়োবৃদ্ধ পাদ্রী সাহেব নাকি গোপনে নানান কিসিমের যৌনউদ্দীপক ছালবাকল বিক্রি করেন!

এ সব ভোজবাজির কথায় আমার কাজ নেই। সবুজ পাতার ফাঁক গলে দেখি, আকাশে মনোরম নীল আভা। উপাসনালয়টির ক্রুশযুক্ত মস্তক ছুঁয়ে বর্ণিল রঙধনু ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্তের কোলে। দূরাগত কিচিরমিচির ভেসে আসে। বৃক্ষরাজির মাঝে মেপল, ওক, বার্স আর পপলারের ছড়াছড়ি। বনানীর দিক থেকে আচমকাই কপোতের ঝাঁক উড়ে এসে জুড়ে বসল চার্চের মাথায়। কয়েকটা সাদা-কালো ম্যাগপাই অবতরণ করল আমার পায়ের কাছে, আবার ঠ্যাং নাচিয়ে সামনে এগিয়ে খুঁটে খায়। সর্পিল পথ বেয়ে নিচে নেমে দেখি এক চিলতে জলের রেখা। পুরো এলাকা ঘিরে আছে পরিখার মতো সর্পিল খালের মতো কিছু? গুগলের বরাতে জানলাম, এটি শেফ নদীর একটি শাখানদী- নাম মের্সব্রুক। এই বিড়ালপায়ে সন্তর্পণে এগোলে দেখা যায়, নানান কিসিমের বিহঙ্গকুল নৃত্য করে- হুটোপুটি খায় ঝোপঝাড়ে-গাছের শাখে-বিটপীলতায়। কিছু পাখি ধূসর। কোনোটা আবার আগুনরঙা। কারো পালক শঙ্খশুভ্র। পত্রহীন ডালে বসে থাকা পানকৌড়ির রঙ কুচকুচে কালো। একটা ছাইরঙা পাখি পাতা-কুটোর বাসায় স্থির বসে গ্রীবা উঁচু করে এদিক ওদিক চায়। উজ্জ্বল চোখের এক পাল পাখির মাথায় কী অপরূপ চুড়ো বাঁধা, বর্ণিল পুচ্ছের কী অপরূপ বিন্যাস। একেক পাখির চঞ্চুও একেক রকম। ঠোঁটেরও কতো বিচিত্র বর্ণ- গাঢ় লাল, হলুদ, কালো, মেটেরঙা, গোলাপি। ঝুঁটিওলা লালচে-ধূসর পাখিরা অস্থির ঠ্যাং-এ পায়চারি করে- আকারে চড়ুইর চেয়ে বড়। এগুলো কী স্কাইলার্ক? জলজ তৃণময় ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়েছে চারধারে। খালের জল শুকিয়ে জলাবনের কিনার ছুঁয়েছে। উঁচু পাড়ে জমে আছে রাশি রাশি বাদামি পাতা, ডাল-কুটো, ডিমের খোলস। আরেকটা পালক-ফোলা মা- পাখি চুপটি করে ডিমে তা দিচ্ছে জলাবনের ধারে। শুনেছি, এই সময় মা পাখিদের মেজাজ তিরিক্ষি হয়।

সন্তর্পণে সামনে হাঁটি। ধলা বুকের কালো পাখি মল ছেড়ে উড়ে গেল আকাশপানে- এর গা বেয়ে ঝরে পড়ল একটা বাসি পালক। ঝরা পালক হাতে নিয়ে একটু ছুঁই। একটা বাঁকানো গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে আমিও কাঁধের ঝোলা থেকে বের করি জীর্ণ-মলাটের বই- "কনফারেন্স অব বার্ডস"। এই বইটির রচয়িতা সুফিদের সুফি হজরত ফরিদউদ্দিন আত্তার। আকরগ্রন্থটি সাজানো হয়েছে পাখিদের সংলাপ দিয়ে। ক্লাসিক রুবাই। আকাশচারি পাখিদল একদিন গাছের ডালে সমবেত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে মতবিনিময় করছিল। প্রত্যেকের অভিমত ছিল, তারা জীবনভর সী মোরগ নামের অদৃশ্য বিহঙ্গরাজের নাম শুনেছে। তার সাক্ষাৎ পেলেই সার্থক হবে দুনিয়ার পাখিদের জীবন। রহস্যময়ী সী মোরগের সাথে মোলাকাত না হওয়ায় তাদের জীবনতৃষা হারিয়ে যাচ্ছে। উৎসুক বিহঙ্গকুলের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করলো ঐশীগ্রন্থে বর্ণিত পাখি হুদহুদঃ

সুলাইমান নবীর দূত হিসেবে আমিই তোমাদের নিয়ে যেতে পারব কাঙ্ক্ষিত সী মোরগের দেশে, তার একান্ত সহবতে। তবে ঐ দেশে যেতে হলে অনেক দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হবে, যেমন ডানার পালক খসে যাবে। এই সাত প্রান্তর পার হলেই কাঙ্ক্ষিত মাকামে পৌঁছবে। এসব ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ প্রান্তরের নামঃ (১) অন্বেষা, (২) প্রেম, (৩) তত্ত্বজ্ঞান, (৪) অমুখাপেক্ষিতা (৫) একেশ্বরবাদ (৬) বিহ্বলতা (৭) দারিদ্র ও ফানা (মোক্ষ)।

হুদহুদের কথা শুনে বিহঙ্গসভা মুখর হলো আনন্দময় কলতানে। স্থির করলাম, সময়-সুযোগ মতো অপূর্ব গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করব। শিরোনাম হবে- বিহঙ্গসভাঙ্ক।

আচমকাই এক ঝাঁক বায়স সায় দিলো কা কা রবে। আমাদের দাঁড়কাকের চেয়েও গম্ভীর সুর এদের ডাকে। এসব পাখিরা কী আমার মনোভাব জানতে পেরেছে? একবার টাওয়ার অব লন্ডনে দেখেছি- বিশেষভাবে পালিত রাজকীয় দাঁড়কাক। এই বায়সকুলের লালন- পালনে নিয়োজিত রয়েছেন রাজকীয় আধিকারিক- র‍্যাভেন মাস্টার। কিংবদন্তী রয়েছে যে, এই সব দাঁড়কাক যদি রাজকীয় টাওয়ার ছেড়ে চলে যায় বা অসুস্থ হয়ে পড়ে, তবে ব্রিটিশ সিংহাসন ভেঙে পড়বে, চরম সর্বনাশ হবে ক্ষমতাসীন রাজার। এক সাধক পুরুষের পরামর্শে রাজা দ্বিতীয় চার্লসের আমল থেকে রাজকীয় মঙ্গল কামনায় রাজবাড়িতে কয়েকটি দাঁড়কাক পোষার চল শুরু হয়। এই পাখি পালার কাজ নিরিবিচ্ছিন্নভাবে আজ অবধি চলমান। এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও বোমা হামলার ভয় উপেক্ষা করে এই কাক পোষা চলেছে এই টাওয়ারে। এই আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন রাজকাক দেখতে দর্শনার্থীও হয় প্রচুর।

অবলা পাখির অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার জনশ্রুতি নিয়ে আমার কোনো মন্তব্য নেই। হতেও পারে। জগতে অনেক কিছুই তো রহস্যময়- যার ঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। তবে কয়েকশ বছর ধরে চলমান এই ব্রিটিশ কুসংস্কার যে কী করে আজকের বিজ্ঞানমনস্ক মানুষজনকে প্রভাবিত করছে তা নিয়ে একটু ভাবি। বইয়ের মলাট বন্ধ করে কোনাকুনি পথে সামনে এগোই। এদিকে একটি বন্ধুর ট্রেইল। সন্নিহিত লেনের পাড়ে দুই রকমের ডাস্টবিন- লাল ও সবুজ। দূর থেকেই চোখে পড়ে, দূরবর্তী নীলাভ পাহাড়ের ঢেউ- ওদিকে বিখ্যাত পিক ডিসট্রিক্ট। বন্ধুর পথ বেয়ে সামনে এগোই। ধীরলয়ে পৌঁছে যাই পাহাড়ি ঝিরির কাছে। বিচিত্র সব উপলখণ্ড বুঝি এখানে ডুবে ডুবে জল খায়! এবড়ো- খেবড়ো পাথরগুলোর রং মুক্তাশুভ্র, হাল্কা সোনালি, কালচে বা ধূসর। একটা বড়সড় প্রস্তরের বুকে সঞ্চিত পানিতে চঞ্চু ছোঁয়ায় বিচিত্র এক পাখি। এই পাখির ঠোঁট চা-চামচের মতো! আমার

সাড়া পেয়েও নড়ে না, বেশ নিশঙ্ক এই বিলেতি খেচর। লক্ষ্য করলাম, এই বেগবান জলাশয়ের রঙ খানিকটা ঘোলাটে। কালচে ধারায় আঙুল ছুঁয়ে মনে হলো ঠিক যেন বরফগলা জল। নিবিড় বৃক্ষরাজি আর অজানা লতাগুল্ম মিলে জলের সমান্তরালে বহমান বুনোপথকে জড়িয়ে ধরেছে। মরচেধরা লোহার পুলে বুনোলতার ঝালর। জলমগ্ন সিঁড়ির বুকে জমে গেছে পিচ্ছিল শেওলা। এদের রঙে যেন নীলচে বিষণ্নতা মাখা। গাছের ডালে এক জোড়া ফ্লেমিঙ্গো চাপাস্বরে নিজেরা আলাপচারী করছে বুঝি? রোদ লেগে এদের অপরূপ পালক ঝিকমিক করছে। এদের সফেদ-গোলাপি পালকের ছায়া পড়ছে জমানো জলে।

জলাবনের দিক থেকে কীটপতঙ্গেরও বিশ্রী আর্তনাদ শুনি। কর্ণকুহরে তালা লাগার উপক্রম। লতাপাতার ছোঁয়া বাঁচিয়ে সবুজ চাদোয়ার নীচে একলা হাঁটি। ঘাসবনে বসে হলদে ঠোঁটে পালক ঘষছে একদল মায়াবি পাখি। সামনের প্রান্তর জুড়ে ফুটি ফুটি করছে অজস্র ম্রিয়মান ফুল। চিনতে পারলাম, সোনারপাথররূপী এই হলুদ পুষ্পের নাম ড্যাফোডিল। এই রাজ্যে জন্ম নেয়া কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রিয় ফুল! অমোঘ মৃত্যুর বিপরীতে ক্ষণস্থায়ী জীবনের চিহ্নের প্রতীক এই নরম ফুল। ফুলের দল বাতাসের ছোঁয়ায় লাজুক ঢঙে কেঁপে উঠল বুঝি। মনে মনে ভাষান্তর করি এই জনপদে জন্ম নেওয়া কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ চিরায়ত পঙক্তিঃ

হাঁটছিলাম একাকী পাহাড়ি মেঘের মতো-

হঠাৎ দেখি একটি মিছিল,

ডেফোডিল সব কাঁপছে হেলায়

জলের ধারে, বৃক্ষতলে-

ফুলেরা সব নৃত্য করে, মৃদুমন্দ বাতাস পেয়ে।

মাথা উঁচিয়ে দেখি, বন-পাহাড়ের মাথায় চলছে রোদ-ছায়ার খেলা। পদতলে সবুজ ঘাস উঁকি দিচ্ছে উৎসুক হয়ে। মোড় ঘুরতেই শুনি বিকট হ্রেষাধ্বনি। বৃক্ষ-শোভিত অমসৃণ চাতালে একটা অশ্বশালা। এই বুনোপথে অচেনা আমাকে দেখে অশ্বশাবক হয়ত অবাক হয়েছে। ঝরনার বয়ে চলার শব্দ শুনি। ঘোড়ার ডাক বা জলকল্লোলও যেন এখানে বেমানান- এমনই বুনো স্তব্ধতা পুরো প্রান্তর জুড়ে। জলধারা যদি নিঃশব্দে বয়ে যেত, তবেই বেশ হতো। কিন্তু কালচে স্রোতধারা সশব্দে নেমে গেছে পাহাড়ের নীচে, বড় নদীটির বুকে। সত্যি বলতে কী, বিলেতের প্রকৃতির ছিটেফোঁটা বর্ণনা দেওয়া আমার সাধ্যের বাইরে। এই মায়াবী অপরাহ্ণে অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা দেখে আক্ষেপ হলো, ইস, নিসর্গের

পূজারী প্রিয় কবি জীবনানন্দ যদি একটি বার এই জনপদে আসতেনঃ ‘বিকেল বলেছে এই নদীটিকে: শান্ত হতে হবে’!

কিন্তু এখানকার জলচর পাখিরা অশান্ত ও বেহায়া, এদের ডর- ভয় কম। কিছু পাখি লম্বা ঠোঁট-গা পানিতে ডুবিয়ে অস্পরার মতো জলকেলি করে। জলের কুচি জমেছে পত্র-পল্লবে, ঘাসের জমিনে। কুহেলিঘেরা ঝিরির গম্ভীর গর্জনও শুনি। নদী, নারী ও বৃষ্টির সুগন্ধ পাই। একটা ওক গাছে পিঠ ঠেকিয়ে এক সুঠাম মানুষ লম্বা ক্যামেরা-ট্যামেরা নিয়ে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে রয়েছেন বয়ে চলা নদীর দিকে। সম্ভবত পক্ষীবিশারদ। ভালো করে নিরিখ করে দেখি- তিনি একজন নারী! আমার তন্ময় ভাব আঁচ করতে পেরে বুদ্ধিমতী নারী ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে নিশ্চুপ মগ্নতার ইঙ্গিত করলেন। হাসিহাসি মুখ করে লঘুপদে এগিয়ে চলি সামনের দিকে। কিছুটা আক্ষেপ হলো, বিধাতার দেয়া চোখের ক্যামেরা ও কানের রেকর্ডার ছাড়িয়ে এদের সমস্ত অস্তিত্ব যন্ত্রনির্ভর হয়ে গেছে। খানিকটা আক্ষেপও হলো, অনলাইন প্রযুক্তির সর্বগ্রাসী নেশায় এখন আমরা এক একজন হয়ে যাচ্ছি যন্ত্রমানব।

টুপ টুপ করে একটা- দুটো পাতা ঝরছে এই মায়াবী বনে। আকাশচারী বিহঙ্গকুলও উড়ে এসে নেমে পড়ল গাছের আগায়। হিজিবিজি গাছের বন্যা পেরিয়ে কয়েকটা তেড়াবেড়া ডুমুর গাছ। একটা পিচঢালা পথ কোনাকুনি এগিয়ে গেছে বনের বুক চিরে। বাঁয়ে বেশ খানিকটা ফাঁকা প্রান্তর। অদূরে ছায়াঘন মাঠ। পাথুরে ঘরের মাথায় একটা মলিন নিশান উড়ে পতপত করে। অবতল মাঠে তিড়িং বিড়িং করে নাচে একটা বকনা বাছুর। এটি লাফিয়ে এসে জিব ছোঁয়ায় মায়ের স্ফীত বাঁটে। অলস অবহেলায় মাথা নিচু করে জাবর কাটছে একদল গাভী মাতা। এই প্রান্তরজুড়ে সবুজ- হলুদাভ তৃণের অনিন্দ্য গালিচা। একপাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সারবন্দি উঁচু বৃক্ষ। এই বিজন মোড়েও দেখি রাজকীয় চিহ্ন শোভিত ডাকবাক্স। লাল পোস্টবক্সের উপরে বসে থাকা ম্যাগপাইজুটি বিরক্ত হয়ে উড়ে গিয়ে উঁচু ল্যাম্পপোস্টে বসল। রাস্তার পাশে দীর্ঘ খুঁটি। এক নেশাখোর মানুষ কাঠের বেঞ্চিতে বসে বিড়বিড় করে সাহায্য চাইছে এভাবে, ডু ইউ হ্যাভ এনি পেনি? আবার তাকালাম, এ শ্বেতাঙ্গ মানুষটির দিকে- কী অসহায়, বিষণ্ন মুখ। তার সম্বল বলতে পোটলা- পুটলি আর একটা ভাঙা গিটার। ভাবলাম, এই বিত্তহীন ফকিরের পূর্ব পুরুষরাই বুঝি সারা বিশ্বে ঔপনিবেশিকতার ঝাণ্ডা উড়িয়ে লুটপাট চালিয়েছিল? কিন্তু, এই নিরীহ ভিক্ষুক তো আর বেইমান রবার্ট ক্লাইভের মতো কেউ নয়। যাদের সার্বভৌম মালিকানা ছিল বিশ্বের এক চতুর্থাংশ জায়গা, যাদের রাজ্যে সূর্য কখনও অস্ত যেত না, তারা বুঝি একেবারে গরীব হয়ে গেছে। অবশ্য সব দেশেই মানুষের শ্রেণি দুই রকমের- ধনী আর গরীব, শোষক-শাসিত। পশ্চিমের সার্বজনীন পেনশান ও সামজিক নিরাপত্তার কারণে এই রকম ভিক্ষুকের উপস্থিতির কারণ সম্ভবত মাদকাসক্তি। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এ দেশের শাসন-কাঠামো এমনভাবে সাজানো যে, মানুষের ন্যূনতম বিকাশের সকল বন্দোবস্ত রয়েছে যার ভিত্তিমূলে রয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ন্যায্যতা, সাম্যতা আর সমান সুযোগ। এদেশের সিংহভাগ মানুষ জীবন-যৌবনকে নিংড়ে নিংড়ে উপভোগ করে। এই দীনহীন ভিক্ষুক ব্যতিক্রম। আউলা-ঝাউলা ব্রিটিশ-ফকিরকে ছুঁড়ে দিলাম কয়েকটা ধাতব মুদ্রা। শ্বেতাঙ্গ মানুষটির ভিক্ষার পাত্রে পাউন্ড-পেনি পড়লে ঝনঝন শব্দ হয়। ঔপনিবেশিক প্রভুদের অসহায় উত্তরপুরুষকে কিঞ্চিৎ দান করতে পেরে খানিকটা পুলক অনুভব করলাম।

আবার প্রবেশ করি পাহাড়ি ট্রেইলে। পথে অদ্ভুত নীরবতা। শুকনো জাম, বুনো আপেল পড়ে আছে ঘাসের বুকে। কাঠবিড়ালি দম্পতি জংগলের দিকে পালিয়ে বেড়ায়, আবার ঘাড় বাঁকিয়ে পেছনে তাকায়। একটা সফেদ পাখি জলের ধারে বসে আছে ধ্যানস্থ হয়ে। একপাশে নিঃসঙ্গ হর্সনাট গাছ দাঁড়িয়ে আছে উদ্ধত হয়ে। উঁচু পাড়ের জটাধারি উইপিং উইলোকে দেখায় নির্লিপ্ত সাধু-সন্ন্যাসীর মতো। বাতাসের হাহাকারমাখা শোঁ শোঁ শুনি। উড়ন্ত পাখির টুকরো টুকরো ছায়া পড়ে নীচের জলতরঙ্গে। আবার রোদ পড়ে এলো। জুঁই ফুলের মতো বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি ঝরতে লাগল। পাশ দিয়ে বয়ে চলা ঝিরির গা দুলে উঠছে এদিক সেদিক। পাপড়ি-পাতা-কুটো ভেসে যাচ্ছে ক্ষীণতোয়া ধারায়। বিলেতের বৃষ্টির আসলে আগা মাথা নাই- কখন আসে, কখন যায়। একটু পরেই বৃষ্টি থেমে গেল। শেষবেলার আবিরের ছোঁয়ায় চারধার যেন ঝলমল করে উঠল। বনজ জলার কাছে দুর্লভ রোদ পোহাতে লোমশ খরগোশ হাজির হয়েছে লাজুক পায়ে-লাফিয়ে লাফিয়ে।

এদিকে হালকা বন- চারধারে ধূসর ছায়া জমে আছে। পথে পথে বিবর্ণ পাতা-ফুলের পাপড়ি। খয়েরি ফলে ঝাড়গুলো ভরে আছে। একদিকে নুয়ে আছে উইপিং উইলো গাছ। কেমন যেন নারীসুলভ কমনীয়তা এর গায়ের ঝালররূপী সবুজ পাতায়। একটা বুড়ো বৃক্ষ দেখে চিনতে চেষ্টা করলাম- ওক গাছের মতো। কতসব হিজিবিজি লতাগুল্ম এদিকটায়। ঘাসের বন্যার ঢেউ লেগেছে এদিকটায়। এই সাত সাগরের পারে উদ্ভিদবিদ্যা পড়তে এসেছিলেন আমাদের বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু। তিনি প্রেমে পড়েছিলেন বৃক্ষরাজির। সম্ভবত তিনিই বলেছেন- পৃথিবীর গাছপালার নাম,ধাম, চক্র যারা জানেন, তারা উদ্ভিদবিজ্ঞানী আর যারা গাছের নাম-গোত্র না জেনেও ভালবাসেন, তারা হলেন শিল্পী।

এসব আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে হাঁটি এবড়ো খেবড়ো পথে। অদূরে ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের ঢাল। এদিকে সেঁতসেঁতে হিমহিম বাতাস। পাহাড়ি বায়ু বয়ে আনল মিষ্টি সুগন্ধ। সামনেই ফুলের ঝাড় ও বেরি ঝোপ। লোভী পাখিরা এসে ঠোকর দেয় বুনো ফলে। বিহঙ্গকুল আবার পাখা মেলে উড়ে যায় বৃক্ষমেলায়। কী যে সুন্দর দৃশ্য। পাকদণ্ডী ঘুরতেই দেখি- এদিকে গাছপালা একদম বিরল হয়ে এসেছে- ধূধূ তেপান্তর। বনভূমির শেষ বুঝি?

নিরিবিলি পথে একটা ভুতুড়ে ঘর দেখে থমকে দাঁড়াই। চারধারের বেলা গড়িয়ে যায়। সবকিছু কেমন যেন নিঝুম দেখায়। তৃণময় অরণ্যের স্থানে স্থানে জেগে আছে রুক্ষ পাথরের স্লাব কিংবা উঁচু-নিচু ঢিবি। এদের গায়ে গজিয়ে গেছে ম্রিয়মান ঘাসফুল, পেলব মস বা টলমল বিটপীলতা। অদূরে কালচে ইটের পাঁজা, পাথরের স্তূপ আর ভাঙাচুরা ফলক। হুশ হুশ শব্দ শুনি। একটা বাদুড় এসে ভাঙা চালায় বাড়ি খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল কুই কুই করে। কেমন যেন থমথমে ভাব। গা ছম ছম করে উঠল। শুনেছি, এরূপ বিজন বনে নরম আলো গায়ে মেখে ঘুরে বেড়ায় ভূতপ্রেতের দল। কয়েকটা হর্স-ফ্লাই ডেকে উঠল ভোঁ ভোঁ করে। নিজেকে আশ্বস্ত করি, বনের প্রাণীকে ভয়ের কিছু নেই, কারণ এই পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ শ্বাপদ কোনো জন্তু-জানোয়ার নয়, বরং মানুষ নিজে। স্বার্থপর মানুষের হিংস্রতার কাছে জানোয়ারের আক্রমণ বা জিনভুতের আসর নস্যি। কেমন যেন অচেনা গন্ধ নাকে লাগল। ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখে কাছ দিয়েই হুড়োহুড়ি করে চলে গেল কয়েকটা বনবিড়াল। এদের ছানাপোনারা গর্ত থেকে ইতিউতি উঁকি দিচ্ছে। লম্বা দম নিয়ে স্বগতোক্তি করি, আমি কাপালিকের দেশের মানুষ- ম্লেছদের মুল্লুকে এসে ভয়-টয় পেলে চলবে না। শুনেছি, আমাদের সুফি-দরবেশগণ চোখের দৃষ্টি দিয়ে অশুভ কিছু ভস্ম করে দিতেন। চশমার কাচ একটু পরিষ্কার করে ভালো করে লক্ষ করি। দিনের বেলাতেই দূর পাহাড়ের খাঁজে উঁকি দিচ্ছে রুগ্ন চাঁদ। বেশ গম্ভীর-উদাস ভাবভঙ্গি করে অভয় মুদ্রা বানালাম তর্জনী-বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা মিলিয়ে। ভয় কেটে গেলো। আগুয়ান বনবিড়ালের দিকে দৃষ্টির বান হেনে দীর্ঘলয়ে আবৃত্তি করলাম অনেক আগেশেখা বীজমন্ত্র- কুন......। অবাক কাণ্ড। আগ্রাসী বিড়ালের দল পিছু হটল। ভয় পেয়েছে বোধ হয়। ছপ ছপ শব্দ করে আবার কিছু একটা হেঁটে গেলো নাকি? নাকে লাগল বিশ্রী গন্ধ। শেয়াল নাকি? এই বুঝি ব্রিটিশ রাজকবি টেড হিউজ রচিত ‘শেয়ালের ঝাঁঝালো গন্ধ’! জীবজন্তুর ভয় বা অশরীরী তুকতাক পাত্তা না দিয়ে আমি বেকুবের মতো হাত পাতলাম কাব্যদেবীর কাছে। কথায় আছে না, মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। আর এই অর্বাচীনের মাথায় ভর করেছে ইংরেজি কাব্য:

Till, with a sudden sharp hot stink of fox

It enters the dark hole of the head.

এই লাইনদুটি পড়ে চমকেই উঠেছিলাম। আমাদের প্রাণের কবি জীবানানন্দ দাশের সারাসরি প্রভাব ব্রিটিশ রাজকবির রচনায়? জীবনানন্দের ‘বোধ’ কবিতার একটা স্তবক দেখুন-

আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন্ এক বোধ কাজ করে;
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়;
আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে,
সব কাজ তুচ্ছ হয়—পণ্ড মনে হয়,
সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়,
শূন্য মনে হয়।

বলা প্রয়োজন, কবি টেড হিউজ অনেক বছর ধরে ব্রিটেনের পোয়েট লরিয়েট বা রাজকবি হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৯৮ সালে প্রয়াত হওয়া কবি হিউজ নিশ্চিতভাবেই বাংলা জানতেন না। কবি জীবনানন্দ ও কবি হিউজের বেশ কিছু কাব্যে একই রকম কাব্যানুভূতি লক্ষ করে আমি অবাক হয়েছি। টেমসের পাড়ে বসে এক অসুখী কবি যে ভাবনা ভাবেন, রূপসী বাংলার কবির কাব্যপ্রকাশও একই আঙ্গিকে দেখে পুলক অনুভব করলাম।

সামনের দিকে বেশ কিছু পাতাবিরল শিরিষ গাছ আর শুকনো ঝোপঝাড়। ভুট্টার নাড়া হেলে আছে এদিক সেদিক। নরম ভূমিতে বনবিড়ালের বা বাঘদাসের পায়ের ছাপ দেখা যায়। হেমন্তের রিক্ততা যেন এই মাঠে। আমি তন্ময় হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রই এই বিরান ভূমিতে। ছায়াচ্ছন্ন উপবন একদম নিঝুম হয়ে গেছে। খানিকটা আনমনা হয়ে পড়েছিলাম আর কী। উন্মুখ হয়ে চলতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে দেখি- একরাশ জগদ্দল পাথর কিংবা ইট-পাথরের অবশেষ। এক জনহীন ভগ্নপ্রাচীরের দেশ। পরিত্যাক্ত গোরের ওপাশে মুখভার করে দাঁড়িয়ে আছে পাটকেলে পথনির্দেশক চিহ্ন। জীর্ণ শীর্ণ এপিটাফ দেখে বুঝতে পারলাম, এটি কোন জীবিত মানুষের আবাস নয়- কবরস্থান। মনে পড়ল অমর কবি মির্জা গালিবের পঙক্তি-

বে লিবাস আয়ি থা ইস দুনিয়া মে গালিব,
এক কাফন কি লিয়ে ইতনা সফর কার গায়ে।।

ভাষান্তরঃ

পৃথিবীতে পোশাকবিহীন এসেছিলে হে গালিব,

একটি কাফনের জন্য এতো লম্বা সফর করলে?

নিশ্চুপ হয়ে জীবনপথের কথা ভাবি। মোড়ের দিকে এক জোড়া কুয়াশাভেজা গাছ- শিমুল গাছ বুঝি? বাঁদরমন ফ্ল্যাশব্যাকে হাজির হয়ে যায় ছয় হাজার মাইল দূরের এক নিঝুম গাঁয়ে। আমার শৈশবের স্মৃতি নামেই অদ্ভুত সব পাখি, বিচিত্র সব গাছ। সারা অঙ্গে কাঁটা আর ফুলের বাহার নিয়ে কুয়োর দিকে ঝুঁকে থাকত মান্দার গাছ। পাঁশুটে সবুজ গাছে ডালগুলোও ছিল এলোমেলো। মান্দার গাছে অগ্নিশিখার মতো ঝলমল করত যে অপাঙক্তেয় ফুল, এর নাম পারিজাত। আমাদের পণ্ডিত মশাই জানিয়েছিলেন, এই ফুলের মূল নিবাসস্বর্গের নন্দনকানন। পুরাণমতে, মর্ত্যের রাজা কৃষ্ণ স্বর্গের রাজা ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করে স্বর্গ থেকে এই ফুলটি পৃথিবীতে নিয়ে আসেন। রুক্ষ রুক্ষ দেহের শিমুল গাছেও ছিল কাঁটার ছড়াছড়ি। ঘণ্টার মতো অজস্র ফুল থাকত সারা গাছে। চেঁচামেচি করতে করতে ফুলের মধু খেতে ভিড় জমাত নানান পাখি- শালিক, কাক, কোকিল, ফিঙে। পাখিদের ঝগড়া- লাফালাফিতে ফুল ঝরত টুপটুপ করে কালচে মাটিতে। আম, জাম, বাঁশবন আর জংলা ছাপিয়ে আমার চোখ পড়ত কড়ই শাখে। কী তুলতুলে হলদেটে পরাগের জৌলুশ থাকত কড়ই ফুলে। কোত্থেকে যে ফুড়ুৎ করে উড়ে গিয়ে জলমগ্ন মাছে তীক্ষ্ণ ঠোঁট ফোটাত দুষ্ট শাহবাজ। আমি নিজ চোখে দেখেছি- মাটির কোটরে শুয়ে শুয়ে মাছরাঙ্গা পাখি ডিমে তা দিতো পিঠ দিয়ে- পা উপরের দিকে তুলে! বেগুনের ডালে বসে থাকত একরত্তি পাখি- টুনটুনি। সাদাকালো দোয়েল ঘুমিয়ে থাকত পাতার ফাঁকে। কাঁঠাল পাতা ঝরে পড়ত শীতল বাতাসে। শীতে সব নিঃস্ব হয়ে গেলে উড়ে আসত বালিহাঁস, পানকৌড়ি। কখনও বা লালমাই পাহাড় থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসত মুনিয়া পাখি। শুকনো ডালে ঝিরিয়ে টিরিয়ে এরা নেমে পড়ত ভুট্টা খেতে, বিলের ধারে। আমার ঝোপঝাড়, গাছের কোটর, শালিক পাখি, ডিমের খোলস, তালগাছের জটা, বাঁদরলাঠি, মাকাল ফল, ঝরা পাতা, টিনের চাল, ঘাসের কবর, শিশির পতন, লেবুপাতার ঘ্রাণ ঘিরে হারানো শৈশব কোথায় পাই? ঠিক মনে পড়ে, কচুরি পায়ে মাড়িয়ে হুড়োহুড়ি করে পালিয়ে যেত ডাহুক পাখি। আমরা গেঁয়ো ভাষায় ডাকতাম- কোড়া। কেউবা গুলতি হাতে এগিয়ে যেত ডাহুক বা পানকৌড়ি শিকারে। দিঘির পাড় দিয়ে ধীরলয়ে হাঁটতেন উদাস বাউল। তিনি একতারায় টুং টুং বাজাতেন বেখেয়ালে। মুখ ঘুরিয়ে মৃদুলয়ে বলতেন, বাবারা, জীবহত্যা মহাপাপ। কিন্তু, কে শোনে এই গাঁজাখেকো পাগলের প্রলাপ। হেমন্তের দিনগুলো ছিল স্বল্প আয়ুর। তবু সূর্য ডুবি- ডুবি করেও যেন ডুবত না। শেষ বিকেলের আলো গায়ে মেখে ছুঁচো দৌড়াত চিঁহি চিঁহি করে। সাঁঝ পার হলে বেঢপ টেবিলে পড়তে বসতাম-

ছোট পাখি, ছোট পাখি

কিচিমিচি ডাকি ডাকি

কোথা যাও বলে যাও শুনি।

নলের গুড়ের গন্ধে মনঃসংযোগে বিঘ্ন ঘটত। দরগা হতে ঢেউয়ের মতো ভেসে আসত মিলাদ- জিকিরের অপার্থিব অনুনাদ! জংলি ফুলের সৌরভ ছাপিয়ে খিচুড়ির ঘ্রাণ আসত খিড়কির ওপাশ থেকে। কতবার যে আলগোছে ঢোঁক গিলে ফেলেছি। কখনও বা শুনতে পেতাম মণ্ডপ থেকে ভেসে আসা গান- 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়'। ইস, জীবনগাড়ির চলমান ব্রেক কষে যদি ব্যাক-গিয়ারে যেতে পারতাম। একটু যদি ছুঁতে পারতাম অচিন পাখি, নীলচে ডিম, ভেজা ফুল আর ঝড়ে তছনছ হয়ে যাওয়া খড়কুটোর নীড়!

সম্বিত ফিরে ম্রিয়মাণ আলোয় চোখ কচলে দেখি- এক পুরনো সমাধিফলকে কবি রবার্ট ফ্রস্টের উদ্ধৃতি উৎকীর্ণ রয়েছে বাঁকা হরফে - I had a lover's quarrel with this world! বুঝলাম, প্রয়াত মানুষটি ছিলেন রবার্ট ফ্রস্টের ফ্যান।

দ্রুতলয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবি- তাই তো, কী হবে অভিমান করে, কী হবে ঝগড়া করে, কী লাভ হবে গাধার মতো চেঁচিয়ে? অনেক সময় পিছু হটা মঙ্গলজনক। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, পরিত্যক্ত গোরস্থান দেখে খানিকটা ভয় পেয়েছি। মরা ডালে বসে আছে নিঃসঙ্গ ম্যাগপাই। এই পাখি নিয়ে প্রচলিত রয়েছে অমোঘ সংস্কার- ওয়ান ফর সরো, টু ফর জয়। এইসব রহস্যময়তায় আমার একদম বিশ্বাস নেই। তবু যেন কেঁপে উঠলাম অজানা আতংকে। বুঝলাম, আমার নিউরনে ভয়ের কুহেলিকা জমে আছে ঘাপটি মেরে। পথের সমান্তরালে শিশিরভেজা নগ্ন ভূমি। দূরে আরেকটা প্রান্তর- বেশ বিস্তৃত। ওদিকে একটাও উঁচু গাছ নেই- ছোট ছোট ঘাস-কুটোর রাজত্ব। ঠিক যেন শৈশবে দেখা হৈমন্তী মাঠ- রিক্ত, নিঃস্ব, ম্যাড়মেড়ে। পেছন ফিরে তাকাই, দৃষ্টি বার বার ফিরে ফিরে আসে।

জায়গাটা বড্ড বুনো, বেশ নিস্তব্দ-নির্জন। প্রায়ান্ধকার উপবনে ভেসে আসে বাতাসের গান। অদূরে কোথাও মটমট করে উঠল- সম্ভবত গাছের গুঁড়ি ভেঙে পড়েছে। সাঁঝের মায়ায় কারা যেন বাজি উড়ায় আকাশের বুকে- সম্ভবত রাখাল ছেলেরা ফসল তুলে বনফায়ার উৎসব শুরু করে দিয়েছে। দলছুট মেঘের টুকরো ছুটে এসে যুবতী শশীর গায়ে বাড়ি খায়- লাজুকভাবে হুটোপুটি খেলে। তমসা

ঘনায়, কালো বাদুর ওড়ে এলোমেলো। আকাশে প্রচুর মেঘ জমেছে। কুয়াশা আসছে ঘন হয়ে।

শ্লথপায়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছি প্রায়। ঠান্ডা লাগছে খুব। তাপমাত্রা নেমে যাচ্ছে হিমাংকের দিকে। বরফ পড়বে বুঝি? সন্ধ্যার অনন্ত অম্বরে অযুত তারকা জ্বলছে নিষ্প্রভ হয়ে। অবেলায় একটা বায়স ডাকে করুণস্বরে- কা, কা। এই পাখিটির কণ্ঠ বেশ ফ্যাসফেঁসে। খুব খিদে পেয়েছে বুঝি? বুক কেঁপে উঠল এই সর্বনাশা রব শুনে। আমার প্রয়াত পিতামহী বলতেন, দাঁড়কাক নাকি বিপদ- আপদের খবর আগেভাগেই টের পায়। কিশোরবেলায় দাদিজানকে দেখতাম, পূর্ব পুরুষদের মঙ্গল কামনায় ভুখা কাকপক্ষীকে রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়াতে। আমার শৈশবের পক্ষীবিশারদ-প্রয়াত দাদিজানের বুঝি হাজির রয়েছেন দূরবর্তী তারার মেলায়। সবজান্তা এই নারীর কাছেই কিশোরবেলায় সবক পেয়েছিলাম বৃক্ষ-পুষ্প-অচিন পাখির। কোথায় থাকে অচিন পাখি? নিজেকে খুব অপরাধী মনে হলো- কতদিন পিতামহীর আত্মার শান্তি কামনা করা হয় না। বিড়বিড় করে কিছু পড়তে শুরু করলাম। হঠাৎ করে ঠান্ডা বাতাস আসছে জোরে সোরে। কী মুসিবত, বাতাসের ঝাপটায় আমার দোয়া- দরুদ উড়ে যায় আর কি!

উচাটন মন উড়ে যায় গবেষণার গজদন্ত মিনারে। সুপারভাইজারের ইমেইলের সংকেত পাচ্ছি, আজ-কালের মধ্যেই লিটারেচার রিভিউর সারসংক্ষেপ লিখতে হবে। সাদা চুলের রাগি সুপারভাইজরকে গালি দিতে ইচ্ছে হলো। আবার মাথায় ভর করছে জীবনানন্দের "বোধ" কবিতা আর ব্রিটিশ কবির "শেয়ালের ঝাঁঝালো গন্ধ"! অস্থির নিউরনে আইনের দেবী আর কাব্যের বরপুত্রের সংঘর্ষ বেঁধে যায়। অবসাদ লাগছে খুব। কি রাঁধব আজকে? বাসমতী চালের ভাত আর মুরগির ঝোল?

খানিকটা আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। মোড়ের দিক থেকে আচমকা ডাক শুনি, হেই হ্যান্ডসাম, ডু ইউ নিড এনি প্যাশোনেট সার্ভিস ফর টুনাইট? বলে কী এই বদমাশ? উৎকট সাজের এক নারী দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ। কী সুন্দর হাসি। বুঝতে একটু সময় লাগল- কে এই নারী। মোড়ের দিকে আলো- আঁধারি গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে আছে অপরূপ বারবনিতা! প্রথম দর্শনে বোঝা যায় না, এই অপরূপার বয়স কত- বাইশ না বত্রিশ? অপ্রস্তুত ও ভয়ার্ত আমি উল্টো-ছুট দিই বড় রাস্তার দিকে। পেছন থেকে হাস্কি টোনের গালি শুনি, ব্লাডি কাওয়ার্ড!